কোচবিহার রাজপরিবারের আনুকূল্যে বৈষ্ণব সাহিত্য চর্চা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পি.এইচ.ডি (কলা শাখা)
ডিগ্রীর জন্য প্রদত্ত গবেষণা পত্র
২০১৬

গবেষক
সংহিতা ঘোষ

তত্ত্বাবধায়ক
ড. সত্যবতী গিরি
বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা-৭০০০৩২

সূচীপত্র

	বিষয়	পত্রাঙ্ক
প্রথম অধ্যায় হ্ল		
	শ্রীচৈতন্যদেব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম	৫
দ্বিতীয় অধ্যায় হ্ল		
	কোচবিহার রাজবংশের ইতিহাস	৩১
তৃতীয় অধ্যায় হ্ল		
	কোচ রাজসভা ও বৈষ্ণব ধর্ম	৬৮
চতুর্থ অধ্যায় হ্ল		
	কোচ রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় দরবারী সাহিত্য	৮০
পঞ্চ ম অধ্যায় হ্ল		
	বৈষ্ণব সাহিত্য ও কোচবিহার রাজদরবার	১৩০
	উপসংহার	১৬৭
	গ্রন্থপঞ্জি	১৬৮

ভূমিকা

সুপ্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ জেলা কোচবিহার। কর্মসূত্রে ২০০২ সালে কোচবিহার শহরের গরিমাময় ইতিহাসের অংশ আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজে যোগদান করি। ১২৬ বছরের পুরনো এই কলেজের গ্রন্থগারে পুরনো বই-এর সমৃদ্ধ সঞ্চয় আমাকে প্রাচীন কোচবিহারের ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলে। তখনই জানতে পারি কি সুবিপুল ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী এই শান্ত, পরিচ্ছন্ন জেলাশহরটি। আমার আগ্রহ আরও বাড়িয়ে দিলেন শ্রদ্ধেয়া অধ্যাপিকা ড. সত্যবতী গিরি এবং শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. সত্য গিরি। তাঁদের কাছে আমি শুনলাম কোচবিহার রাজপরিবারের সমৃদ্ধ সাহিত্য সম্ভারের কথা, রাজাদের ধর্মনিরপেক্ষ উদার পৃষ্ঠপোষণার কথা। জানলাম আসামের বৈষ্ণব ধর্ম আন্দোলনের প্রবক্তা শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের সম্পর্কে নানা তথ্য, উত্তর-পূর্ব ভারতে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার ও প্রসারের কথা। অতঃপর শ্রদ্ধেয়া অধ্যাপিকা সত্যবতী গিরি আমাকে উৎসাহ দিলেন কোচবিহার রাজদরবারে পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত সাহিত্য সাধনায় বৈষ্ণব প্রভাবের অনুসন্ধানে। তাঁর সস্নেহ উৎসাহেই আমি গবেষণার বিষয় হিসাবে বেছে নিই কোচবিহার রাজদরবারের আনুকূল্যে বৈষ্ণব সাহিত্যচর্চা।

স্থিরীকৃত বিষয়ের উপর কাজ করতে গিয়ে প্রয়োজনীয় গ্রন্থের পাশাপাশি পুঁথিপাঠ এবং মন্দির ও বৈষ্ণব সত্রগুলির পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি। কোচবিহার বর্তমান মধুপুর ধাম নামে পরিচিত শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের পূতস্মৃতি সমন্বিত সত্রটি একাধিকবার দেখা ও প্রধান পুরোহিতের ও সত্রের অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে আলাপচারিতা আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ তাদের পুথিশালায় রক্ষিত পুথিগুলি পড়বার সুযোগ দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন। ন্যূনধিক দশটি পুথি আমি পড়বার সুযোগ পেয়েছি। সেইসঙ্গে পেয়েছি গ্রন্থগারিক ও অন্যান্য গ্রন্থাগার কর্মীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা। পাশাপাশি অভাবিতভাবে সাহায্য পেয়েছি নানা গ্রামীন কীর্তনদলের কীর্তিনীয়াদের কাছে। কোচবিহারের বিখ্যাত রাসমেলা উপলক্ষে মেলাপ্রাঙ্গন ও শ্রী শ্রী মদনমোহন জীউ-এর মন্দির প্রাঙ্গণে বসে কীর্তনের আসর। এই অঞ্চলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবপন্থী রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক কীর্তন আমাকে অবাক করেছে, কারণ কোচবিহার রাজপরিবারের সদস্যরা শ্রীমন্ত শঙ্করদেব প্রবর্তিত একশরণ নামধর্মের অনুগামী ছিলেন, এবং সেখানে রাধার উল্লেখ মাত্রও নেই। রাধাবিহীন মদনমোহনের পুজোয় রাধা মাধবের ঐশী প্রেমমূলক কীর্তনের নিবেদন আমাকে শিখিয়েছে ধর্মসহিষ্ণুতা কেবল বিদ্বানের অধিগত কোনো পুথিগত সত্য নয়, তা সাধারণের অস্থিমজ্জায় মিশে যাওয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের মত সহজ এবং অবাধ। মধুপুর ধামের বৈষ্ণবসত্রে সুবিশাল নামঘর এবং অতিথির অবাধ আনাগোনা আমাকে শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের ধর্মদেষণার আত্মিক তাৎপর্য বুঝিয়েছে। সর্বোপরি এক ঐতিহ্যময় অতীতকে আস্বাদনের দুর্লভ সৌভাগ্য আমাকে সর্বতোভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

এই অভিসন্দর্ভটি রচনা করতে গিয়ে প্রতিপদে যাঁর সস্নেহ তত্ত্বাবধান পেয়েছি তিনি পূজনীয়। অধ্যাপিকা ড. সত্যবতী গিরি। তিনি এই অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকা। তাঁর পাণ্ডিত্য ও স্নেহ আমাকে এই কাজ সম্পূর্ণ করবার পাথেয় জুগিয়েছে। প্রতিটি অধ্যায় কিভাবে ভাগ করলে তা যথাযথ হবে, কোন অংশের কতখানি ব্যাখ্যা প্রয়োজন, বৈষ্ণব তত্ত্বদর্শনের বিশ্লেষণ, প্রতিটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়েই ছিলো তাঁর মনোযোগ। এই কাজটি করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর মনের যাবতীয় প্রশ্নের উত্তরদানে তিনি ছিলেন সদা উৎসুক। আমার সশ্রদ্ধ, সকৃতজ্ঞ প্রণতি জানাই তাঁকে।

অভিসন্দর্ভের প্রতিটি পর্যায়ে মূল্যবান মতামত দিয়েছেন প্রাজ্ঞ পণ্ডিত পূজনীয় অধ্যাপক ড. সত্য গিরি। তিনি

বৈষ্ণব তত্ত্ব-দর্শনে প্রখর পাণ্ডিত্যের অধিকারী। প্রতিটি পদক্ষেপে প্রয়োজনীয় সাহায্য তিনি ছিলেন অক্লান্ত। বিশেষভাবে আসামের বৈষ্ণবধর্ম আন্দোলন এবং শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান মতামত আমাকে আশাতীত পাথেয় জুগিয়েছে। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ সকৃতজ্ঞ প্রণাম জানাই।

কাজটিকে সম্পূর্ণতাদানে সাহায্যে অকৃপণ ছিলেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী রুনু দে, শ্রী শিশির অধিকারী ও শ্রীমতি অর্পিতা চক্রবর্তী। এছাড়াও অন্যান্য কর্মচারীদের সাহায্যও আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে। এঁদের সকলকে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমি ঋণস্বীকার করছি মধুপুর ধামের বৈষ্ণবসত্রের সমস্ত কর্মচারীদের কাছে যাঁরা হাসিমুখে বারবার আমার নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রধান পুরোহিত এবং অন্যান্য মন্দির কর্মচারীদের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

আমি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই সেই সব কীর্তনীয়া এবং কীর্তনশিল্পী দলগুলির প্রতি যাদের মঞ্চ উপস্থাপনা আমাকে অভিজ্ঞতা জুগিয়েছে। শিক্ষার্থীর প্রশ্নের উত্তর ছাড়াও এক অনাবিল শান্তি ও আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণায় তাঁরা আমাকে উজ্জীবিত করেছেন।

এই অভিসন্দর্ভের মুদ্রর্ণের কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন জয়জিৎ মুখার্জ্জী। তাঁদের জানাই আমার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। অভিসন্দর্ভটি বাঁধিয়ে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন সোপান পাবলিশার্স। তাঁর প্রতি রইল আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ।

সংহিতা ঘোষ

শ্রীচৈতন্যদেব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম

কথামুখ ও রাজনৈতিক পটভূমি

সদা প্রবহমান কাল অজানা দিনের আদিম উৎস থেকে অনন্তের দিকে সতত চলমান। এই চলমান কালস্রোতের নির্বিশেষতা দেশ-কাল-পাত্রের আধারে খণ্ডিত হয়ে বিশেষ রূপ পায়। এভাবেই যুগে যুগে ধরা পড়ে দেশধর্ম, কালধর্মের আভাস, প্রতিবিম্বিত হয় জাতির ইতিহাস, তার চেতনা, বিশ্বাস এবং বোধ। বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসের দিকে তাকালেও চোখে পড়ে এই উক্তির সত্যতা। বাংলার ইতিহাসের পাশাপাশি বাংলার সাহিত্যেও বাঙালি চেতনার ক্রমবিকাশের স্বভাব-লক্ষণকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন যুগ ধর্ম অঙ্কুরিত হয়েছে। এভাবেই আদিযুগ পরিণামের পাথেয় কালক্রমে মধ্যযুগ লক্ষণের সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করেছে, আবার মধ্যযুগ-পরিণতির সন্ধিলগ্নে মুকুলিত হয়েছে আধুনিক সাহিত্য লক্ষণ। কিন্তু এই একের বিলোপে অন্যের উত্থান বড় একটা সহজসাধ্য নয়, কোন জাতির ক্রমক্ষীয়মান প্রাণের উৎসকে এক ধাক্কায় সজীব করে তুলতে পারে একমাত্র বিপ্লবের উত্তাপ। জীবনের স্বাভাবিক গতিধর্ম যখন রুদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন স্থানুত্ব থেকে বাঁচবার জন্য বিপ্লবের আঘাতই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। ধবংসের মধ্যে থেকেই নতুন সৃষ্টির মুকুল উদ্‌গমের আয়োজন চলে। তুর্কী আক্রমণ মধ্যযুগের বাঙালি জাতীয় জীবনে এক অপ্রত্যাশিত আঘাত, এই আঘাতের দহন জ্বালা থেকে মুক্তি পেতে বাঙালির চেতনা, বোধ ও আবেগের যে নবীন মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ সেই নবজীবনের উদ্ভাসই মধ্যযুগ লক্ষণ বলে চিহ্নিত। তুর্কী আক্রমণের কারণ হিসাবে সঙ্গতভাবেই বলা যায়,—শেষ অবধি বিদেশী শক্তিকে ঠেকিয়ে রাখা গেল না, তার কারণ এই নয় যে বাঙালির বীরত্ব তখন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মুসলমান শক্তির বিজয় লাভের প্রধান কারণ হচ্ছে দেশে সংঘ-শক্তির অভাব। বস্তুত তুর্কী আক্রমণ বাঙালি জাতির সংঘহীনতার উপর চরম আঘাত। অপ্রত্যাশিত সেই আঘাতে বাঙালি সত্যিই চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়াল।

বস্তুত বাংলাদেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হওয়ার পর থেকেই শাসনসংক্রান্ত এবং অর্থনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত ক্ষেত্রগুলিতে ভারসাম্য স্থাপিত হয়েছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনায় মুহম্মদ বখতিয়ার খলজীর সামরিক অভিযান বাংলার রাজনৈতিক চিত্রের পরিবর্তন ঘটায়। এই সময় বাংলার অধিপতি ছিলেন লক্ষণ সেন। তাঁর বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার কারণে সেন রাজবংশ তখন বেশ দুর্বল। এই সময়ই অতর্কিত আক্রমণে বখতিয়ার খলজী গৌড় তথা লক্ষণাবতী দখল করেন। প্রাথমিকভাবে বখতিয়ার প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাজ্যের আয়তন বিশেষ বড় ছিল না। উত্তরে পূর্ণিয়া থেকে দেবকোট হয়ে রংপুর শহর পর্যন্ত, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া এই দুই নদী, দক্ষিণে গঙ্গার মূলস্রোত আর পশ্চিমে কোশী ও গঙ্গার সঙ্গম থেকে রাজমহল পাহাড় পর্যন্ত ছিল খলজী প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের সীমা। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে খলজীর মৃত্যু হয়। আর পরবর্তী প্রায় শতাধিক বছর ধরে বাংলার শাসকরা রাজ্যশাসনের সাথে সাথে রাজ্যের সীমা ও সম্পদ বৃদ্ধি করতে থাকেন। এভাবেই ধীরে ধীরে বাংলার সদ্য প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাজ্যটির সীমা বাড়তে থাকে। তাছাড়া দিল্লীর সুলতানদের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং দিল্লী ও বাংলার মধ্যে দূরত্বের কারণে বাংলার শাসকরা বার বার বিদ্রোহ করে নিজেদের স্বাধীন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট ছিলেন। এমনকি দিল্লীতে লখনৌতি পরিচিত ছিল বুলঘাকপুর নামে।[১] বাংলার বিদ্রোহ দমন করার জন্য দিল্লীর সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক বাংলাকে

সাতগাঁ, লখনৌতি ও সোনারগাঁ এই তিন প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত করে প্রতিটি বিভাগে দিল্লীর কর্তৃত্বাধীন প্রশাসক নিযুক্ত করেন। কিন্তু তুঘলকের অন্যত্র বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ততার সুযোগে বাংলায় আবার বিদ্রোহ মাথাচাড়া দেয়, এবং সেই সঙ্গে তিনটি প্রশাসনিক বিভাগের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব। সোনারগাঁয়ের শাসক বহরম খানের মৃত্যুর পর তাঁর শিলাহ্‌দার সুলতান ফখ্‌রুদ্দীনের বিরোধিতা করে যুদ্ধযাত্রা করেন লখনৌতির শাসক কাদের খান এবং সাতগাঁয়ের শাসক ইজাজুদ্দীন ইয়াহিয়া। প্রাথমিক সাফল্য সত্ত্বেও অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে অভিযান ব্যর্থ হয়, কাদের খান নিহত হন। কিছুকাল পর কাদের খানের আরিজ-ই-লস্কর আলী মুবারক সুলতান আলাউদ্দীন আলী শাহ নামে লখনৌতিতে সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু বছর না ঘুরতেই তাঁর অন্যতম আমীর হাজী ইলিয়াসের হাতে নিহত হন। হাজী ইলিয়াস, শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ নাম ধারণ করে লখনৌতির সিংহাসন অধিকার করেন।

ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা ও গুপ্তহত্যা ইলিয়াস শাহের সিংহাসনে আরোহণ পর্বে জড়িয়ে থাকলেও সুলতান হিসাবে তিনি অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দেন। রণকুশলী এই সম্রাট এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করেন। সোনারগাঁ অধিকার করে প্রায় সমগ্র বাংলাদেশকে ঐক্যবদ্ধ করেন। কাঠমাণ্ডু সহ নেপালের বহু শহর লুঠ করেন, ত্রিহুত, চম্পারণ, গোরক্ষপুর, কাশী পর্যন্ত তাঁর অধিকার বিস্তৃত ছিল। কামরূপের কিছু অংশও তাঁর অধিকারে ছিল।[২] দিল্লীর সুলতান ইলিয়াস শাহকে দমন করতে সচেষ্ট হন, এবং এর ফলে বিহার-উত্তরপ্রদেশের অধিকৃত অঞ্চলগুলি ইলিয়াস শাহের হাতছাড়া হলেও বাংলার উপর তাঁর অধিকার অটুট ছিল। ইলিয়াস শাহকে দমন করতে না পেরে অবশেষে ফিরোজ তুঘলক তাঁর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন, এবং কার্যত তাঁকে বাংলার স্বাধীন সুলতান হিসাবে মেনে নেন। প্রশাসক ইলিয়াস শাহও কম দক্ষ ছিলেন না। মূলত তাঁর সময়েই ঐক্যবদ্ধতার জন্য এই অঞ্চল 'বাঙ্গালা' নামে অভিহিত হতে থাকে।[৩] এর আগেই হিন্দু সৈন্যরা সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। ইলিয়াস শাহী আমলে সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে স্থাপিত ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের পরিচালনাকার্যে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখা যায়। সাম্প্রদায়িক নৈকট্য মানুষের মনে বাঙালিত্ব বোধের উদ্ভাবক হয়। যথার্থই ইলিয়াস শাহের শাহ-ই বাঙ্গালীয়াঁ উপাধি সার্থক। ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকান্দর শাহও দিল্লীর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হন। বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ সুসম্পর্কের প্রভাব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিভাত হয়। বাংলার রাজনৈতিক ও আর্থিক পরিস্থিতি ক্রমশ উন্নততর হয়। পারস্পরিক সৌহার্দ্যের প্রভাব বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রেও দেখা যায়। মূলত ইলিয়াস শাহী আমলে বহিরাগত শাসক গোষ্ঠীর বংশধরদের মধ্যে বাংলাকে মাতৃভূমি হিসাবে গ্রহণ ও বাংলা ভাষা সাহিত্যকে আত্তীকরণের প্রবণতা দেখা যায়। হিন্দু কবি ও লেখকরা উচ্চপদস্থ আধিকারিক বা সুলতানদের থেকে সম্মানসূচক উপাধি এবং উপহার লাভ করেন। কাব্য সাহিত্যে এই সময় সুলতানদের প্রশস্তি লেখা হতে থাকে। রুকনুদ্দীন বরবক শাহের রাজত্বকাল (১৪৫৯-১৪৭৫ খ্রিঃ) বাংলার রাজনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্যের যুগ, বরবক শাহের সাম্রাজ্য সীমাও ছিল বিস্তৃত। উত্তরে দিনাজপুর ও রংপুর জেলা অঞ্চ ল, উত্তর-পূর্বে কামরূপ-কামতা রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত, পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমা পর্যন্ত, দক্ষিণে ফরিদপুর বরিশাল অঞ্চল, দক্ষিণ পশ্চি মে গড় মান্দারন, পশ্চিমে খড়্গপুর পর্বতমালা, উত্তর পশ্চিমে ত্রিহূত রাজ্যাঞ্চল বরবক শাহের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।[৪] শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রেও তিনি দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ইলিয়াস শাহী নীতির অনুসরণে বহু হিন্দুকে তিনি উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেন। ঘোড়াঘাটের দুর্গাধ্যক্ষ ছিলেন ভান্দসী রায়, ত্রিহুতে তাঁর প্রতিনিধি ছিলেন কেদার রায়, অনন্ত সেন ও নারায়ণ দাস ছিলেন তাঁর খাস চিকিৎসক। পাশাপাশি বরবক শাহের অধীনে কর্মরত বহু মুসলিম আধিকারিকের নামও পাওয়া যায় বিভিন্ন শিলালিপি থেকে। যেমন ইকরার খানের নাম পাওয়া যায় সাজলা মংখবাদ ও শহর লাওবলার সেনাপতি ও প্রশাসক হিসাবে, এরই অধীনস্থ একজন সেনানায়ক ছিলেন আজমল খান। নসরত খান ছিলেন অন্যতম একজন সামরিক অধিকর্তা। চট্টগ্রামের অধিকর্তা হিসাবে রাস্তি খানের নাম পাওয়া যায়। এভাবেই

হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শক্তি এই সময় বাংলার উন্নতির সূচনা করেছিল।[৫] পাশাপাশি তিনি কয়েক হাজার হাবসীকে আমদানি করে নানা কাজে তাদের নিয়োগ করেন শারীরিক পটুতা ও ক্ষিপ্রবুদ্ধির জন্য। কিন্তু সাময়িক এই সুবিধা পরবর্তীকালে নানা বিপদ ডেকে আনে, তবে তা হাবসী শাসন প্রসঙ্গে আলোচ্য। বরবক শাহের শাসনকালের কথা বলতে হলে তাঁর রাজত্বকালে শিল্প সাহিত্যের উৎকর্ষতার কথাও আলোচ্য। সুলতান রুকনুদ্দীন বরবক শাহ ছিলেন মহাপণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি। ফলত তিনি হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে পণ্ডিত ও কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। বিশিষ্ট নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্বভৌমের পিতা ছিলেন বরবক শাহের সমকালীন স্মৃতিগ্রন্থকার, তিনি সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বৃহস্পতি মিশ্রকে তিনি পণ্ডিত সার্বভৌম এবং 'রায়মুকুট' উপাধিতে ভূষিত করেন। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতি মিশ্র সুলতান জালালুদ্দীনের থেকেও পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' রুকনুদ্দীন বরবক শাহের আমলে রচিত। কবিকে তিনি 'গুণরাজ খান' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। ফার্সী ভাষার শব্দকোষের 'করাঙ্গ-ই-ইব্রাহিমী' বা 'শরক নামা'র লেখক ইব্রাহিম কায়ুকীর লেখা থেকে জানা যায় তিনি বরবক শাহের সমসাময়িক ছিলেন, এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন। তাঁর রচনায় কয়েকজন মুসলিম কবি ও পণ্ডিতের নামও পাওয়া যায়। বরবক শাহের অন্যতম দূরদর্শিতা হল রাষ্ট্রনৈতিক বিষয় থেকে ধর্মীয় প্রভাবকে দূরে রাখা, গৌড়ের বিশাল দাখিল দরওয়াজা তাঁরই কীর্তি।

সুলতান রুকনুদ্দীন বরবক শাহের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র শামসুদ্দীন ইউসুফ (১৪৭৬-৭৭) -(১৪৮০-৮১ খ্রিঃ)। বুকাননের বিবরণী আর সমকালীন ফার্সী ইতিহাস গ্রন্থগুলি থেকে জানা যায় শামসুদ্দীন ইউসুফ ছিলেন বহু শাস্ত্রবিদ, বিদ্বান, ধার্মিক, ধৈর্যশীল এক রাজা। তিনি প্রজাহিতৈষী ছিলেন, এবং তাঁর রাজ্যে প্রজাদের সুখ ও সমৃদ্ধি বজায় ছিল। শামসুদ্দীনের পর সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র সিকন্দর শাহ, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁকে সরিয়ে সিংহাসন দখল করেন বরবক শাহের এক ভাই জলালুদ্দীন ফতে শাহ (১৪৮৭-৮ খ্রিঃ)। সমকালীন হিন্দু-মুসলমান উভয় কবির রচনায় তাঁর সম্পর্কিত স্তুতিমূলক কথা থেকে বোঝা যায় জলালুদ্দীন ফতে শাহ জনপ্রিয় ছিলেন এবং ইলিয়াস শাহী বা বরবক শাহের নীতি থেকে বিচ্যুত হন নি। বিজয়গুপ্ত রচিত মনসামঙ্গল কাব্যে বা বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবত কাব্যে জলালুদ্দীন সম্পর্কে সদর্থক তথ্য পাওয়া যায়। জলালুদ্দীনের অধিকাংশ মুদ্রা ও শিলালিপিতে এঁর রাজকীয় নামের পরে অর্থাৎ জলালুদ্দীন আবুল মুজফ্ফর ফতে শাহ এর পরে 'হোসেন শাহী' কথাটি উল্লিখিত হয়েছে। বিজয়গুপ্তের রচনায় জলালুদ্দীন একজন প্রবল পরাক্রান্ত বীর হিসাবে বর্ণিত। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থেও জলালুদ্দীন একজন 'মহাতীব্র নরপতি' হিসাবে বর্ণিত।[৬] 'তবকাত-ই-নাসিরী' এবং 'রিয়াজ্-উস্-সালতিনি' গ্রন্থেও জলালুদ্দীনকে সর্বগুণসম্পন্ন রাজা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এই সুলতানের রাজত্বকালে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম।

জলালুদ্দিনের শাসন কুশলতা কোন কোন ক্ষেত্রে তেমন ছিল না। অতীতে রুকনুদ্দীন বরবক শাহের রাজত্বকালে যে হাবসীদের নানা পদে নিয়োগ করা হয়, পরবর্তী সুলতান শামসুদ্দীনের শান্তিপ্রিয় নির্বিরোধিতার সুযোগে তারা শক্তিশালী হয়ে ওঠে, এবং স্বাভাবতই জলালুদ্দীনের মত 'মহাতীব্র নরপতি'র সঙ্গে ক্ষমতালোভী হাবসীদের অনিবার্যভাবেই সংঘাত দেখা দেয়। ক্ষমতা ছাঁটাই এর সম্ভাবনা দেখে এবং সুলতানের সঙ্গে মতবিরোধ ও জলালুদ্দীনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থায় আতঙ্কিত হয়ে হাবসীরা সরাসরি সংঘাতের পথে নামে। হাবসী আমীর মালিক-উল-উমরা আন্দিল হিন্দু জমিদারদের সঙ্গে যোগ দিয়ে উত্তর-সীমান্ত অঞ্চলে স্বাধীন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন, এমনকি নিজের নামাঙ্কিত মুদ্রাও প্রকাশ করেন। বিদ্রোহী হাবসীদের প্রতি অত্যধিক মনোযোগ দিতে গিয়ে জলালুদ্দীন নিজের প্রাসাদ ও পরিকরদের দিকে নজর দিতে পারেন নি। ফলে সেখানকার নেতা হাবসী বরবক বেশ কিছু

লোভী অর্থলোলুপ পাইকদের বশীভূত করে জলালুদ্দীনকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেন। তাঁর নতুন নাম হয় সুলতান শাহজাদা। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই হাবসী মালিক অন্দিল ফিরে আসেন রাজধানীতে এবং একই পদ্ধতিতে সুলতান শাহজাদাকে হত্যা করে সুলতান সৈফুদ্দিন ফিরোজ শাহ নাম ধারণ করে সিংহাসনে বসেন। দক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ উদার এই শাসক তাঁর সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালেই প্রজাদের শান্তিবিধান করেছিলেন। ইনিই গৌড়ের বিখ্যাত ফিরোজ মিনারের নির্মাতা। এর পরের ইতিহাস রক্তাক্ত। সৈফুদ্দিন ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর জেষ্ঠ পুত্র কুতবুদ্দীন মাহমুদ শাহ সিংহাসনে বসেন, কিন্তু কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সিদি বদর নামে জনৈক হাবসী তাঁকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেন। এর নৃশংস স্বভাব ইতিহাসবিদিত। তিনি ক্ষমতালোলুপতাকে নিষ্কণ্টক রাখার জন্য হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে হত্যা করেন। তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আতঙ্কিত আমীররা বিদ্রোহী হয়, এই বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দেন সৈয়দ হোসেন, এবং সুলতান মুজফ্ফরকে হত্যা করে ১৪৯৩-৯৪ খ্রিঃ, ৮৯৯ হিজরীতে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সিংহাসনে বসেন 'আলা আল দুনিয়া ওয়াল-দীন আবুল মুজফ্ফর হোসেন শাহ' নাম নিয়ে।[৭] একথা অবিসংবাদিত ভাবে সত্য যে তিনি বাংলার সুলতানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর গৌরবময় কীর্তি সমকালীন নানা উপাদানের মধ্যে কীর্তিত। কিন্তু এ কথাও দুঃখজনকভাবে সত্য যে তাঁর রাজত্বকালের আনুপূর্বিক প্রামাণ্য ইতিহাস রচনার মত উপাদানগত অভাব আছে। মুদ্রা এবং শিলালিপির সাক্ষ্য থেকে জানা যায় হোসেন শাহ ছিলেন সৈয়দ বংশীয় আরব। তাঁর বাল্য কৈশোর বা গৌড়ীয় রাজশক্তির সঙ্গে তাঁর নৈকট্যের কারণ কোনোটাই জানা যায় না। কেবল জানা যায় তিনি প্রথমে সুলতান মুজফ্ফর শাহের উজীর ছিলেন। কিন্তু মুজফ্ফরের দমন পীড়ন মূলক নীতির অত্যাচারে অতিষ্ঠ ও আতঙ্কিত আমীরদের বিদ্রোহে তিনি নেতৃত্ব দেন এবং পরবর্তীকালে পূর্ববর্তী সুলতানকে হত্যা করে তিনি সিংহাসন দখল করেন এবং অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটে। অধিকাংশ দুর্নীতিগ্রস্ত পাইকদের তিনি বিতাড়িত করেন এবং রাজধানী বিধবস্ত গৌড় থেকে একডালায় স্থানান্তরিত করেন। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার অনেক অঞ্চলই হোসেন শাহের অধিকৃত ছিল। উড়িষ্যার সঙ্গে বিরোধের প্রসঙ্গটি এখানে প্রাসঙ্গিক। তাঁর প্রথম প্রকাশিত মুদ্রাতেই তাঁকে উড়িষ্যা ও জাজনগর বিজেতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। উড়িষ্যা আক্রমণ ও তার বিবরণ ত্রিপুরার রাজমালা বা রিয়াজ-উস্-সালাতীন ছাড়াও সমকালীন বৈষ্ণব জীবনীগ্রন্থগুলি থেকে জানা যায়। তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা, হিন্দু তথা বৈষ্ণবদের সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সে কালের বৈষ্ণব সাহিত্য খুবই প্রাসঙ্গিক। হোসেন শাহী আমলই মূলত নদীয়ার মহাপুরুষের লীলাকাল। সুতরাং বৈষ্ণব ভক্তের চোখে এই সময় প্রকৃতপক্ষে স্বর্ণালী সময়। যদিও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক বা সামাজিক সত্যও এই সাক্ষ্য দেয় যে হোসেন শাহের রাজত্বকাল সত্যই বাংলার বুকে নিবিড় শান্তি ও সমৃদ্ধির এক খণ্ডসময়।

পূর্ববর্তী শ্রেষ্ঠ সুলতানদের পথানুযায়ী তিনিও ধর্মনিরপেক্ষতা এবং পরমতসহিষ্ণু উদারতার পথ বেছে নিয়েছিলেন। উড়িষ্যার মন্দির লুণ্ঠন ইত্যাদি কারণে কোনো কোনো মত উঠে আসে যে প্রকৃতপক্ষে তিনি হিন্দু উৎপীড়নকারী শাসক ছিলেন। কিন্তু যথাযথভাবে দেখলে তাঁর ধ্বংসাত্মক যে কোন কাজই যুদ্ধ চলাকালীন সময়ের[৮]। সামরিক অভ্যুত্থানের সময় যা সত্য ও স্বাভাবিক তা সুস্থ সাধারণ সময়ের পক্ষে স্বাভাবিক নয় একথাও অনস্বীকার্য। সুবুদ্ধি রায় সম্পর্কিত ঘটনার যে উল্লেখ সমকালীন বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায় তা অবশ্যই তাঁর চরিত্রের একটি প্রবণতাকে নির্দেশ করে, কিন্তু তবুও একথাও সত্যি এই ঘটনা তাঁর রাজত্বকালের একেবারে প্রথম দিককার ঘটনা। যদি তাঁর হিন্দুবিদ্বেষ সত্যিই প্রবল হত, তবে তাঁর আমলে বাংলা সমৃদ্ধির উচ্চতম শিখরে উঠতে পারত না। সামরিক ও কূটনৈতিক সাফল্য হোসেন শাহকে বাংলার শ্রেষ্ঠ সুলতানের শিরোপা দেয়। কামরূপ-কামতা এবং ত্রিপুরার একাংশ জয় করে তিনি বাংলা সাম্রাজ্যকে আরো বিস্তৃত করেন। তিনি দীর্ঘ ২৬ বছর রাজত্ব করেন, কিন্তু এই সময়কালে বাংলায় অবিচ্ছিন্ন শান্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ফলে কৃষি উৎপাদন ও ব্যবসা বাণিজ্যের

প্রসার ঘটেছিল আশানুরূপ ভাবেই। "সুলতান হোসেন শাহ নৃপতি তিলক"—কবির এই প্রশস্তি ঐতিহাসিক সত্যও বটে।

হোসেন শাহ ছিলেন জ্ঞানী, বিদ্যোৎসাহী ও প্রজারঞ্জক। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় বেশ কিছু ফার্সী গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, আবার পাশাপাশি বিদ্যাবাচস্পতি, যশোরাজ খান, দামোদর, কবিরঞ্জন কেশব বসু প্রমুখ কবিদের উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেন। বহু মসজিদ, দরগা, সরাইখানা, অন্নসত্র ও জলসত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এছাড়া তাঁর আমলে নির্মিত প্রাসাদ, রাস্তাঘাট এসবই তাঁর রুচিবোধ ও তাঁর আমলের সমৃদ্ধির সাক্ষ্য দেয়। সব ধর্মের প্রতিই তিনি সমান শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বাসুদেব সার্বভৌমের ভ্রাতা এবং সনাতনের গুরু মহাপণ্ডিত বিদ্যাবাচস্পতি তাঁর একান্ত শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। চৈতন্যদেবের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন সে কথা বৈষ্ণব জীবনীকাব্য থেকে জানা যায়। প্রতি বছরই তিনি একডালা থেকে পায়ে হেঁটে পাণ্ডুয়ায় যেতেন শেখ নূর কুতুব আলমের সমাধিভূমিতে শ্রদ্ধা জানাতে। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে যা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তা হল তিনি ও তাঁর বংশধরগণ বাংলাকে ধর্মীয় রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার পথ থেকে সরে আসেন। তাঁর পূর্ববর্তী সুলতানরা তাঁদের রাজত্বকালে প্রকাশিত মুদ্রায় নিজেদের খলিফের ডান হাত বা সমার্থক, এবং কোনো কোনো সুলতানতো নিজেকে খলিফ বলে ঘোষণা করেছেন। এঁদের প্রত্যেকের প্রকাশিত মুদ্রায় কালিমা এবং প্রথম চার খলিফের নাম উৎকীর্ণ করেছেন। এইভাবে প্রত্যেক সুলতানই ধর্মকে রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। কিন্তু হোসেন শাহ এই নীতি থেকে সরে আসেন এবং তাঁর বংশধরগণও এই নীতি মেনে চলেন। অবশ্য পূর্ব প্রথানুসরণ করে তাঁর রাজত্বকালের প্রথম দুই তিন বছরের মধ্যে প্রকাশিত কয়েকটি মুদ্রায় কালিমার উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু পরবর্তী আর কোন মুদ্রা এভাবে প্রকাশ পায় নি। জলালুদ্দীন ফতে শাহ অবশ্য এ ব্যাপারে পূর্বসূরী।[১৯] কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে হোসেন শাহ এবং তাঁর উত্তরসূরীদের এই পদক্ষেপ বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে উদার, অসাম্প্রদায়িক এবং স্থিতিশীল করেছিল।

উদার ও সমদর্শী হোসেন শাহ বহু হিন্দুকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেছিলেন, এমনকি ব্যক্তিগত সুরক্ষা ব্যবস্থাতে তিনি নিয়োগ পরিকল্পনায় অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। প্রসঙ্গত বলা চলে কেশব বসুর কথা যিনি তাঁর প্রাসাদরক্ষী পাইকদের নেতা। রূপ-সনাতন তো ইতিহাস প্রসিদ্ধ নাম। বৃন্দাবন দাস বিরচিত চৈতন্য ভাগবত কাব্যে শ্রীচৈতন্য দেব প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য লক্ষণীয়।

"হিন্দু যারে বোলে 'কৃষ্ণ' খোদায় যবনে।
সেই তিঁহ নিশ্চয় জানিহ সর্বজনে॥
আপনার রাজ্যে সে আমার আজ্ঞা বহে।
এই নিজ রাজ্যেই আমারে কতজনে।
মন্দ করিবারে লাগিয়াছে মনে মনে॥
তাঁহারে সকলদেশে কায় বাক্য মনে।
ঈশ্বর নহিলে বিনা অর্থে ভজে কেনে॥[৯]

এখানে কেবল চৈতন্যদেবের প্রতিষ্ঠা তাঁর শ্রদ্ধা প্রকাশিত হচ্ছে তাই নয়, সহজ অনাড়ম্বর এই সত্য একজন রাজার জীবনের নানামুখী উদ্ভাসন, হোসেন শাহ নিজেও অবশ্য সর্বজনমান্য এবং শ্রদ্ধেয় নরপতি ছিলেন।

হোসেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নাসিরুদ্দীন নসরত শাহ সিংহাসনে বসেন (১৫১৯ খ্রিঃ) পিতার যোগ্য উত্তরসূরী হিসাবে সামরিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাংলার গৌরব অটুট রেখেছিলেন। রাজ্য শাসনের প্রথম দিকেই তাঁকে উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে আসা শত্রু বাবরের মুখোমুখি হতে হয়েছিল, এবং কূটনৈতিক দক্ষতার পরিচয় দিয়ে তিনি বাংলাকে রক্ষা করেন। বাবরের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হলে আফগানদের অন্তর্দ্বন্দ্বের

সুযোগে দখল করা অঞ্চলগুলি নসরত শাহের অধিকারচ্যুত হয়, কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া অংশগুলির উপর তাঁর সার্বভৌমত্ব অটুট থাকে। যুদ্ধের পরেও বাবরের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হলে বাংলার উপর বাবরের পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা লোপ পায়। নসরত শাহের রাজত্বের শেষ দিকে বাংলা বাহিনী আসাম অভিযানে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করে। কিন্তু এই যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই জনৈক আততায়ীর হাতে নসরত শাহের মৃত্যু হয়।

নসরত শাহের মৃত্যুর পর (১৫৩২ খ্রিঃ) তাঁর পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ সিংহাসনে বসেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁকে হত্যা করে তাঁর পিতৃব্য হোসেন শাহের পুত্র গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহ সিংহাসন দখল করেন (১৫৩২-৩৩ খ্রিঃ)। ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে দিয়ে রাজ্য লাভের জন্য তাঁকে প্রভাবশালী আমীর ওমারাহরা সুলতান হিসাবে মেনে নিতে অস্বীকার করেন। ফলে দেখা যায় আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। সুলতান হিসাবে গিয়াসুদ্দীন ছিলেন অকর্মণ্য এবং অযোগ্য। বাংলার এই অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে বিহারের আফগান নেতা শের খান বাংলা জয় করে হোসেন শাহী বংশের উচ্ছেদ সাধন করেন। ফলে সমাপ্তি ঘটে বাংলার স্বাধীন সুলতানীর।

পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় আসে চারটি চিনা প্রতিনিধি দল, শেষ দলে আসা মাহুয়ান নামে এক পর্যটকের রচনায় এই দলগুলির অভিজ্ঞতার কথা জানা যায়। ১৫৩২ খ্রিঃ মা হুয়ান প্রথমে চট্টগ্রামে আসেন, তারপরে আসেন তৎকালীন বাংলার রাজধানী পাণ্ডুয়াতে। তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী জানা যায় বাংলায় উৎপাদনের অপ্রতুলতা ছিল না, বাণিজ্য হত, ধনীদের নিজস্ব জাহাজ ছিল, কিছু লোক ফার্সীতে কথা বললেও বাঙালির সর্ব সাধারণের ভাষা বাংলাই ছিল। দৈনন্দিন লেনদেনের মাধ্যম ছিল কড়ি। বছরে দুবার ধান ও অন্যান্য শস্য হত। বাজারে চা বিক্রী হত না। রেশমের উৎপাদন ছিল। বস্ত্র উৎপাদন ভালো হত।[১০]

চতুদশ শতকের মাঝামাঝি ইবন বতুতা বাংলায় এসেছিলেন। তাঁর লেখাতেও রেশম কাপড় উৎপাদনের কথা জানা যায়।[১১]

ষোড়শ শতাব্দীর পর্তুগীজ দুয়ার্ত বারবোসার লেখা থেকে জানা যায় বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের কথা। জানা যায় বন্দর ছেড়ে ভিতরে ঢুকলে বর্ধিষ্ণু নগরের সন্ধান মেলে যেখানে আরবি, পারসিক ও ভারতীয়রা থাকে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী বণিকদের বড় জাহাজ আছে। এছাড়াও চীনা জাহাজ বা জাঙ্ক ছিল মূলত বৈদেশিক বাণিজ্যে কাজে লাগত। বারবোসার লেখা থেকে জানা যায় জাঙ্কগুলি করমণ্ডল, মালাঙ্কা, সুমাত্রা, পেগু, খাম্বাজ, সিংহল প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করতে যেত। তুলোর চাষ ও কার্পাস বস্ত্রের উৎপাদনের কথা জানা যায়। আখের চাষ ও গোল মরিচের চাষের কথা জানা যায়। চিনি গুঁড়ো করে চামড়ার থলিতে সেলাই করে রপ্তানী হত। মুসলমান বণিকদের বিলাসী জীবনযাত্রার কথাও বারবোসার লেখায়[১২] পাওয়া যায়। একথা অবিসংবাদিত ভাবে সত্য যে বারবোসা গৌড় শহরের কথা বলেছেন। সমকালীন পর্তুগীজ ঐতিহাসিক জোয়াও দ্য ব্যারস বাংলার বাণিজ্য সম্পর্কে বলেছেন যে ঐ বাণিজ্য গুজরাট ও বিজয়নগরের মিলিত বাণিজ্যের থেকেও বেশি।[১৩] ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষভাগে পর্যটক র‍্যালফ ফিচ ও সিজার ফ্রেডারিক প্রায় একই ধরনের কথা বলেছেন যা ব্যারসের কথার সঙ্গে মিলে যায়। এই বর্ণনাগুলি একথা প্রমাণ করে বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্য বেশ জোরদার ছিল। মঙ্গলকাব্য গুলিতে নৌবহরের বর্ণনা আর সমুদ্রযাত্রার বিবরণ কেবল পাল সাম্রাজ্য সমকালীন সময়ের স্মৃতিমাত্র নয়, তা বর্তমানও বটে। তবে চৌদ্দডিঙা মধুকরের বহর নেমেছিল সাতে একথাও সত্যি। মুকুন্দরামের রচনায় কালকেতুর নগরপত্তনের সময় যে নানা শ্রেণির জীবিকাধারীর কথা লেখক বলেছেন, স্বর্ণকার, লৌহকার, কাগজী, মলঙ্গী ইত্যাদি তা ষোড়শ শতাব্দীর শেষের। কিন্তু পর্তুগীজ ও চীনা পর্যটকদের বিবরণ মেলালে দেখা যায় পঞ্চদশ শতাব্দীতেও তা প্রায় একই রকম ছিল।[১৪]

অরাজকতা ও নানা অসুবিধার কথা জানা যায় পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের দিক থেকে যার সাক্ষ্য দেয় বৈষ্ণব

সাহিত্য ও মঙ্গলকাব্যগুলি। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে জানা যায় সিলেটে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের কথা যার ফলে চৈতন্যদেবের মা-বাবা সিলেট ছেড়ে নবদ্বীপে আসেন। এর আগেও অনেক এভাবে ভাগীরথী তীরে এসে বসতি স্থাপন করেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকের বৈষ্ণব লেখকদের লেখায় আমরা নবদ্বীপের জনবসতির ছবি পাই। চূড়ামণি দাসের লেখা থেকে জানা যায় বারকোনা ঘাটের পিছনে তখনো ফাঁকা জায়গা পড়ে আছে। নবদ্বীপে আমরা হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণির সাক্ষাৎ পাই। মুসলমানের বাস শহরের বাইরে, পেশা ছিল সম্ভবত জোলা ও দর্জির। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই ভালো ছিল। একজন কাজীও তাদের জন্য নিযুক্ত ছিলেন। বৃন্দাবন দাসের রচনা থেকে জানা যায় নবদ্বীপের হিন্দু মধ্যবিত্তদের কথা, জানা যায় হিন্দু কবিরাজ, বৈশ্য (ব্যবসাজীবী) তামাক বিক্রেতা, কলু তাঁতি, নাপিত, স্বর্ণকার প্রভৃতির কথা। উচ্চ মধ্যবিত্ত থেকে নিম্ন মধ্যবিত্ত সবার কথাই এখানে পাওয়া যায়। গৌড়-সপ্তগ্রাম যখন সমৃদ্ধি হারানোর পথে তখন নবদ্বীপ ছাড়াও শান্তিপুর, কাটোয়া, ফুলিয়া, খড়দহ প্রভৃতি শহরগুলি গড়ে উঠছে। এইসব নবপ্রসারিত শহরে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আধিপত্য জোরদার ছিল। চৈতন্যদেবকে বাধা দিতে ব্রাহ্মণরা কতটা সক্রিয় ছিল তা যে কোন বৈষ্ণব কবির রচনায় জানা যায়। বস্তুত প্রাক্ চৈতন্যদেব বাংলার সমাজ ছিল ব্রাহ্মণ্য অনুশাসন শাসিত। সমাজে বণিকের অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি যাই থাক সামাজিক মর্যাদায় সাধারণ ব্রাহ্মণের থেকে তার স্থান নিচে। একদিকে যেখানে বিদেশী শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটেছে, উৎপাদনের চাহিদা ক্রমবর্ধমান, নতুন নগরায়ণ ঘটছে, অন্যদিকে সেখানে জাতপাতের বিধি নিষেধ। এই বাঁধাধরা গোষ্ঠীর আধিপত্য থেকে মূলত সমাজকে মুক্তি দিলেন চৈতন্যদেব। পুরোহিততন্ত্র, মন্ত্রোচ্চারণ, পূজার উপচার ইত্যাদি সমস্ত বিষয় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটা আধ্যাত্মিক আদর্শবাদ তৈরি করলেন যা মানুষকে জাত ধর্মের বেড়া ভেঙে এক হতে সাহায্য করল।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের উদ্ভব শ্রীচৈতন্যের ধর্ম আন্দোলনের ফলে এমন ধারণা বড় অমূলক নয়। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম কোন ষোড়শ শতকীয় ধর্মভাবনা নয়। পূর্ববর্তী বৈষ্ণব ধর্মের উৎস ও প্রবাহিত ধারা, সমকালীন ধর্মমতের প্রবক্তাদের বক্তব্য, গৌড় ব্যতিরেকে অন্যান্য অঞ্চলে প্রবর্তিত ভক্তিবাদ ইত্যাদির সম্যক আলোচনা করে এই বিষয়টি বুঝতে হবে। সাহিত্যিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান সমূহের বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় চৈতন্যের আবির্ভাবের আগে, আদি মধ্যযুগেও বাংলার বুকে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারিত ছিল।[১৫] খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকে দক্ষিণ বিহার ও বাংলাদেশে তুর্ক-আফগানদের রাজনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। একথা অনস্বীকার্য যে বাঙালি সংস্কৃতির মূলোচ্ছেদ করার লক্ষ্য তাদের ছিল না, কিন্তু আকস্মিক রাজনৈতিক পালাবদলের অভিঘাতে বাংলার বুকে নেমে এসেছিল এক অস্থির সময়, যেখানে বাঙালি তার নিজস্বতা হারিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। বিদেশী শাসকরা ধীরে ধীরে বাংলার শাসনক্ষমতায় অংশীদার করে নিল বাঙালিদের। তবে ধর্মপ্রচারের অবাধ স্বাধীনতা যে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত হিন্দুর সংখ্যা বাড়িয়েছিল তা অনস্বীকার্য। বেশ কিছু মন্দিরও ভেঙে ফেলা হয়েছিল। তবে তুর্কী আক্রমণ পরবর্তী পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, বাঙালি হিন্দু সমাজ ভেঙে পড়েনি। একথা অনস্বীকার্য যে বাঙালি ব্রাহ্মণের অবস্থা কিছুটা খারাপ হয়েছিল। কারণ গুপ্ত যুগ থেকেই ব্রাহ্মণরা নানা সুযোগ পেয়ে আসছিল। মুসলমান অধিকার স্থাপিত হলে ব্রাহ্মণদের পুরনো অধিকার খর্ব হয়, ফলে ব্রাহ্মণদের বর্ণভিত্তিক ধর্মীয় অনুশাসন যাবতীয় ভাবনা কেন্দ্রীভূত হল, ব্যাখ্যাত হল নব্য স্মৃতিতে। সম্ভবত এর উদ্ভব মিথিলায়। নব্য স্মৃতিতে লৌকিক ধর্মানুষ্ঠানের গুরুত্ব স্বীকৃত হল। কিন্তু অবস্থানগত কোন উন্নতি হল না শুদ্রদের। পাশাপাশি সমানভাবে উপেক্ষিত হল নারী সমাজ। নানা লৌকিক ধর্মানুষ্ঠান অবশ্যকরণীয় কৃত্যের বা ব্রতের মধ্য দিয়ে স্বীকৃতি দেওয়া হল, কিন্তু ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে শুদ্র এবং নারীকে একই মর্যাদা দেওয়া হল। এবং পাশাপাশি বাড়তে থাকে পুরোহিতদের প্রতাপ

এবং প্রয়োজনীয়তা। ফলে মুসলমান অধিকার হিন্দু বাঙালির যত না উপদ্রব ঘটিয়েছে, স্মার্ত ব্রাহ্মণ্য অত্যাচার তার চেয়ে কিছু কম ঘটায় নি। এরপরে আবার দেখা দিল 'নব্যন্যায়'।[১৬] এটির উৎসও মিথিলা। জটিল এবং কঠিন নব্যন্যায়চর্চার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ব্যাকরণচর্চার প্রসার বাড়াল, ধর্মবিশ্বাস এবং সামাজিক আচরণবিধির নিরিখে সাধারণ মানুষের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ল কেন্দ্রীভূত ব্রাহ্মণ্য শক্তির। নিম্নজাতির হিন্দুদের মধ্যে যাদুবিশ্বাসমূলক নানা আচরণও প্রচলিত ছিল। পাশাপাশি বাড়ল বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা, শাক্ত কৌলাচার, শৈবনাথ যোগবাদ। নবদ্বীপেই তন্ত্রসাধনায় ব্যাপকতা ছিল চোখে পড়ার মত। এই পটভূমিতেই আবির্ভাব ঘটেছিল শ্রীচৈতন্যদেবের। তাঁর আবির্ভাবের সময়ে নবদ্বীপ ছিল বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র যেখানে বসবাসকারী বৈষ্ণবদের অনেকেই এসেছিল শ্রীহট্ট থেকে। শ্রীহট্টে পীর শাহ জালালের প্রধর্ষীকৃত ধর্মান্তরীকরণের হাত থেকে বাঁচতে অনেকেই শ্রীহট্ট থেকে পালিয়ে আসেন। শান্তিপুরে এই বৈষ্ণবদের পুরোভাগে ছিলেন মাধবেন্দ্র পুরী। তাঁর অন্যতম শিষ্য কুমারহট্ট নিবাসী ঈশ্বরপুরীও বৈষ্ণবদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। এরা সামগ্রিকভাবে একটা বৈষ্ণবীয় পরিমণ্ডল তৈরির চেষ্টা করতেন, ধনী হিন্দুদের বিলাসব্যসন, সাধারণ মানুষের মধ্যে যাদুবিশ্বাসমূলক ধর্মাচরণের ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তা তাঁদের পীড়িত করত। আবার বুদ্ধিজীবী হিন্দু বাঙালির যুক্তিতর্কবাদের শুষ্কতা তাঁরা এড়াতে চাইতেন। চৈতন্য পরবর্তী জীবনীকালের প্রায় সবার লেখাতেই এই পরিস্থিতিগুলি যতটা গুরুত্ব নিয়ে আলোচিত। মুসলমান শাসনের কথা ততটা নয়। কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্ন উৎপীড়নমূলক ঘটনার উল্লেখ আছে, যেমন কাজীদলনের বিষয়টি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কোথাও সামগ্রিক অবক্ষয়ের কারণ হিসাবে বিদেশী শক্তির শাসনকেও সম্পর্ক সূত্রে গেঁথে দেখবার চেষ্টা করেন নি। এমনকি দক্ষিণ ভারতের মত গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা বৌদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযান ঘোষণা করেন নি। বৃন্দাবন দাস তো স্পষ্টতই এই সমস্ত দোষের এবং দুর্বলতার মূল উৎস হিসাবে ধনী হিন্দুদের অমিতাচার এবং বুদ্ধিজীবীদের শুষ্কতার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। তাঁদের ধারণা ছিল আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উদারতার অভ্যাস ছাড়া এই সংকট মুক্তি অসম্ভব। সমগ্র মধ্যযুগীয় ভারতেই ভক্তিবাদ একটি বিশিষ্ট মতবাদ হিসাবে তখন ক্রম শক্তিশালী। একাধিক ভক্তিসূত্র রচিত হওয়া ছাড়াও গীতা এবং ভাগবতপুরাণের ভক্তির ব্যাখ্যাও প্রচারিত হয়েছিল। চৈতন্যদেবের নির্দেশিত যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তিবাদ তার রূপরেখা পাওয়া সম্ভব রূপ গোস্বামীর ভক্তিরসামৃত সিন্ধু এবং জীব গোস্বামীর ভক্তিসন্দর্ভতে। ভক্তির মতবাদে প্রথমত জোর দেওয়া হয়েছিল সদাচারের প্রতি। দ্বিতীয়ত, কর্মকাণ্ডবিরোধী ঈশ্বর ভজনের উপায় হিসাবে এর স্বীকৃতি। কিন্তু এ প্রসঙ্গে বলা দরকার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম কিন্তু একেবারে কর্মকাণ্ডের বিরোধী নয়, তৃতীয়ত, ভক্তিই যখন উপাসনার সার তখন জাতপাতের উঁচুনীচু ভেদ, বর্ণশ্রেষ্ঠতা ইত্যাদির গুরুত্ব কমল। সে যুগে এই আধ্যাত্মিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। চতুর্থত, পরোপকার, পরধর্মসহিষ্ণুতা, নিষ্কাম কর্মের আদর্শকে জোরদার করে জাতীয় সংহতি দূরীকরণের পথটিও সুগম হয়। আবার জ্ঞান যেহেতু আংশিক তাই জ্ঞানের অপকর্ষতা সূচিত হয়ে গুরুবাদ প্রাধান্য পায় ভক্তিবাদ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। গুরুই ভক্তিপথের পথপ্রদর্শক বলে স্বীকৃত হয়। বেদান্ত সূত্রে শঙ্কর ভাষ্যে জগৎকে মায়া বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু ভক্তিবাদ তার বিরোধিতা করে। যথার্থ ভক্তের লক্ষ্মণ হিসাবে যেভাবে দৈনন্দিন পার্থিব জীবনকে অস্বীকার করা হচ্ছে তাতে শাঙ্কর ভাষ্যের মতামত সম্পর্কে খুব বেশি বিরোধিতার জায়গা থাকে না। সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত এই রাজনৈতিক, তাত্ত্বিক, সামাজিক পটভূমিকাতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ।[১৭]

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে তিনটি নাম গুরুত্বপূর্ণ ঃ অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ অবধূত এবং স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব। ব্রাহ্মণ্য প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে প্রথম অদ্বৈত আচার্যই গড়ে তোলেন বৈষ্ণব ভাবাদর্শের আবহ। কিন্তু প্রথমত, তিনি জাতপাতের বেড়া ভাঙার ব্যাপারে কতটা আগ্রহী ছিলেন তা বোঝা যায় না। আর তাঁর নিজস্ব ধর্ম সংস্কার নিয়েও বিশেষ কিছু বোঝা যায় না। তিনি ভক্তি থেকে জ্ঞানকে আলাদা করতে

চেয়েছিলেন কিনা তা নিয়ে সংশয়ও থাকে। তাঁকে নিঃসংশয়ে মধুর ভাবের উপাসক হিসাবে গ্রহণ করা যায় না, তাঁর ভগবদ ভাবনায় ভক্তি ও ভাবপ্রবণতার সংমিশ্রণ ঘটেছে বলা যায়। নবদ্বীপের বৈষ্ণব আন্দোলনের অন্যতম নেতা হলেন অবধূত নিত্যানন্দ। সম্ভবত তিনি প্রথম জীবনে বৈষ্ণব ছিলেন না। নবদ্বীপে এসে তিনি দণ্ড কমণ্ডলু ভেঙে ফেলেন। যে আবেগ বা ভাবকেই মূল সম্বল করে ব্রাহ্মণ্য প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধাচরণ নিত্যানন্দ যেন তাঁরই মূর্ত প্রতীক ছিলেন। বস্তুত বৌদ্ধিক মীমাংসা দিয়ে প্রবল ব্রাহ্মণ্য মতবাদকে ধাক্কা দেওয়া সম্ভব ছিল না। চৈতন্যদেব ও তাঁর অন্তরঙ্গদের ভাবপ্রবণতা বা আবেগের প্রয়োজনীয়তা এখানেই অনুভব করা যায়।[১৮] নিত্যানন্দও ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে মধুর ভাবের সমর্থক ছিলেন কি না তা বলা দুষ্কর। বৃন্দাবনদাস বা জয়ানন্দের সাক্ষ্য থেকে তাঁকে দাস্য বা সখ্যভাবের ভাবুক বলেই মনে হয়। জ্ঞানমার্গ সম্পর্কে তাঁর কোন মোহ ছিল না, মানতেন না জাতপাতের বেড়াও। এই বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের ফলে নবদ্বীপ, শান্তিপুর, সপ্তগ্রাম, ফুলিয়া অঞ্চলে উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজে ভক্তি ও ভাব মিশ্রিত বৈষ্ণবীয় ভাবধারা প্রচারের ফলে পৌরোহিত্যমূলক ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে সংঘাত দেখা দিল। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একথাও ভাবা দরকার যে চৈতন্যদেবের পরিকরদের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ। ফলে এই আন্দোলনকে শ্রেণী সংগ্রামের তক্‌মা কখনোই দেওয়া যায় না, এটি সমন্বয় সাধনের সংগ্রাম হিসাবেই প্রতিভাত হয়েছিল।[১৯] আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রাথমিকভাবে প্রধান কেন্দ্রগুলি হল নবদ্বীপ, শান্তিপুর, সপ্তগ্রাম, নীলাচল, বৃন্দাবন ইত্যাদি এবং এর সবগুলিই সমৃদ্ধ নগর। ধীরে ধীরে গ্রামাঞ্চলে যত ছড়াতে থাকে তত এর চলমানতা অনুভূমিক হতে থাকে। এই ধরনের কোন আন্দোলন কেন চট্টগ্রাম বা সোনারগাঁও এর মত কোথাও হল না তা নিয়ে প্রশ্ন জাগে, কিন্তু আবার এ কথাও মনে হয় যে বর্তমান পূর্ববঙ্গের এই সমস্ত অঞ্চল মুসলিম শাসনের আওতায় আসার পর মুসলিম ধর্মের প্রসারের ফলে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার সম্ভাবনাটি ক্ষীণ। একথা অনস্বীকার্য যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম চৈতন্যকেন্দ্রিক। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন বলে যা প্রচারিত, তা কি একান্তভাবে চৈতন্যদেবেরই মত? গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম শব্দ সমষ্টি ব্যবহার করলে তাই এই বিষয়ে ধারণাটির পরিস্ফূরণের দরকার। পুরী অবস্থানকালে সন্ন্যাসী চৈতন্যদেবকে ঘিরেই এই বৈষ্ণব দর্শন দানা বেঁধে ওঠে, এবং অন্য মাত্রা পায় চৈতন্যের নির্দেশে ষড় গোস্বামীর বৃন্দাবনে শাস্ত্র রচনায় হাত দেওয়ায়।[২০] কিন্তু তবুও দিব্যোন্মাদ অবস্থায় যে মানুষটি সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত করলেন তাঁর পক্ষে কোন বিশেষ দর্শন কিভাবে এবং কতখানি গড়ে তোলা সম্ভব তা নিয়ে ভাববার অবকাশ থেকে যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের উৎস আলোচনা করতে গেলে প্রথমে নদীয়ার দিব্য বিস্ময় শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনকথা, তাঁর পরিমণ্ডল, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম এবং চৈতন্যোত্তর কালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অবস্থান সবকিছুই আলোচনা করা প্রয়োজন।

চৈতন্যদেব তাঁর জীবৎকালেই ঈশ্বর বলে স্বীকৃত ও পূজিত। সাধারণ্যে পূজিত এই মহামানবের জীবনসংক্রান্ত নানা বিষয়ে তাই ভাগবত সম্বন্ধীয় প্রক্ষেপ ঘটতে বাধ্য। কিন্তু সেই প্রক্ষেপ বাদ দিয়েও চৈতন্যদেবের একাধিক প্রতক্ষ্যদর্শী ভক্তের রচিত জীবন কথা এবং পরবর্তীকালেরও নানা কবির লেখা চৈতন্যজীবনী চৈতন্য জীবনকথা লেখার মূল উপাদান। চৈতন্য জীবনী রচনার মূল উপদানগুলি তালিকাভুক্ত করলাম ঃ

ক. মুরারি গুপ্তের কড়চা ঃ এটি নামত কড়চা হলেও প্রচলিত গ্রন্থখানি বেশ বড়। চারটি প্রক্রমে, আটাত্তরটি সর্গে মোট উনিশশো ছয়টি শ্লোক আছে। গ্রন্থটিতে অবিসংবাদিতভাবে কিছু প্রক্ষেপ আছে। রচনাকাল সম্পর্কেও মতভেদ আছে। সমালোচকদের মতে গয়া থেকে চৈতন্যের প্রত্যাগমন পর্যন্ত খাঁটি রচনা।

খ. শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ঃ চৈতন্যদেবের পরিকর কাঞ্চনপল্লী নিবাসী শিবানন্দ কনিষ্ঠ পুত্র কবি কর্ণপুর নামে খ্যাত পরমানন্দ সেন রচিত এই মহাকাব্য। তিনি শৈশবে হয়তো শ্রীলচতন্যকে দেখেছিলেন, তবে পিতা এবং অন্যান্যদের মুখে তাঁর সম্পর্কে নানা কথা শুনেছেন। ফলে তাঁর রচনার আলাদা ঐতিহাসিক গুরুত্ব

আছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কাব্যটি কুড়ি সর্গে বিভক্ত। গ্রন্থের রচনাকাল চৈতন্যের তিরোভাবের প্রায় ৯ বছর পর, ১৫৪২ খ্রিঃ। গ্রন্থ রচনায় মুরারি গুপ্তের রচনার প্রভাব আছে।

গ. শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক ঃ নাটকটির রচনাকাল নিয়ে মতবিরোধ আছে, তবে মোটামুটি কবি কর্ণপুরের পরিণত বয়সে, চৈতন্যদেবের পার্ষদদের প্রায় সবারই দেহাবসানের পর নাটকটি রচিত। নাটকটিতে লক্ষণীয়ভাবে চোখে পড়ে কাব্যের কোন কোন অংশের পরিপূরণের প্রচেষ্টা।

ঘ. গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ঃ এটিও পরমানন্দ সেন রচিত গ্রন্থ। তবে এটি নাটক বা নিছক কাব্য নয়। এখানে চৈতন্যদেবের ভক্তদের তত্ত্বনিরূপণ করা হয়েছে। গ্রন্থটির কাল নির্ণয় করা যায় কি না, সে বিষয়ে মতভেদ আছে, তবে নিঃসন্দেহে এটি নাটক বা কাব্য পরবর্তী রচনা, কারণ এখানে কবিতা বা নাটকের উদ্ধৃতি চোখে পড়ে।

ঙ. শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ঃ প্রবোধানন্দ সরস্বতী এই গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে স্বীকৃত। রচয়িতা চৈতন্যদেবের পুরীলীলার প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁর কাব্যময় বর্ণনায় চৈতন্যদেবের ভাববিকাশের বর্ণনার কাব্যমূল্য, ঐতিহাসিকমূল্য দুই-ই অতুলনীয়।

চ. চৈতন্যভাগবত ঃ বাংলা ভাষায় লেখা চৈতন্য জীবনীগুলির মধ্যে প্রাচীনতম চৈতন্যভাগবত। কোন প্রত্যক্ষ দ্রষ্টার লেখা বাংলা জীবনীকাব্য নেই। চৈতন্যভাগবত গ্রন্থটি আগাগোড়া মঙ্গলকাব্যের ধাঁচে রচিত। এটির প্রাথমিক নামও ছিল চৈতন্যমঙ্গল। নিত্যানন্দের আদেশেই তিনি চৈতন্যজীবনকথা রচনায় ব্রতী হন। মুরারি গুপ্তের রচনার অনেক বক্তব্য তাঁর লেখায় পাওয়া যায়। তাঁর কাব্য কালানুক্রমিক নয়, এবং অলৌকিকতা দোষেও দুষ্ট। কিন্তু তবুও তাঁর লেখার ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে।

ছ. জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ঃ আনুমানিক ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত এই কাব্য। জয়ানন্দের গ্রন্থে বৃন্দাবন দাস ছাড়াও একাধিক চৈতন্য জীবনীকাব্যের উল্লেখ আছে। তাঁর গ্রন্থেও প্রচুর অপ্রাসঙ্গিকতা থাকলেও গ্রন্থটির মূল্য অনস্বীকার্য।

জ. লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল ঃ শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের শিষ্য লোচনদাস চৈতন্যমঙ্গলে গৌরনগরবাদের তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। মুরারি গুপ্তের গ্রন্থের নাম তাঁর মতে গৌরাঙ্গচরিত।

ঝ. গৌরাঙ্গ বিজয় ঃ চূড়ামণিদাসের গৌরাঙ্গ বিজয় গ্রন্থটি মোটামুটি ১৫৪২-৫৫ এর মধ্যে রচিত। গ্রন্থটি বেশ কিছু নতুন খবর দেয়।

ঞ. চৈতন্যচরিতামৃত ঃ চৈতন্যদেবের তিরোভাবের প্রায় আশি বছর পরে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই গ্রন্থ রচনা করেন। অনুমান করা হয়, এই গ্রন্থ রচনার সময় বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীর কেউ বেঁচে ছিলেন না। এই গ্রন্থটি বৃন্দাবন দাস বিরচিত চৈতন্যভাগবতের পরিপূরক গ্রন্থ। কারণ যে অংশটি তিনি কম লিখেছিলেন কৃষ্ণদাস তাকেই বিস্তৃতি দিয়েছেন। মূলত অন্ত্যলীলা বর্ণনাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। তিনি উপাদান সংগ্রহ করেন স্বরূপ দামোদরের কড়চা আর রঘুনাথ দাসের মুখে শুনে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর রচনার গুরুত্ব অন্যত্র। তাঁর গ্রন্থ চৈতন্যদেবের জীবন ও আচরণ এবং বৃন্দাবনের গৌস্বামীদের তত্ত্বকথার মধ্যে যোগসূত্র স্বরূপ। তাঁর রচনা সবচেয়ে প্রামাণিক এবং বৈষ্ণব শাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্ত রূপে সর্বজনমান্য। কৃষ্ণদাস সংস্কৃত ভাষায় গোবিন্দলীলামৃত কাব্য লিখেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা লিখেছিলেন। পাণ্ডিত্য কবিত্ব এবং নিরহংকার বৈষ্ণব সত্তার এক অপূর্ব উদ্ভাস তাঁর চৈতন্যচরিতামৃত কাব্যটি।

ট. গোবিন্দদাসের কড়চা ঃ একসময় এই বইটি আলোড়ন সৃষ্টি করে। কাঞ্চন নগরের গোবিন্দ কর্মকার নামে কোন ব্যক্তি চৈতন্যের দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন। কড়চাটি সেই ভ্রণের বিবরণ—এমন বলা হয়ে থাকে। আদিতে দীনেশচন্দ্র সেনের মম কিছু পণ্ডিত একে প্রামাণ্য বলে রায় দিলেও প্রকৃতপক্ষে

গ্রন্থটি জাল এবং পরবর্তীকালে প্রমাণিত যে এটি উনবিংশ শতাব্দীর রচনা। পরবর্তীকালে চৈতন্যজীবনীর অনুকরণে অপরাপর বৈষ্ণব মহান্তদের জীবনী নিয়ে অনেক চরিতকথা রচিত হয়েছিল। সেগুলিও বৈষ্ণব ধর্ম এবং চৈতন্যদেবের অবদান বিষয়ে অনেক তথ্যের আকর। এছাড়া চৈতন্যদেবের নবদ্বীপের প্রত্যক্ষদর্শী ভক্তদের মধ্যে শিবানন্দ সেন, রামানন্দ বসু, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বাসুদেব ঘোষের মত প্রখ্যাত কীর্তনীয়া, নরহরি সরকার প্রমুখ পদকর্তারা চৈতন্যলীলা বিষয়ক যে পদ রচনা করেছিলেন সেগুলি থেকেও তথ্য পাওয়া যায়। ওড়িয়া কবিদের রচনায় সূত্রে কিছু কথা জানা যায়। হিন্দি বা অসমীয়া সূত্রে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই গঙ্গা তীরবর্তী জনপদগুলির মধ্যে নবদ্বীপ সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠতে থাকে। ভৌগোলিক অবস্থানগত সুবিধার জন্য জলপথে বাণিজ্যের ক্রমবিস্তার ছাড়াও রাজধানী গৌড়ের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল সুবিধাজনক। ফলে নবদ্বীপ ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। সেন যুগেই এই সমৃদ্ধির সূত্রপাত। সম্ভবত বখতিয়ার খলজীর আক্রমণে লক্ষ্মণ সেন এখান থেকেই নদীপথে জলঙ্গী হয়ে পূর্ববঙ্গে চলে যান। যাত্রাপথের যোগসূত্র ধরেই পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গ থেকে জনসমাগম হয় নবদ্বীপে। সেন শাসনকাল থেকেই এখানে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের উপনিবেশ গড়ে উঠতে থাকে। মুসলমান অধিকারের পর দেশের অন্যান্য জায়গায় বিদেশী শাসন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপেও উপনিবিষ্ট হিন্দুর সংখ্যা বাড়তে থাকে। একথা স্পষ্ট যে নবদ্বীপে উপনিবিষ্ট ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজের একটি বড় অংশ এসেছিল শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম ইত্যাদি পূর্ববঙ্গের নানা অঞ্চল থেকে। বখতিয়ারের আক্রমণের ফলে সমতট ও পূর্ববঙ্গই দেশীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারাটি বহন করে রাখে। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় সমতটের 'শিলহট্ট' বা শ্রীহট্টের নাম। চতুর্দশ শতাব্দীতে এইসব অঞ্চ লে মুসলমান অভিযানের প্রাবল্যের জন্য শুরু হয় হিন্দুদের গঙ্গাতীরে নবদ্বীপ অঞ্চলে উপনিবিষ্ট হওয়ার প্রবণতা। এমনই এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হয় শ্রীচৈতন্যদেবের।

চৈতন্যের পৈতৃক নিবাস ছিল শ্রীহট্টের উত্তরে আধুনিক 'ঢাকা দক্ষিণ' নামে এক স্থানে। জয়ানন্দের কাব্যে বলা হয়েছে তাঁরা শ্রীহট্টের জয়পুর গ্রাম নিবাসী, এখানে উপেন্দ্র মিশ্র নামে এক বৈদিক পণ্ডিতের সাত ছেলের একজন ছিলেন জগন্নাথ মিশ্র। তিনি দেশ ত্যাগ করে স্থায়ীভাবে নবদ্বীপবাসী হন। বিপুল পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি 'পুরন্দর' উপাধি লাভ করেন। জয়ানন্দের মতে দুর্ভিক্ষ, মড়ক, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি কারণে জগন্নাথ মিশ্র দেশত্যাগ করেন।

শ্রীহট্ট দেশে অনাচার দুর্ভিক্ষ জন্মিল।
ডাকা চুরি অনাবৃষ্টি মড়ক লাগিল॥
উচ্ছন্ন হইল দেশ অরিষ্ট দেখিয়া।
নানা দেশে সর্বলোক গেল পলাইয়া॥
নীলাম্বর চক্রবর্তী মিশ্রী জগন্নাথে।
সবান্ধবে জয়পুরে ছাড়িল উৎপাতে॥
কোন দেশে রহিব সভার অনুমান।
এ দেশে না পাব রক্ষা চল অন্যস্থান॥
আমা সভার বসতিযোগ্য গঙ্গার কূলে।
নন্দ যেন উৎপাতে ছাড়িলেন গোকুলে॥
পূর্বের্ব মোরে কয়্যাছিল এক যতিরাজ।
এ দেশ ছাড়িয়া যাহ নদীয়া সমাজ॥

(জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ঃ নদীয়া খণ্ড)

তিনি আরও বলেন যে চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস উড়িষ্যার জাজপুরে। রাজা ভ্রমর বা কপিলেন্দ্রদেবের ভয়ে তাঁদের শ্রীহট্টে আসা। নবদ্বীপে সম্ভবত জগন্নাথ মিশ্রের বাস নবদ্বীপের মায়াপুর পল্লীতে। তাঁর বিবাহ হয়েছিল নবদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত এবং সম্মানিত নীলাম্বর চক্রবর্তীর মেয়ে শচী দেবীর সঙ্গে। ১৪৮৬ খ্রিঃ ১৮ই ফেব্রুয়ারি, পূর্ণিমায় চৈতন্যদেবের জন্ম। মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী জাতকের লগ্নগণনা করেন। অদ্বৈত আচার্যের পত্নী সীতাদেবী এবং অপরাপর প্রতিবেশিনীরা নবজাতকের নাম রাখেন নিমাই, 'নিম' এর ধবনিসাজুয্যেই সম্ভবত তাঁরা এইভাবে মৃতবৎসা শচীদেবীর এই সন্তানের আয়ু কামনা করলেন। নিমাই এর বাল্য কৈশোরের সুন্দর বর্ণনা আছে বৃন্দাবন দাসের রচনায়। নিমাই বেড়ে উঠছিলেন বাবা মায়ের আদরে, প্রশ্রয়ে, প্রতিবেশীদের স্নেহে। জীবনীগ্রন্থগুলি থেকে তাঁর বাল্য-কৈশোরের নানাবিধ বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁর অনেকটা সময়ই কাটত প্রতিবেশীদের বাড়িতে কারুর ঘরে দুধ, কারুর ঘরে ভাতচুরি করে। খাবার মনের মত না পেলে হাঁড়িও ভাঙতেন, ঘরের শিশুদের কাঁদাতেন। তাঁর স্বভাব ছিল অত্যন্ত জেদী। তাঁর বাল্যজীবনের বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার ছায়া পড়েছে প্রায় সব জীবনী সাহিত্যেই। প্রথমত, একথা অনস্বীকার্য যে তাঁর দিব্যজীবনের প্রভাব জীবনীসমূহের বর্ণনাকে ভাগবতমুখী করেছে, কারণ তাঁর মধ্যে অবতার আর অবতারী এক হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, যে কোন প্রশ্রয়লালিত দুরন্ত শিশুর চিত্রকল্পনায় ভারতীয় লেখনীমাত্রেই বৃন্দাবনের চিরশিশুর চিরমধুর দৌরাত্মের কাছে নতি স্বীকার করে। ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নিমাই-এর কর্ণবেধ ও চূড়াকরণ হল। বাড়তে লাগল তাঁর দুরন্তপনা। যা ক্রমে দৌরাত্মে পরিণত হল।

এহেন দুর্দান্ত নিমাই ছিলেন দাদা বিশ্বরূপের একান্ত বাধ্য, দাদারও স্নেহের আশ্রয় ওই নিমাই। অদ্বৈত আচার্যের কাছে বিশ্বরূপ বেদান্ত ও ভক্তিশাস্ত্র পড়তেন। অদ্বৈত আচার্য সম্ভবত শচীদেবীর দীক্ষাগুরু ছিলেন। এই প্রসঙ্গে অদ্বৈত আচার্যের কথা বলা যায়। প্রাক্ চৈতন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অন্যতম হোতা ছিলেন অদ্বৈত আচার্য। সম্ভবত তাঁর পিতামহ নরসিং নাড়িয়াল রাজা গণেশের মন্ত্রণাদাতা ছিলেন। শ্রীহট্টের বাস তুলে পিতার সঙ্গে বালক অদ্বৈত আসেন শান্তিপুরে। কমলকান্ত বা কমলাক্ষ নাম ছিল তাঁর। মাধবেন্দ্রপুরীর অনত্যম শিষ্য হিসাবে খ্যাতিমান হয়েছিলেন অদ্বৈত। তিনি ছিলেন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। পরবর্তীকালে সপ্তগ্রামের নারায়ণপুরের কাছে নৃসিংহভাদুড়ির দুই কন্যা সীতাদেবী এবং শ্রীদেবীকে তিনি বিবাহ করেন। অর্থাৎ অদ্বৈত আচার্য এই পরিবারের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জীবনীগ্রন্থগুলি থেকে জানা যায় নিমাই এর বিদ্যাশিক্ষা শুরু হয়েছিল বিষ্ণু ও সুদর্শনের পাঠশালায়। পরে ব্যাকরণ শিক্ষার জন্য তিনি ভর্তি হন গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে। কিন্তু এই সময়েই এক নিদারুণ বিপর্যয় ঘটল জগন্নাথ মিশ্রের পরিবারে। বিশ্বরূপ সন্ন্যাস অবলম্বন করে ঘর ছাড়লেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁর নাম হয়েছিল শঙ্করারণ্য[৪৮] দাদার গৃহত্যাগ গভীর ছাপ ফেলে বালক নিমাই-এর মনে। বন্ধ হয় দৌরাত্ম, সারাক্ষণ বাড়িতে বাবা মায়ের কাছেই থাকেন, এমনকি মন দেন লেখাপড়াতেও। বড়ছেলের পরিণামে আতঙ্কিত বাবা-মা বন্ধ করে দিলেন নিমাই-এর পড়া, ভয় পেলেন পাণ্ডিত্য পাছে অবশিষ্ট সন্তানটিকে যদি কাছছাড়া করায়। কিন্তু লেখাপড়ার ঝোঁক তখন নিমাই-এর মাথায়, নানাবিধ দৌরাত্মে আদায় করলেন টোলে যাওয়ার অনুমতিপত্র। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে তাঁর সহপাঠী ছিলেন মুরারী গুপ্ত, মুকুন্দ দত্ত প্রমুখ। ধীরে ধীরে নিমাই-এর দুরন্তপনা মাত্রা ছাড়াতে লাগল, পাশাপাশি পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছড়াল। প্রায় ষোলো বছর বয়সে লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে এবং এরপর তিনি অধ্যাপনা শুরু করেন। মুকুন্দসঞ্জয়ের টোলে তিনি ব্যাকরণ শিক্ষার পাঠশালা খুলেছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখা থেকে জানা যায় এই সময় নিমাই-এর মধ্যে অদৃষ্টপূর্ব ভাববিকার দেখা যেত। কিন্তু তবুও দৈনন্দিন জীবন চলছিল ধীর গতিতে। এরপর তিনি নগরভ্রমণ শুরু করেন। তাঁতি, গোয়ালা, গন্ধবণিক, মালাকর, তাম্বুলি, শাঁখারি পল্লীতে তিনি ঘুরতে থাকেন—এভাবেই হয়তো বাড়তে থাকে জনসংযোগ। কিছুকাল পরে তিনি পূর্ববঙ্গ যাত্রা করেন। সম্ভবত আর্থিক বিষয়ে সুরাহা করাই তাঁর পূর্ববঙ্গ গমনের উদ্দেশ্য ছিল। এখানেই আলাপ

হয় আত্মীয় তপন মিশ্রের সঙ্গে যিনি পরে কাশীবাসী হন। পরে এঁর বাড়িতেই নিমাই আতিথ্য গ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ববঙ্গ বাসের সময়েই লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু হয়। দেশে ফিরে এই সংবাদে প্রবল আঘাত পেলেও অধ্যাপনা চলতে লাগল। কিন্তু কমল না চাপল্য, পূর্ববঙ্গীয়দের দেখলে নকল করে তাদের রাগানো। কিছুকাল পরে সনাতন পণ্ডিতের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।[২১]

নিমাই-এর জন্মের আগেই নবদ্বীপে বৈষ্ণব গোষ্ঠী সক্রিয় ছিল। এই গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন অদ্বৈত আচার্য। মূলত তাঁর বাড়ি এবং শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ি ছিল এই বৈষ্ণবদের একত্রিত হওয়ার স্থান বৈষ্ণবদের ভাবাবেগ, সংকীর্তন, আবেগ সর্বস্বতা দেখে অনেকেই তাঁদের উপহাস করতেন। অদ্বৈত আচার্যের বাড়ির হরিনাম বাসরের সাহচর্যে এসেছিলেন বিশ্বরূপ। পরে তাঁর সন্ন্যাস নেওয়ার পর মা শচীদেবীর বিরূপ মানসিক প্রতিক্রিয়া সঙ্গত কারণেই হয়তো নিমাই-এর এই গোষ্ঠীর প্রতি বিরূপতা ছিল। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই এই প্রাণবন্ত তরুণকে গোষ্ঠীভুক্ত করার আকাঙ্ক্ষা ছিল বৈষ্ণবদের মনে। এই সময়ে নবদ্বীপে বৈষ্ণব গোষ্ঠী জোরদার হয়ে উঠেছিল 'যবন' হরিদাসের আগমনে। তাঁর জন্মস্থান ছিল যশোহর জেলার বুঢ়ন গ্রাম। হরিদাস দিনে তিন লক্ষ বার নাম জপ করতেন। নবদ্বীপের এহেন পরিস্থিতি যখন, তখন নিমাই গয়ায় গেলেন অপঘাতে মৃতা স্ত্রী লক্ষ্মীদেবীর প্রেতকৃত্য করতে। অন্যান্য সঙ্গীর কথা জানা যায় না, তবে মেসো চন্দ্রশেখর আচার্য এ যাত্রায় তার সঙ্গী হলেন। গয়ায় ফল্গুতীর্থে পিতৃতর্পণ, প্রেতশিলায় পত্নীর পিণ্ডদান ছাড়াও তিনি নানা তীর্থ দর্শন করেন। এখানেই ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তিনি তাঁর কাছে দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা নেন। ঈশ্বরপুরী ছিলেন মাধবেন্দ্রপুরীর অন্যতম শিষ্য। অদ্বৈত আচার্যের মত তিনিও কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। প্রায় সমস্ত জীবনীকারেরা এ বিষয়ে একমত যে এরপরেই বিপুল পরিবর্তন হয় নিমাই-এর স্বভাবের। ইষ্টমন্ত্র ধ্যান করতে করতেই তিনি ভাবাবেগে আকুল হতেন। গয়া প্রত্যাবৃত নিমাই একেবারে অন্য মানুষ—সুনম্র, বিনীত, অন্তর্মুখী। এবার নিজেই যোগ দিলেন নবদ্বীপের বৈষ্ণব গোষ্ঠীতে।[২২] শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়িতে প্রথম বৈষ্ণবগোষ্ঠীর সঙ্গে তিনি মিলিত হন। তার ভাবব্যাকুলতা সকলকেই বিস্মিত করে। আবার অধ্যাপনা শুরু হল, কিন্তু ভাবাবেশের জন্য টিকল না অধ্যাপনার কাজ। সকলে বায়ুব্যাধির প্রকোপ ভাবলেও বৈষ্ণবরা বুঝলেন এসব মহাভাবের লক্ষণ।[২৩] এই সময়েই একদিন অদ্বৈত পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়ে, কৃষ্ণজ্ঞানে পুজো করলেন নিমাইকে। কিছুকাল পরে অদ্বৈত আচার্য ফিরে গেলেন নবদ্বীপ ছেড়ে শান্তিপুরে। বৈষ্ণব সংকীর্তকরা নিমাই-এর বাড়িতে মিলিত হলেও পরে হয়তো শচীদেবীর বিরূপতার কারণে শ্রীবাসের উঠোনে নাম সংকীর্তন করতে থাকেন। নবদ্বীপের বৈষ্ণব সমাজের পক্ষে এই সময়কার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল নবদ্বীপে নিত্যানন্দের আবির্ভাব। নিত্যানন্দের সম্ভবত অবধূত ছিলেন। অল্প বয়সেই সন্ন্যাসীর সহচর হয়ে তিনি বহু তীর্থ ভ্রমণ করেছিলেন। শচীদেবী তাঁকে ফিরে আসা বিশ্বরূপ মনে করতেন, অত্যন্ত স্নেহও করতেন। নিত্যানন্দের অসম্বৃত আবেগ, আচরণ, অনন্য সাধারণ ছিল। নিমাই-এর সহযোগী হয়ে তিনি নাম সংকীর্তনকে জনসাধারণের কাছে ছড়িয়ে দেন। গোষ্ঠী ক্রমশ শক্তিশালী হতে থাকে, শান্তিপুর থেকে আসেন সপরিবার অদ্বৈত আচার্য, সর্বসমক্ষে তিনি নিমাইকে কৃষ্ণের অবতার বলে বন্দনা করলেন। বৈষ্ণবদের গোষ্ঠী ক্রমশই বাড়তে থাকে, বাড়তে থাকে নানা জনের ঔৎসুক্যও। এই পর্বের উল্লেখযোগ্য ও বহু পঠিত ঘটনা 'কাজিদলন' যেখানে নগর সংকীর্তনরত বৈষ্ণবের দল বাধাকে অগ্রাহ্য করে রাজপ্রতিনিধি কাজিকে নানাভাবে উপদ্রুত করে নাম সংকীর্তনের প্রতি সমর্থন আদায় করেন—

কাজি বলে শুনভাই কি গীত বাদন।
কিবা কার বিভা কিবা ভূতের কীর্তন॥
মোর বোল লংঘিয়া কে করে হিন্দুআনি।
ঝাট যানি আও তবে চলিব আপনি॥

কোটি কোটি হরিধবনি মহা কোলাহল।
স্বর্গ মর্ত্য পাতালাদি পুরিল সকল॥
শুনিয়া কম্পিত কাজি গণ সহে ধায়।
সর্প ভয়ে যেন ভেক ইন্দুর পালায়॥
পুরিল সকল স্থান বিশ্বম্ভর গনে।
ভয়ে কেহ পালাইতে দিগ নাহি জানে॥
যার দাড়ি আছে সে হঞা অধোমুখ।
নাচে মাথা নাহি তোলে করে হাল বুক॥

(বৃন্দাবন দাস বিরচিত চৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড)

তবে এই বিষয়টিকে শাসকদলের উৎপীড়ন বলে মনে করলে ভুল হবে বলে মনে হয়। এই সময়কার উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল 'শ্রীধরজলপান'। সংকীর্তনরত দলের মধ্যমণি নিমাই তৃষ্ণার্ত হয়ে খোলাবেচা শ্রীধরের উঠোনে রাখা লোহার পাত্রের জল অন্যান্য বৈষ্ণবদের মানা সত্ত্বেও খেয়ে নেন। ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি এবং ন্যায়শাস্ত্রের যুগে ব্রাহ্মণ্য বিধান লঙ্ঘন করার এই প্রমাণ নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক—

দেখ ভাই সব এই ভক্তের মহিমা।
ভক্তবাৎসল্যের প্রভু করিলেন সীমা॥
লৌহময় জল পাত্র বাহিরের জল।
পরম আদরে পান করিলেন সকল॥
পরমার্থে পান ইচ্ছা হইল যখনে।
শুদ্ধামৃত ভক্তজল হইল তখনে॥
ভক্তি বুঝাইতে সে তখনও পাত্রে জল।
পরমার্থে বৈষ্ণবের সকল নির্মল॥

(বৃন্দাবন দাস বিরচিত চৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড)

এভাবে এক বছর কাটার পর নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন—

"প্রভু বোলে মুকুন্দ শুনহ কিছু কথা।
বাহির হইমু আমি না রহিব এথা॥
গারিহস্থ আমি ছাড়িবাঙ সুনিশ্চিত।
শিখা সূত্র ছাড়িয়া চলিব যে তে ভিত॥
শ্রী শিখায় অন্তর্ধান শুনিয়া মুকুন্দ।
পড়িলা বিরহে সব ঘুচিল আনন্দ॥
কাকু করি বোলে যে মুকুন্দ মহাশয়।
যদি প্রভু এমত করিবা সুনিশ্চয়॥
দিন কথো এই রূপে করহ কীর্ত্তন।
তবে তুমি করিহ যে'রা তোমার মন॥
মুকুন্দের কাকু শুনি শ্রী গৌরসুন্দর।
চলিলেন যথায়ে আছেন গদাধর॥

সম্ভ্রমে চরণ বন্দিলেন গদাধর।
প্রভু বোলে শুন কিছু আমার উত্তর॥
না রহিব গদাধর আমি গৃহবাসে।
যে তে দিগে চলিবাঙ কৃষ্ণের উদ্দেশে॥
শিখা সূত্র আমি সর্বথায় না রাখিব।
মাথা মুণ্ডাইয়া যে তে দেশেতে চলিব॥
শ্রী শিখার অন্তর্ধান শুনি গদাধর।
বজ্রপাত হইল যেন শিবের উপর॥
অন্তরে দুঃখিত হই বলে গদাধর।
যতেক অদ্ভুত সব তোমার উত্তর॥
শিখা সূত্র ঘুচাইলে সে কৃষ্ণ পাই।
গৃহস্থ তোমার মতে বৈষ্ণব কি নাই।
মাথা মুণ্ডাইলে সে সকল দেখি হয়।
তোমার সে মত এ বেদের মত নয়॥
অনাথিনী মায়েরে বা কেমতে ছাড়িবে।
প্রথমেই জননীবধের ভাগী হবে॥
তুমি গেলে সর্বথা জীবন নাহি তান
সবে অবশিষ্ট আছ তুমি তান প্রাণ॥
.....
এইমত আপ্ত বৈষ্ণবের স্থানে স্থানে।
শিখা-সূত্র ঘুচাইমু বলিলা আপনে॥
সবেই শুনিয়া শ্রী শিখার অন্তর্ধান।
মূর্চ্ছিত পড়য়ে কারুর নাহি রহে জ্ঞান।”

(বৃন্দাবন দাস বিরচিত চৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড)

একথা ঠিক যে তাঁর অকস্মাৎ সন্ন্যাস গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণ বোঝা যায় না। যাই হোক নিমাই প্রথমে নিত্যানন্দ, পরে মুকুন্দ ও গদাধরকে জানান। স্থির হয় মাঘের সংক্রান্তিতে কাটোয়ার কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষা নেবেন তিনি। সে সংবাদ শচী দেবী, মেসো চন্দ্রশেখর এবং ব্রহ্মানন্দকে জানানো হল। হরিদাসও জানলেন একথা। চারদণ্ড রাত্রি থাকতে তাঁরা যাত্রার জন্য রওনা হন—

“আই জানে আজি প্রভু করিব গমন।
আইর নাহিক নিদ্রা কাঁদে অনুক্ষণ॥
দণ্ড চারি রাত্রি আছে ঠাকুর জানিয়া।
উঠিলেন চলিবার সামগ্রী লইয়া॥
.....
আই জানিলেন মাত্র প্রভুর গমন।
দুয়ারে আসিয়া রহিলেন ততক্ষণ॥
জননীরে দেখি প্রভু ধরি তান কর।

বসিয়া কহেন প্রভু প্রবোধ উত্তর॥
বিস্তর করিলা তুমি আমার পালন।
পড়িলাম শুনিলাম তোমার কারণ॥
আপনার তিলার্ধেক নাহি কৈলে সুখ।
আজন্ম আমারে তুমি রাখিলে সম্মুখ॥
দণ্ডে দণ্ডে যত তুমি করিলা আমারে।
কোটি কোটি কল্পেও নারিব শোধিবারে॥
তোমার সদ্‌গুণ সে আমার প্রতিকার।
আমি পুনজন্ম জন্ম ঋণী সে তোমার॥
শুন মাতা ঈশ্বরের অধীন সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার।
সংযোগ বিয়োগ যত করে সেই নাথ।
তান ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি আছে কাত।
দশ দিন অন্তর বা কি এখনে আমি।
চলিবাঙ কোন চিন্তা না করিহ তুমি॥
ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার।
সকল আমাতে লাগে সব মোর ভার॥
বুকে হাত দিয়া প্রভু বোলে বার বার।
তোমার সকল ভার আমার আমার॥
.....
জননীর পদধূলি লই প্রভু শিরে।
প্রদক্ষিণ করি তাঁরে চলিলা সত্বরে॥

(বৃন্দাবন দাস বিরচিত চৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড)

সেদিনই তাঁরা কাটোয়ায় পৌঁছলেন, সকালে কেশবভারতী তাঁকে দীক্ষা দিলেন। দীক্ষান্তে গুরুদত্ত নাম হল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্য। তখন তাঁর বয়স ২৩ বছর ১১ মাস ৬ দিন। তাঁর সন্ন্যাসের অব্যবহিত পরবর্তী পদক্ষেপগুলি বোঝা যায় না জীবন কাহিনী থেকে। কেউ বলেন কাটোয়া ত্যাগের পর তিনি কিছুদিন রাঢ় দেশে ঘুরে বেড়ান। কারো মতে তিনি মথুরা বৃন্দাবন যাবেন স্থির করেন। কিন্তু পশ্চিমমুখো পথ চলতে গিয়ে তিনি নীলাচল অভিমুখে চলতে থাকেন। পরে ভাবাবিষ্ট চৈতন্যকে প্রথমে ফুলিয়া, পরে শান্তিপুরে নিয়ে আসা হয়। শান্তিপুরে উপস্থিতির সংবাদ নবদ্বীপে জানাতে গিয়েছিলেন নিত্যানন্দ। নবদ্বীপ থেকে আগত শচীদেবী সহ ভক্তদের সাথে অদ্বৈতের বাড়িতে মিলন হয় প্রভুর। বৃন্দাবন দাস অবশ্য শচী দেবীর আসার কথা লেখেননি। এখানেই চৈতন্যদেব ভক্তদের তাঁর নীলাচলে থাকার সিদ্ধান্তের কথা জানান। তাঁর পুরী যাত্রার সঙ্গী হন নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ এবং আরও কয়েকজন। সম্ভবত কোন তীর্থযাত্রী দলের সঙ্গে তাঁরা পুরী যাত্রা করেন।

শান্তিপুর থেকে যাত্রা করে তাঁরা প্রথমে আটিসারা গ্রাম, পরে "জাহ্নবীর কূলে কূলে" এসে পৌঁছান ছত্রভোগে। সেই সময় হোসেন শাহের উড়িষ্যা আক্রমণের জন্য বাংলাদেশ থেকে উড়িষ্যায় যাতায়াত নিরাপদ ছিল না। ছত্রভোগের 'অধিকারী' রামচন্দ্র খানের সহায়তায় নৌকাযোগে তাঁরা উড়িষ্যার সীমান্তে এসে পৌঁছান। তারপর পায়ে হেঁটে সুবর্ণরেখা নদী পার হয়ে তাঁরা পৌঁছান রেমুনায় ও তারপর যাজপুরে। সেখানে তখনও অনেক

দেবমন্দির ছিল যা পরবর্তীকালে ধবংস করে যুদ্ধোন্মত্ত গৌড় সেনা। এরপর তাঁরা আসেন কটকে। সেখানে সাক্ষী গোপাল দেখে তাঁরা ভুবনেশ্বরে পৌঁছান। অবশেষে কমলপুর পৌঁছে জগন্নাথ মন্দিরের ধবজা চোখে পড়ে। আঠারনালায় পৌঁছে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য একাই ছুটে যান মন্দিরের উদ্দেশ্যে, বাকি সঙ্গীদের পিছনে ফেলে।

মন্দিরে দেবদর্শন সহজ ছিল না। পরদেশীদের জন্য প্রবেশাধিকার ছিল না সেখানে। প্রভাবশালী বাসুদেব সাবর্বভৌম প্রয়োজনীয় সাহায্য করেন। তিনি নবদ্বীপবাসী ছিলেন এবং চৈতন্যের মাতামহ নীলম্বর চক্রবর্তীকে চিনতেন। বৈদান্তিক এই পণ্ডিতকে রাজা মান্য করতেন। তাছাড়া তাঁর ভগিনীপতি গোপীনাথ আচার্যকেও চৈতন্যের সঙ্গীদের অনেকে চিনতেন। বাসুদেব সার্বভৌম তাঁদের দেবদর্শনের সুযোগ করে দেন এবং নিজের মাসির বাড়িতে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করে দেন। কৃষ্ণ দাস কবিরাজের মতে চৈতন্যদেব ফাল্গুন মাসে পুরীতে পৌঁছে দোলযাত্রা দেখেছিলেন।[২৪]

পুরীতে চৈত্রমাস কাটাবার পর ১৫১০ সালে চৈতন্যদেব দক্ষিণাযাত্রার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের কারণ এবং ভ্রমণ বর্ণনা দুইই অস্পষ্ট। যাত্রার লক্ষ্য যে ছিল 'সেতুবন্ধ' এ প্রসঙ্গে সার্বভৌম চৈতন্যকে গোদাবরী তীরে বিদ্যানগরে রায় রামানন্দের সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন। রামানন্দ রায় তখন ছিলেন উড়িষ্যার দক্ষিণ অঞ্চলের শাসনকর্তা। "শূদ্র বিষয়ী" হলেও তিনি "সহজ বৈষ্ণব" ছিলেন। চৈতন্যদেব যে সেতুবন্ধ পর্যন্ত গিয়েছিলেন তাতে অধিকাংশ জীবনীকার নিঃসন্দেহ। গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় এবং আলোচিত হয় "সাধ্য সাধনতত্ত্ব"।[২৫] তত্ত্ববেত্তা ছাড়াও রামানন্দ ছিলেন কবি ও নাট্যকার। তাঁর চার ভাইও উড়িষ্যার রাজদরবারে কাজ করতেন। পিতা ভবানন্দ রায়ও ছিলেন অর্থবান ও সম্মানিত ব্যক্তি। রামানন্দের সমগ্র পরিবারই চৈতন্যদেবের মতাদর্শের অনুগামী হয় এবং পুরীতে চৈতন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিলেন। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ থেকে চৈতন্যদেব ফিরে আসেন পুরীতে ১৫১২ খ্রিস্টাব্দে স্নানযাত্রার কিছু আগে। স্নানযাত্রার পর জগন্নাথের অদর্শনে দুঃখিত মহাপ্রভু আবার গোদাবরী তীরে রামানন্দের কাছে ফিরে যান। চার মাস পরে দু'জন একসঙ্গে পুরীতে ফিরে আসেন। দক্ষিণ ভ্রমণের সময় শ্রীরঙ্গমে চৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরীর গুরুভ্রাতা পরমানন্দ পুরীর সঙ্গে। পরে তিনি চৈতন্য অন্তরঙ্গদের একজন বলে খ্যাত হন।

মহাপ্রভুর ঐকান্তিক ভাবব্যাকুলতা, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব অনেককেই আকৃষ্ট করে, ফলে পুরীর প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অনেকেই তাঁর ভক্ত হন। জগন্নাথ মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক কাশী মিশ্র ছিলেন মহাপ্রভুর ভক্ত। মহাপ্রভুর বাসস্থান নির্দিষ্ট হয় কাশী মিশ্রের টোটা বা বাগানবাড়িতে। উড়িষ্যার মহারাজা প্রতাপরুদ্র এবং তাঁর পরিজনেরা মহাপ্রভুর ভক্তরূপে পরিচিত হন। শিখি মাইতি, তাঁর ভাই ও বোন, কানাই খুটিয়া, তুলসী পরিছা প্রমুখ তাঁর ভক্ত হন। ইতিমধ্যে পুরীতে এসে উপস্থিত হন পরমানন্দ পুরী, স্বরূপ দামোদর প্রমুখ। বাংলা থেকে ভক্তেরা আসে রথযাত্রায় যোগ দিতে। বাংলা থেকে আসেন অদ্বৈত আচার্য, শ্রীবাস, মুরারি গুপ্ত, হরিদাস, শিবানন্দ সেন, বাসুদেব দত্ত, গোবিন্দ ঘোষ, বাসু ঘোষ, রাঘব পণ্ডিত প্রমুখ এবং কুলীনগ্রাম ও শ্রীখণ্ডের 'দুইশত' ভক্তবৈষ্ণব। এই প্রথমবার উড়িষ্যাবাসী রথযাত্রার আগে মহাপ্রভুর বিস্ময়কর নৃত্যরত সংকীর্তন দেখল। অগণিত ভক্তসঙ্গে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত সংকীর্তনানন্দ ছুঁয়ে গেল রাজা প্রতাপ রুদ্রকেও। "অলাতচক্রপ্রভম" (কবি কর্ণপূর) প্রভুর মূর্তি তাঁদের সবার কাছেই ছিল অদৃষ্টপূর্ব। এই সময়েই অদ্বৈত আচার্য চৈতন্যকে অবতার বলে ঘোষণা করেন এবং "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংকীর্তন" করেন। চার মাস পুরীতে অবস্থান করে তাঁরা বাংলায় ফিরে যান। চৈতন্যের ইচ্ছানুযায়ী ভক্তরা তাঁর জীবনের বাকি সময় প্রতিবার রথের সময় পুরী যাতায়াত করতেন।

১৫১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চৈতন্যদেব মথুরা বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে গৌড় যাত্রা করেন। বাংলা-উড়িষ্যার সীমান্ত, মন্ত্রেশ্বর নদ পার হয়ে পিছলদা পর্যন্ত এসে নৌকাযোগে তাঁরা পৌঁছলেন পানিহাটিতে। অবশ্য মতান্তরে জয়ানন্দ বলেন মহাপ্রভু রেমুনা, বাঁশধা, জলেশ্বর, দাঁতন, গড় মান্দারণ হয়ে বর্ধমানের মঞিপুরা বা আমাইপুরায়

তাঁদের বাড়ি আসেন, সেখান থেকে বিদ্যাবাচস্পতির বাড়িতে যান—

শুভক্ষণে যাত্রা করি নীলাচলপরিহরি
উত্তরিল একাম্র বনে
কটক ডাইনে থুএগ মহানৈ পার হআ
প্রবেশিল ব্রহ্মার সদনে॥
তুঙ্গক ভদ্রক পাড়া ছাড়িআ অসুরগড়া
সরো নগরে বাসা করি।
রেমুণা বাঁশদহ দিয়া দাঁতনে রহিল গিয়া
জলেশ্বরে বঞ্চিল শর্বরী॥
ছাড়িয়া দেবশরণ প্রবেশ মন্দারণ
বর্দ্ধমানে দিল দরশন।
জ্যৈষ্ঠ মাসের তাতে উত্তপ্ত সিকতা পথে
তরুতলে করিল শয়ন॥
বর্দ্ধমান সন্নিকটে ক্ষুদ্র এক গ্রাম বটে
মাঞিপুরা তার নাম।
তাহে সুবুদ্ধি মিশ্র গোসাঞির পূর্ব শিষ্য
তার ঘরে করিল বিশ্রাম॥
তাহার নন্দন গুহিয়া জয়ানন্দ নাম থুয়া
রোদনী রান্ধিল তর লএগ।
রোদনী ভোজন করি চলিল নদীয়া পুরী
বায়ড়াত্র উত্তরিলা গিয়া॥"

(জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, বিজয়খণ্ড-৩)

এরপর তাঁরা রামকেলি গ্রামে পৌঁছলে সেখানে হোসেন শাহের দুই উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী সনাতন ও রূপ-সাকর মল্লিক ও দবীর খাস গোপনে চৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হয়। এবং এত লোক নিয়ে তীর্থে যেতে নিষেধ করেন। চৈতন্যদেব ফিরে আসেন শান্তিপুরে। প্রায় আট-ন'মাসের বাংলা পরিক্রমা সেরে তিনি পুরীতে ফেরেন। পুরীতে চাতুর্মাস্য যাপনের পর তিনি যাত্রা করেছিলেন মথুরা বৃন্দাবন। সঙ্গে ছিলেন বলভদ্র ভট্টাচার্য এবং করেকজন ব্রাহ্মণ।

ঝাড়খণ্ডের পথে যাত্রা করে তাঁরা পৌঁছান কাশীতে। সেখানে 'তপন মিশ্র' এবং 'বৈদ্য' চন্দ্রশেখরের বাড়িতে অতিথি হন তিনি। তপন মিশ্রের পুত্র বালক রঘুনাথ সেবা করেছিলেন মহাপ্রভুর। ইনিই পরবর্তীকালে ষড় গোস্বামীর অন্যতম রঘুনাথ ভট্ট। কাশী থেকে প্রয়াগ হয়ে তাঁরা পৌঁছান মথুরায়, এরপর তারপর বৃন্দাবনে। কৃষ্ণলীলা সম্পৃক্ত বিভিন্ন স্থান দেখে ভাবকাতর হয়ে পড়েন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। বলভদ্রেরা তাঁকে প্রয়াগ স্নানের লোভ দেখিয়ে প্রয়াগে নিয়ে আসেন এবং এখানেই রূপ ও তাঁর ছোটভাই অনুপমের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তাঁর। এরপর তিনি কাশী যান। সেখানে সনাতনের সঙ্গে দেখা হয় তাঁর। কাশীতে দ্বিতীয়বার অবস্থানকালে তিনি প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক মায়াবাদী প্রকাশানন্দকে সশিষ্য উদ্ধার করেন। বৃন্দাবন দাসের রচনায় প্রকাশানন্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবত ১৫১৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি পুরীতে ফিরে আসেন। জীবনের বাকি আঠারো বছর তিনি আর পুরী ছেড়ে কোথাও যাননি।

পুরীতে চৈতন্যদেবের নিত্যসঙ্গী ছিলেন রামানন্দ রায়, পরমানন্দ পুরী, হরিদাস, গদাধর, জগদানন্দ, শঙ্কর পণ্ডিত, বক্রেশ্বর, দামোদর পণ্ডিত, রঘুনাথ দাস প্রমুখ। জীবনের পরবর্তী ছয় বছর তিনি কাটান সংকীর্তনানন্দে। যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ডের উপরে ভক্তিই একমাত্র সত্য—এই ছিল তাঁর প্রতিষ্ঠিতব্য। যাবতীয় বর্ণাশ্রম ভেঙে কৃষ্ণভক্তিই তাই তাঁর কাছে গুরুর যথার্থ পরিচয়—

"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেন নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥"

কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যখণ্ড নতুন ছত্র আধ্যাত্মিক অধিকার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক দৃষ্টির সংকীর্ণতামুক্ত হওয়ার পথও এখানে খুলে যায়। তবে তিনি সামাজিক বিক্ষোভ বা বিপ্লবের পথে হাঁটতে চাননি। একথা বোঝা যায় যখন সনাতন জগন্নাথ মন্দিরের সেবায়েতগণকে তাঁর যবনস্পৃষ্ট শরীর থেকে দূরে রাখতে চেয়ে উত্তপ্ত বালির পথ ধরে হাঁটেন, তাকে সমর্থন করে মহাপ্রভু বলেন—

"যদ্যপিও হও তুমি জগৎপাবন।
তোমাস্পর্শে পবিত্র হয় দেবমুনিগণ॥
তথাপি ভক্তের স্বভাব মর্যাদারক্ষণ।
মর্যাদা পালন হয় মধুরভূষণ॥
মর্যাদা লংঘিলে লোকে করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ॥
মর্যাদা রাখিলে তুষ্ট হৈল মোর মন।
তুমি ঐছে না করিলে করে কোন জন॥
(কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যখণ্ড)

সন্ন্যাসী সুলভ কৃচ্ছ্রসাধনকে তিনি যেমন অভিনন্দিত করেছেন, তার পাশাপাশি এও ঠিক যে অনুগামীদের কাছে বর্ণাশ্রমের মর্যাদারক্ষার প্রয়াসও তাঁর অভীপ্সিত ছিল। লোক ব্যবহারে প্রচলিত বিধিকে ধবস্ত করার অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। কিন্তু আধ্যাত্মিক অধিকারে, মানবতার অধিকারে সব মানুষকে সমদৃষ্টিতে দেখার পক্ষপাতী ছিলেন। যা উচিত তাই তিনি বলেছেন, কিন্তু লৌকিক ব্যবহারিক অনুশাসন ভেঙে তাকে গায়ের জোরে প্রতিষ্ঠা দিতে চাননি। সংকীর্তনে কোন ভেদাভেদ তিনি রাখেন নি। বস্তুত এই সংকীর্তনের মধ্যে দিয়েই শাস্ত্র ও সংস্কারের নিগড়মুক্ত হয়েছিল আধ্যাত্মিক চেতনা—

"তবে প্রভু যুগধর্ম স্থাপন করিতে।
সঙ্গাপাঙ্গে অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে॥
কলিযুগে ধর্ম হয় নাম সংকীর্তন।
এতদর্থে অবতীর্থ শ্রী শচীনন্দন॥
এই কহে ভাগবতে সর্বতত্ত্বসার।
কীর্তন নিমিত্ত গৌরচন্দ্র অবতার॥
কলিযুগে সর্বধর্ম হরিসংকীর্তন।
সব প্রকাশিলেন চৈতন্য নারায়ণ॥
কলিযুগে সংকীর্তন ধর্ম পালিবারে।
অবতীর্ণ হইলা প্রভু সর্ব পরিকরে॥"

বস্তুত জাতি-ধর্ম-বর্ণ-মন্ত্র-উপকরণ নির্বিশেষে এ এক অদ্ভুত সাধনপথ যে পথে সবাই চলতে পারে। শচীনন্দনও তাই কোন উপপ্লবের পথে না গিয়েও ঘটিয়ে ফেলেছিলেন এক আধ্যাত্মিক তথা মানবিক চেতনার উন্মেষ।

চৈতন্যের তিরোধান রহস্যাবৃত। জীবৎকালেই যিনি অবতার জ্ঞানে পূজিত, তাঁর তিরোধান সম্পর্কে জীবনীগ্রন্থগুলি ব্যাখ্যাতীতভাবে নীরব। মুরারি গুপ্ত কেবল বলেছেন প্রভু "জগাম নিলয়ং", বৃন্দাবন দাস নীরব। কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচনায় অন্তর্ধানের বছরটির উল্লেখ আছে। এভাবেই প্রামাণ্য সূত্রগুলি আমাদের কিছুই জানায় না। জয়ানন্দ তাঁর চৈতন্যমঙ্গলে লিখেছেন রথাগ্রে সংকীর্তনকালে "ইটাল বাজিল বাম পাত্র আচম্বিতে।" সেই আঘাতের বেদনা বৃদ্ধিই মৃত্যুর কারণ। কিন্তু জয়ানন্দের রচনায় কোথাও কোথাও প্রামাণ্য তথ্যের অভাব থাকায় এই তথ্যটিকে চোখ বন্ধ করে বিদগ্ধমহল মানতে চান না। অন্ত্যলীলা প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন তাঁর কৃষ্ণবিরহ বিকারগ্রস্ততার কথা। চৈতন্যের কম্প, মূর্ছা ইত্যাদি অষ্টসাত্ত্বিক ভাববিলাসের কথাও বিস্তৃত বলেছেন তিনি। নিতান্ত স্বভাববশে জগন্নাথ দর্শন-স্নান-ভোজন করতেন কখনও। কখনও ভাবাবেশ, কখনও অর্ধবাহ্যজ্ঞান, কখনও বা বাহ্যজ্ঞান—এই তিন অবস্থার মধ্যে দিন কাটত। ধীরে ধীরে ভাবাবিষ্টতার মাত্রা বাড়তে থাকে। পরিকরদের সদাসতর্ক দৃষ্টি এড়িয়েও তিনি নানা জায়গায় কৃষ্ণকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়তেন। এমনই দশাগ্রস্ত অবস্থায় একদিন জগদানন্দের হাতে অদ্বৈত আচার্যের পাঠানো একটি প্রহেলী এসে পৌঁছায়, এবং এর ফলে চৈতন্যদেবের 'উদ্‌ঘূর্ণাদশা' অতি প্রকট হয়। এই দিব্যোন্মাদ অবস্থাতেই কাটে বাকি বারো বছর। ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জীবনাবসান হয়। কিন্তু তাঁর তিরোধানের প্রকৃত কারণ নির্ণয় আজও সম্ভব হয়নি। লোচনদাসের বর্ণনা অনুযায়ী আষাঢ় মাসের সপ্তমী তিথিতে চৈতন্য গুণ্ডিচা বাড়িতে জগন্নাথে লীন হয়ে যান। জয়ানন্দ ও লোচনদাসে অবশ্য তিথিটি মিলে যায়—৩১শে আষাঢ় বা ২০শে জুন।

"আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর সে কলিযুগ আর।
বিশেষত কলিযুগে সঙকীর্তন সার॥
কৃপা কর জগন্নাথ পতিত পাবন।
কলিযুগ আইল এই দেহত শরণ॥
এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগৎ রায়।
বাহু ভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায়॥
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥
গুঞা বাড়িতে ছিল পাণ্ডা সে ব্রাহ্মণ।
কি কি বলি সত্বরে সে আইল তখন॥
বিপ্রে দেখি ভক্ত কহে শুনহ পড়িছা।
ঘুচাহ কপাট প্রভু দেখিতে বড় ইচ্ছা॥
ভক্ত আর্তি দেখি পড়িছা কহয়ে কথন।
গুণুবাড়ির মধ্যে প্রভু হৈল অদর্শন॥

(লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, অন্ত্যখণ্ড)

গদাধর শাখাভুক্ত কবি সূর্যব্রহ্মা প্রেমতরঙ্গিনীতে লিখেছেন—"অষ্ট চালিয়া বরষে অন্তর্ধান টোটা গোপীনাথ স্থানে।[২৬] অচ্যুতানন্দ শূন্য সংহিতায় লিখেছেন "জগন্নাথ প্রভু শ্রী অঙ্গরে বিদ্যুৎ প্রায় মিশি গলে"[২৭]। দিবাকর

দাস "জগন্নাথ চরিতামৃতে" লিখেছেন, "এমন্ত কহি শ্রী চৈতন্য জগন্নাথ অঙ্গে লীন।"[২৮]

উড়িষ্যার ভক্তদের ও কবিদের মধ্যেও নানা কথা আছে, কিন্তু মহাপ্রভুর তিরোধানের সঠিক কারণ ও তাঁর নশ্বর দেহের পরিণতি আজও জানা যায় নি।

অনেকে আশঙ্কা করেছিলেন ঈর্ষাতুর জগন্নাথ পূজারী কর্তৃক গুপ্ত হত্যার—কিন্তু মহারাজা প্রতাপ রুদ্র এবং প্রায় সমস্ত মান্য ব্যক্তিত্বই যাঁর ভক্ত তাঁর ক্ষেত্রে এই আশঙ্কা কতটা সত্য হতে পারে তা অনুমান নির্ভর। কিন্তু মহাপ্রভুর নশ্বর দেহের পরিণতি যাই হোক, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত, শাস্ত্র ও সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডিবদ্ধতাকে যতবার মানুষ অতিক্রম করতে পা বাড়িয়েছে, আপন উদ্ধত প্রবৃত্তিকে কোমল, সূক্ষ্ম ও অন্তর্মুখী হবার প্রেরণা দিয়েছে, বৃহত্তর পরিমণ্ডলে মানবতাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছে, চৈতন্যের অমৃতময় বাণী তাকে স্পর্শ করে গেছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের কেন্দ্রে রয়েছেন শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁর দিব্য জীবনের ছবিটি যদি সূত্রকারে প্রকাশ করতে হয় তবে তা প্রাসঙ্গিক তথ্যানুযায়ী সাজালে ঃ

ক. নিজের জীবনাচরণে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। উদ্ধত, তর্কপ্রিয় ব্যঙ্গ বঙ্কিম আচরণ বদলে হয়ে পরলেন ভাবালু, বিনয়ী, কৃষ্ণভক্ত। নিজ জীবনাচরণে বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব ও বৈষ্ণব জীবনধারণের মধ্যে কোনো পার্থক্য তিনি বজায় রাখেননি।

খ. সম্ভবত বৈষ্ণব সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন তিনি। কিছু বৈষ্ণব মহান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ছয় গোস্বামীকে তত্ত্ব দর্শনের লিখিত অনুশাসন গড়ে তোলার দায়িত্ব দেওয়া ছাড়া আর কেন্দ্রীয় সংগঠন তিনি গড়ে তোলননি।

গ. ব্রাহ্মণ্য ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে কোনো বিক্ষোভ গড়ে তোলার চেষ্টা করেননি তিনি। কেবল ক্রিয়াকলাপ মুখ্য ধর্মাচরণের পরিবর্তে ভক্তিকে স্থান দিয়েছিলেন।

ঘ. তিনি নিজে নবদ্বীপে জাতিভিত্তিক পেশাতে এবং ব্যবসায় নিযুক্ত নিম্নবর্গের হিন্দুদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সংযোগ স্থাপন করতেন।

ঙ. কৃষ্ণের নামকীর্তনের প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব ও প্রচার করলেন এবং সার্থক জনসংযোগের উপায় রূপে নামকীর্তন, নগরকীর্তন, ধর্মীয় শোভাযাত্রা এবং বৈষ্ণবদের সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন।

চ. মতবাদের বিশুদ্ধতা রক্ষার দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল। একবার জ্ঞানমার্গের প্রতি অদ্বৈতের ঝোঁক তাঁকে অসহিষ্ণু করে তুলেছিল।

ছ. শচী দেবীর সান্ত্বনা সাধনের জন্যই তিনি পরবর্তী জীবনে পুরীতে অবস্থান করলেও এর অন্যতম তাৎপর্য হল ধর্মস্থান হিসাবে বিখ্যাত পুরীতে আসা বিভিন্ন তীর্থযাত্রীদের কাছে এই ধর্মমত অপরিচিত রইল না। পুরীতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন সৃষ্টির প্রারম্ভিক কাজের সূচনা হয় স্বরূপ দামোদর, এবং রায় রামানন্দের হাতে।

এবার দেখা প্রয়োজন উত্তর চৈতন্যযুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের কি অবস্থান। বৃন্দাবন দাস বিরচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ দুটির আলোচনাক্রমে দেখা যায় শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থে কোথাও রাধার উল্লেখ নেই, কিন্তু কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী তাঁর রচনায় আদ্যন্ত মধুর রসের উপর জোর দিয়েছেন—

আমা হইতে রাধাপায় সে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥
নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে।

সেসুখ মাধুর্য ঘ্রাণে লোভ বাঢ়েচিতে॥
রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেমরস আস্বাদিব বিবিধ প্রকার॥
রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে।
তাহা শিখাইব লীলা আচরণ দ্বারে...॥

(কৃষ্ণদাস বিরচিত চৈতন্যচরিতামৃত, আদি-৪)

যদি নবদ্বীপ লীলার প্রাধান্য পায় দাস্যভাব তবে অবিসংবাদিতভাবে নীলাচলে প্রধান মধুর ভাব। কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচনা থেকে জানা যায় বাংলায় ভক্তিধর্ম প্রচারের দায়িত্ব তিনি দিয়েছিলেন নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈত আচার্যকে। বলা বাহুল্য এঁরা কেউই মধুর ভাবের সাধক নন, এবং নবদ্বীপ লীলায় নামসংকীর্তন, নগর ভ্রমণ ইত্যাদি পর্যায়ে মধুর রস আস্বাদনের সুযোগ নেই। বস্তুত তখন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের গড়ে ওঠার, বেড়ে ওঠার যুগ। তাই সকলকে এক নামগানের আশ্রয়ে টেনে আনা ছিল জরুরী। সকলেই যদি পরম শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের দাস হন তবে উপলব্ধিগতভাগে একটা 'আধ্যাত্মিক গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু দীর্ঘদিনের ভাব ব্যাকুলতায় যখন মহাপ্রভু স্বতোৎসারিত কৃষ্ণপ্রেমের আকুলতায় দীর্ণ হলেন, তখন সেই অতিন্দ্রিয় উপলব্ধির জগতে জনসমবায়ের আর প্রয়োজন রইল না। ব্যক্তির অনুভূতিকেন্দ্রিক মধুর ভাবের আচ্ছন্নতা তাঁকে অধিকার করল নীলাচল লীলার মধ্যভাগে। আর জগৎ ছাড়ানোর ভাব ব্যাকুল অনুভূতির তীব্রতায় তিনি ক্রমশ একা হলেন বহুর মধ্যে থেকেও, যা ধীরে ধীরে পরিণতি পেল দিব্যোন্মাদ অবস্থায়। এই স্ববিরোধ দুর্গম মধুর রসই ছিল বৃন্দাবনের গোস্বামীদের আলোচ্য।[২৯] তাঁরা মধুরের আলোতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের পথ খোঁজার চেষ্টা করতেন। কিন্তু একথাও সত্য যে আধ্যাত্মিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্রে বলবান এই মতাদর্শ কখনও সাধারণ্যে অনুকরণীয় বা পালনীয় হতে পারে না। ফলে এই মধুর রসের আস্বাদনকে নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ অসংখ্য রীতিনীতি, নিয়ম, ধারা প্রবর্তন করলেন, মধুর ভাবের রাশ টেনে ধরার জন্য সংস্কৃত ভাষায় শাস্ত্র রচিত হল, কালক্রমে অসংস্কৃত বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। হয়ে পড়ল অভিজাত ধর্ম পিপাসুর জিজ্ঞাসার উত্তর। মনে প্রশ্ন জাগে—এই পরিণতি কতটা শ্রীচৈতন্যদেবের অভিপ্রেত? স্বভাবতই উত্তর পাওয়া যায় না কারণ আঠারো বছর ধরে 'দিব্যোন্মাদ' অভিধায় পূজিত 'মনের কোণ' বাসী মানুষটির মনে এ নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠাই সম্ভব ছিল না। ধীরে ধীরে উত্তর চৈতন্যযুগে বৃন্দাবনের শাস্ত্র নির্দেশিত পথ এবং পাশাপাশি অদ্বৈত নিত্যানন্দ প্রদর্শিত পথ—দুধারাতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রবাহ বহমান থাকে।[৩০] অদ্বৈত আচার্য এবং তাঁর পত্নী সীতাদেবী ও পুত্র অচ্যুতানন্দের উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছিল শান্তিপুর, নবগ্রাম (বর্ধমান), দশঘরা (হুগলী), গোস্বামী-রংপুর (পাবনা) , জঙ্গলীটোলা (মালদহ), ঝাঁকপাল, লাউড় (শ্রীহট্ট) প্রভৃতি অঞ্চলে। তাঁরা তেইশটি বৈষ্ণব কেন্দ্র গড়েছিলেন। পাশাপাশি বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারে তৎপর ছিলেন নিত্যানন্দ। তাঁর জনসংযোগ ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তা ছিল ঈর্ষনীয়। সপ্তগ্রামের ধনাঢ্য ভূস্বামীপুত্র রঘুনাথ দাস এর অর্থানুকূল্যে নিত্যানন্দ পানিহাটিতে 'চিঁড়ামহোৎসব' বা দণ্ডমহোৎসব নামক বিখ্যাত বৈষ্ণব মহোৎসব করেন। প্রায় সম সময়েই তিনি 'দ্বাদশ গোপাল' কে সংগঠিত করেন, এবং হুগলী, যশোহর, নদীয়া, বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে 'সখ্য' ও 'দাস্য' ভাবের প্রচার করেন। সপ্তগ্রামের বণিকদের 'উদ্ধার' করে ধর্মের প্রচার করেন, এবং কীর্তন গান জনপ্রিয় করে তোলার জন্য তিনি গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ এবং বাসুদেব ঘোষের মত প্রখ্যাত কীর্তন রচয়িতাদের সাহায্য নেন।[৩১] মেলামেশার ক্ষেত্রে কোনরকম জাতবিচার মানতেন না নিত্যানন্দ। তাঁর এই আচরণের জন্য ব্রাহ্মণ এবং রক্ষণশীল বৈষ্ণবেরা তাঁকে পছন্দ করতেন না। এমনকি পুরীতে তাঁরা অভিযোগও জানিয়েছিলেন। কিন্তু স্বয়ং চৈতন্যদেব তা গ্রাহ্য করেন নি। ক্রমে নিত্যানন্দের ও চৈতন্যের মূর্তি একত্রে পুজো শুরু হয়।[৩২] গদাধর পণ্ডিতের কথাও প্রাসঙ্গিক। তাঁর ছিল রাধাভাব। অদ্বৈত আচার্য

তাঁকে অপছন্দ করতেন। কিন্তু নিত্যানন্দের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা ছিল। এভাবেই শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলনে দেখা দিল ভাব বৈচিত্র। ভাব অনন্ত, তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ভাবের অধিকারী ভেদে পাঁচটি সুনির্দিষ্ট স্তর বিভাগ করলেন—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। মধুর ভাব নির্দিষ্ট হল সব ভাবের কেন্দ্রীভূত সারাংশ রূপে। পাশাপাশি কিছু বিতর্কিত মতবাদের প্রসঙ্গও উঠে আসে। শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার চৈতন্য পূজনে যৌন রহস্যবাদের সংক্রমণ ঘটালেন। তাঁর যুক্তি ছিল কৃষ্ণকে যেমন গোপী ছাড়া ভাবা চলে না, তেমনি কলির কৃষ্ণ চৈতন্যকেও নারী সংসর্গ থেকে দূরে রাখা চলে না। তিনি এবং বারাণসীর প্রবোধনন্দ সরস্বতী অবতারণ করলেন গৌর নাগরবাদ এবং গৌরপারম্যবাদের। বলা বাহুল্য এই ধারার রচিত পদগুলি সবগুলি আদিরসাত্মক এবং অবিশ্বাস্য রকমের সঙ্গতিবিহীন।[৩৩] বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদে গৌরনাগরবাদ ছড়িয়ে পড়ে। নরহরি সরকারের অন্যতম শিষ্য হলেন চৈতন্যমঙ্গল ও ধামালী রচয়িতা লোচন দাস।

বৃন্দাবনের গোস্বামীরা যে বহুমুখী গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্ব প্রস্তুত করেছিলেন তা বাংলাদেশে এসে পৌঁছানো সহজসাধ্য ছিল না। কিন্তু নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবী দেবী বৃন্দাবনের গোস্বামীদের বৈধী ভক্তির তত্ত্ব সমর্থন করতেন এবং তা বাংলাদেশে প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন। তিনি নিজে দুবার বৃন্দাবনে যান। বৃন্দাবনেই তাঁর জীবনাবসান হয়। বাংলাদেশের সব বৈষ্ণব গোষ্ঠীতেই তিনি 'ঈশ্বরী' রূপে মাননীয়া ছিলেন। পরবর্তীকালে, বীরভূমের যাজীগ্রামের শ্রীনিবাস আচার্য, রাজশাহীর খেতুরী অঞ্চলের ভূস্বামী পুত্র নরোত্তম দত্ত এবং মেদিনীপুরের ধারেন্দা গ্রামের সদ্‌গোপ জাতীয় বৈষ্ণব শ্যামানন্দ বৃন্দাবনে আসেন এবং গভীরভাবে গোস্বামী শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।[৩৪] এঁদের মধ্যে গভীর সখ্যতা তৈরি হয়। ষড় গোস্বামী নির্দেশিত পথে বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্মের নতুন পথ চলা শুরু হয় এই তিন সতীর্থের হাত ধরে। বাংলাদেশের বৈষ্ণব গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সংযোগ রেখেই বাংলাদেশের বৈষ্ণবধর্মের এই নতুন করে জেগে ওঠা। কাটোয়ায় গদাধর দাসের তিরোধান উপলক্ষে যে বৈষ্ণব সম্মেলন হয় সেখানে অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ, গদাধর পণ্ডিত, নরহরি সরকার প্রভৃতি সব বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মহান্তরা ছিলেন।[৩৫] এখানেই সর্বপ্রথম বৃন্দাবনের গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত প্রচারিত হয়। ১৬১০-২০-র মধ্যে কোন এক সময়ে নরোত্তম দত্তের জ্ঞাতিভাই খেতুরির রাজা সন্তোষ দত্তের উদ্যোগে খেতুরিতে যে বৈষ্ণব সম্মেলন হয় তা অতুলনীয়।[৩৬] এই উৎসবে কীর্তনের নানা ঘরানারও গৌরচন্দ্রিকা গাইবার প্রথা শুরু হয়।[৩৭] এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শ্রীচৈতন্যের মূর্তিপূজন, বিভিন্ন নামে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার মূর্তি প্রতিষ্ঠা ও পূজন, কীর্তন, মহাপ্রভুর জন্মদিন পালন এবং ভাগবত, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত পাঠে গুরুত্ব দেওয়া হয়।[৩৮] বৃন্দাবনী মতাদর্শে শ্রীকৃষ্ণই প্রাধান্য পেলেন। তাঁর সঙ্গে চৈতন্যদেবের আধ্যাত্মিক সম্পর্কটি বিচারে দুরূহ কাজটি করেছিলেন কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী তাঁর মহাগ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে। শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ তাঁদের শিষ্যাদি সহ বৃন্দাবনী ভাবধারা প্রচারে সক্রিয় ছিলেন। শক্তিশালী হয়ে ওঠেন ছয়জন চক্রবর্তী, আটজন কবিরাজ, ছয়জন ঠাকুর এবং একজন রাজা (বীর হাম্বির)। বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদের কোনো কোনো অঞ্চলে শ্রীনিবাস এবং তাঁর কন্যা হেমলতা দেবীর প্রভাব ছিল। উৎকল, ঝাড়খণ্ড এবং মেদিনীপুরে ব্যাপকভাবে ধর্মপ্রচার করেন শ্যামানন্দ এবং তাঁর শিষ্য রয়নীর রাজার পুত্র রসিকানন্দ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনের মূল কেন্দ্র খেতুরিতে ছিলেন নরোত্তম দত্ত। কিন্তু বৃন্দাবনী ভাবধারা প্রচারের পাশাপাশি অন্য ছবিও ছিল। যেহেতু চৈতন্যদেবের অব্যবহিত পরেই তাঁর চিন্তাধারার কোন সর্ববৈষ্ণবগ্রাহ্য ব্যাখ্যা ছিল না, তাই ভাব ও ভাষ্যের নানা রকমফের দেখা যায়। মতবাদের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা থাকায় ষোড়শ শতকেই কোথাও প্রবল হয়ে ওঠে সহজিয়া ভাবধারা, কোথাও দাস্য এবং সখ্য ভাবধারা প্রবল হয়।[৩৯] নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্র বৌদ্ধ সহজিয়া 'নেড়ানেড়ি'দের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দেন।[৪০] দাস্য আর সখ্য ভাবের মিশেলে গড়ে ওঠে মঞ্জরী ভাবের সাধনা। 'দ্বাদশ গোপালের' ক্রমবর্ধমান শক্তি অগ্রাহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠল।[৪১] এভাবেই ক্রমশ বাড়তে লাগল বিশৃঙ্খলা। বৃন্দাবনী ব্যাখ্যার সমাদরের কারণে বাঙালি

বৈষ্ণব মতবাদগুলি গুরুত্ব হারিয়ে ফেলল অনেকাংশে। আবার বৃন্দাবনী তত্ত্বেও সমস্যার বেশ কিছু জায়গা ছিল। কৃষ্ণ ও রাধার স্বকীয়া পরকীয়া তত্ত্বের বিরোধ তো ছিলই, তাছাড়া সাধন পদ্ধতি নিয়েও বেশ কিছু সমস্যার উদ্ভব হল। শ্রীকৃষ্ণের লীলার প্রহরে প্রহরে স্মরণ-মনন-নিদিধ্যাসন ছিল গোস্বামী ধর্মমতের মূল কথা। কিন্তু চৈতন্য লীলা কখনই কৃষ্ণলীলার অনুকূল নয়। ফলে এই দুয়ের মিশ্রণ ছিল দুঃসাধ্য। এভাবে একাধিক সমস্যার উদ্ভব আর তা থেকে নিষ্ক্রমণের জন্য একাধিক তত্ত্বের উদ্ভব—এভাবে সাধন পদ্ধতির এক স্থবিরতার নাগপাশ থেকে মুক্তি খুঁজতে চেয়ে উত্তর চৈতন্য বৈষ্ণব ধর্ম অনেকাংশেই বাঁধা পড়ল অন্য স্থবিরতায়। কিন্তু তবুও আলোচনার শেষাংশে থাকুক সদর্থক দিকগুলি—

(ক) বৈষ্ণব ধর্ম বামাচারী তান্ত্রিক ধর্মাচরণের অবসান ঘটায়।

তান্ত্রিক কৌলাচায় এবং বাসুলী-মনসা-চণ্ডীপূজা এবং "মদ্যমাংস দিয়া" যক্ষপূজার নিন্দিত বিবরণ পাই বৃন্দাবন দাস বিরচিত চৈতন্যভাগবতে। তাছাড়াও সমকালীন প্রতিবেশে তান্ত্রিক সাধকদের রমরমার চিত্র বৃন্দাবন দাসের রচনাতেই রয়েছে, যেখানে বৈষ্ণবদের সংকীর্তনকে দুরাচারের আখড়া বলে মন্তব্য করে সেকালের সমাজ মন্তব্য করেছেন "রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনাইয়া" রঙ্গরসে তাঁরা সময় অতিবাহিত করেন। সাধনা সেখানে ভান মাত্র। ধর্মকর্মের আবরণে যথেচ্ছাচারের এ এক সমকালীন প্রমাণ।

(খ) জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে মনুষ্যত্বের সমাদর ঘটে।

স্মার্ত পণ্ডিতদের বিধিনিষেধ ভেঙে যখন উচ্চারিত হল "চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণ"—তখনই চৈতন্য নবজাগরণের আলোকদীপ্ত বাংলা এক নতুন ইতিহাস রচনা করল। জন্ম নয়, কর্মই মানুষের পরিচায়ক হল। সংকীর্তন আর নামজপের মধ্যে সীমায়িত হয়ে মুক্তি পেল মানুষের আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা। জাতপাত কি একেবারে উঠে গেল? তা নয়। তবে ভাবাকুলতার জোয়ারে তার বেড়া অনেকটাই ভেঙে ভেসে গিয়েছিল একথা অবিসংবাদিত সত্য।

(গ) নারীর সম্মান বৃদ্ধি, শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

বৈষ্ণব ধর্মের নারীর মর্যাদা ছিল প্রশ্নাতীত। অদ্বৈত আচার্যের পত্নী সীতাদেবী, নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবা দেবী, পরবর্তীকালে শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা দেবী বৈষ্ণব সমাজে পরম বরণীয়া ও পূজ্যা ছিলেন। নিয়মিত শাস্ত্রচর্চার পাশাপাশি নারীশিক্ষা প্রসারেও তাঁদের ভূমিকা অবিসংবাদিত। বহু শিষ্য তাঁদের কাছে ভাগবত পুরাণাদির জ্ঞানগর্ভ ব্যাখ্যায় সমৃদ্ধ হয়েছেন। উনিশ শতকের শেষভাগেও শহর কলকাতায় গৃহস্থ পরিবারের মেয়েদের শিক্ষিকা হিসাবে বৈষ্ণবীদের আনাগোনা ছিল। জ্ঞানলাভ ও পূজার ক্ষেত্রে নারী ও শূদ্রের স্থান বঞ্চিতদের শেষ সারিতে ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের এই নীচতার জায়গা থেকে নারীর মুক্তি ঘটল মানবতার খোলা উঠোনে।

(ঘ) দয়া, ত্যাগ, সেবা প্রভৃতি মানবীয় বৃত্তির উন্মেষ হল।

কর্কশ কঠোর বাক্য, মিথ্যাচার, সেবায় পরাঙ্মুখ হওয়া—এ সবই বৈষ্ণব জীবনাচরণের বিরোধী। প্রকৃত বৈষ্ণবীয় জীবনবোধ মানুষকে সমকালীন কলুষতা, ধর্মীয় খোলসের আড়ালে কদাচার, বাক্যে পরুষতা, হীন স্বার্থপরতা ইত্যাদি থেকে রক্ষা করেছিল নিঃসন্দেহে।

(ঙ) সারা ভারত, বিশেষত উড়িষ্যা ও আসামের সঙ্গে ধর্ম আন্দোলন ও মতাদর্শগত যোগসূত্র তৈরি হল।

উড়িষ্যা তো এমনিতেই মহাপ্রভুর লীলাক্ষেত্র, বাংলার প্রতিবেশী রাজ্য কামতা-কামরূপেও এই ভাবধারার প্রভাব পৌঁছেছিল। যদিও প্রায় পাশাপাশি কামতা ও কামরূপ ডুবে ছিল শঙ্করদের প্রবর্তিত বৈষ্ণবীয় অদ্বৈতবাদের জোয়ারে। এ কথা সত্যি, যে মধুর সংকীর্তনে "শান্তিপুর ডুবুডুবু নদে ভেসে যায়"—উড়িষ্যা তথা বৃন্দাবন মথুরাও ভাসিয়ে নিয়ে যায়, সেই ভাবরস আসাম অঞ্চলে শঙ্করদেবের প্রবর্তিত অদ্বৈতবাদের কাঠিন্যে ও দৃঢ়তায় কিছুটা প্রতিহত হয়েছিল। তবে পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবের মধুর রসাস্বাদনে এখানকার জনপদবাসী কতটা

উন্মুখ ছিলেন তার প্রমাণ রয়ে গেছে তৎকালীন কোচ রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত বা অনূদিত বৈষ্ণব সাহিত্যের মধুর রসধারায়।

উল্লেখপঞ্জি ঃ

১। দাস, কুমুদরঞ্জন, চৈতন্য সমসাময়িক বাংলার রাজনৈতিক পটভূমি, সান্যাল, অবন্তীকুমার, ভট্টাচার্য, অশোক (সম্পা.) চৈতন্যদেব, ইতিহাস ও অবদান, কলকাতা, সারস্বত লাইব্রেরী, দ্বিতীয় মুদ্রণ-২০০২, পৃষ্ঠা-৫৭।

২। তদেব, পৃষ্ঠা-৫৭

৩। তদেব, পৃষ্ঠা-৫৭

৪। তদেব, পৃষ্ঠা-৫৯

৫। তদেব, পৃষ্ঠা-৫৯

৬। বৃন্দাবনদাস বিরচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত, কলকাতা, রিফ্লেক্ট, ১৯৯৪ আদিখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়।

৭। দাস, কুমুদরঞ্জন চৈতন্য সমসাময়িক বাংলার রাজনৈতিক পটভূমি, সান্যাল, অবন্তীকুমার, ভট্টাচার্য, অশোক (সম্পা.) চৈতন্যদেব, ইতিহাস ও অবদান, কলকাতা, সারস্বত লাইব্রেরী, দ্বিতীয় মুদ্রণ-২০০২, পৃষ্ঠা-৬৩।

৮। তদেব, পৃষ্ঠা-৬৭

৯। বৃন্দাবনদাস বিরচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত, কলকাতা, রিফ্লেক্ট, ১৯৯৪ মধ্যখণ্ড।

১০। রায়, অনিরুদ্ধ , চৈতন্যদেবের আমলে বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসের ধারা, সান্যাল, অবন্তীকুমার, ভট্টাচার্য, অশোক (সম্পা.) চৈতন্যদেব, ইতিহাস ও অবদান, কলকাতা, সারস্বত লাইব্রেরী, দ্বিতীয় মুদ্রণ-২০০২, পৃষ্ঠা-৭৯।

১১। তদেব, পৃষ্ঠা-৭৯।

১২। তদেব, পৃষ্ঠা-৮৩।

১৩। তদেব, পৃষ্ঠা-৮৪।

১৪। তদেব, পৃষ্ঠা-৯৯।

১৫। গিরি, সত্যবতী, বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ, কলকাতা দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-৩৬।

১৬। তদেব, পৃষ্ঠা-১৯০।

১৭। বন্দ্যোপাধ্যায় অনুরাধা, পূর্ব ভারতীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও সাহিত্য, কলকাতা, জি.এ.ই, পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ-১৯৮৩, গৌড়-বঙ্গ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৫।

১৮। Chakravarti, Janardan, Bengal Vaisnavism and Sri Chaitanya, Calcutta, The Asiatic Society, Reprinted 2000, Pg-19

১৯। Do, Page-52.

২০। Do, Page-56, 57.

২১। সান্যাল, অবন্তীকুমার, চৈতন্য জীবনকথা, সান্যাল, অবন্তীকুমার, ভট্টাচার্য, অশোক (সম্পা.) চৈতন্যদেব, ইতিহাস ও অবদান, কলকাতা, সারস্বত লাইব্রেরী, দ্বিতীয় মুদ্রণ-২০০২, পৃষ্ঠা-১৩১, ১৩২।

২২। তদেব, পৃষ্ঠা-১৩৩।

২৩। বৃন্দাবনদাসের বিরচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থে শ্রীবাস শচীদেবীকে আশ্বস্ত করেছেন "বায়ু নহে কৃষ্ণভক্তি বলিল তোমারে।" চৈতন্যভাগবত, কলকাতা, রিফ্লেক্ট, ১৯৯৪, মধ্যখণ্ড।

২৪। কৃষ্ণদাস বিরচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, কলকাতা, রিফ্লেক্ট, ১৯৯৪।

২৫। তদেব।

২৬। সান্যাল, অবন্তীকুমার, চৈতন্য জীবনকথা, সান্যাল, অবন্তীকুমার, ভট্টাচার্য, অশোক (সম্পা.) চৈতন্যদেব, ইতিহাস ও অবদান, কলকাতা, সারস্বত লাইব্রেরী, দ্বিতীয় মুদ্রণ-২০০২, পৃষ্ঠা-১৫৮।

২৭। তদেব, পৃষ্ঠা-১৫৮।
২৮। তদেব, পৃষ্ঠা-১৫৮।
২৯। Chakravarti, Janardan, Bengal Vaisnavism and Sri Chaitanya, Calcutta, The Asiatic Society, Reprinted 2000, Pg-55.
৩০। বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুরাধা, পূর্বভারতীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও সাহিত্য, কলকাতা, জি.এ.ই. পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৩, গৌড়-বঙ্গ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৮-৭৯।
৩১। তদেব, পৃষ্ঠা-৮৩।
৩২। গোস্বামী, কাননবিহারী, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব সাহিত্যের কয়েকটি নির্বাচিত দিক, দশদিশি, বিষয় : শ্রীচৈতন্য, প্রথম প্রকাশ-২০০৯, পৃষ্ঠা ৯১।
৩৩। বন্দ্যোপাধ্যায় অনুরাধা, পূর্ব ভারতীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও সাহিত্য কলকাতা, জি.এ.ই, পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ-১৯৮৩, গৌড়-বঙ্গ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮৩।
৩৪। চক্রবতী, রমাকান্ত, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাস, চৈতন্যদেব, ইতিহাস ও অবদান, কলকাতা, সারস্বত লাইব্রেরী, দ্বিতীয় মুদ্রণ পৃষ্ঠা-২০৭।
৩৫। তদেব, পৃষ্ঠা-২০৮।
৩৬। তদেব, পৃষ্ঠা-২০৯।
৩৭। গিরি, ড. সত্য, বৈষ্ণব পদাবলী, কলকাতা, রত্নাবলী, তৃতীয় সংস্করণ, সপ্তম মুদ্রণ, ২০১০, পৃষ্ঠা-১২৬।
৩৮। চক্রবর্তী রমাকান্ত, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাস, সান্যাল, অবন্তীকুমার, ভট্টাচার্য, অশোক (সম্পা.), চৈতন্যদেব, ইতিহাস ও অবদান, কলকাতা, সারস্বত লাইব্রেরী,দ্বিতীয় মুদ্রণ-২০০২, পৃষ্ঠা-২০৮।
৩৯। তদেব, পৃষ্ঠা-২০৯।
৪০। তদেব, পৃষ্ঠা-২০৯।
৪১। তদেব, পৃষ্ঠা-২০৪।

কোচ রাজবংশের ইতিহাস

ভারতবর্ষের উত্তরপূর্ব অংশের এই ভৌগোলিক অঞ্চল বিভিন্ন সময়ে নানা নামে পরিচিত ছিল। ভারতীয় সভ্যতার আদিকাল থেকে এই স্থান নানা নামে পরিচিত ছিল। কখনও এর নাম থেকে প্রাগজ্যোতিষ, কখনও কামরূপ, কখনও কামতা। এর ভৌগোলিক সীমাও এক ছিল না। যুগে যুগে তার বদল ঘটেছে। রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, ব্রহ্মাপুরাণ, বায়ুপুরাণ, ভাগবত প্রভৃতিতে এই ভৌগোলিক সীমারেখাঙ্কিত অঞ্চল সচরাচর প্রাগজ্যোতিষ নামেই পরিচিত ছিল। বৃহৎ সংহিতায় উপজ্যোতিষ ও মহাভারতে উত্তর জ্যোতিষ নামও পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়কালের মধ্যে সপ্তম শতাব্দীতে হর্ষচরিত, নবম শতাব্দীর নারায়ণ পালের তাম্রশাসন এবং নবম শতাব্দীর বনমালের তাম্রশাসনে প্রাগজ্যোতিষ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। নবম শতাব্দীর বলবর্ম্মার তাম্রশাসনে 'প্রাগজ্যোতিষপুর', 'দক্ষিণকূল', 'দিজিন্না' ও 'হারূপ্লেশ্বর' নগরের নাম পাওয়া যায়।[১] একাদশ শতাব্দীর রত্নপালের তাম্রশাসনে তিনি নিজেকে 'কামরূপনন্দী' এবং 'প্রাগজ্যোতিষাধিপতি' বলে পরিচয় দিয়েছেন।[২] এই তাম্রশাসনে উত্তরকূল, দুর্জ্জয়াপুর এবং কলঙ্গা এই তিনটি স্থানের নাম আছে। বৈদ্যদেব 'প্রাগজ্যোতিষভুক্তি'র অন্তর্গত 'কামরূপ মণ্ডল' ভূমিদান করে তা তাম্রলিপিতে উৎকীর্ণ করেছিলেন। রঘুবংশ, বৃহৎসংহিতা, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, মহাভারতে লৌহিত্য দেশের নাম আছে। চতুর্থ শতকে সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে (চতুর্থ শতাব্দী) উৎকীর্ণ লিপিতে কামরূপের নাম পাওয়া যায়। কামরূপ অধিপতিরা যে সকল লিপি উৎকীর্ণ করেছিলেন তার মধ্যে প্রাচীনতম সপ্তম শতাব্দীর রাজা ভাস্করবর্মার লিপি।[৩] এখানেও কামরূপ নাম উৎকীর্ণ আছে। হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্ত এবং হর্ষচরিতেও কামরূপ নামটি পাওয়া যায়। বিজয়সেনের মন্দিরলিপি (একাদশ শতাব্দী) বিক্রমাঙ্কদেব চরিত, রামচরিত, লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসন প্রভৃতি উৎস থেকেও কামরূপ নামটি জানা যায়। চতুর্দশ শতাব্দীতে গৌড়েশ্বর সেকেন্দার শাহের মুদ্রায় 'কামরু' শব্দটির উল্লেখ আছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর হোসেনশাহী মুদ্রায় 'কামরু' ও 'কামতা' দুটি দেশের নাম পাওয়া যায়।

১৫৮৬ খ্রিঃ বণিক রালফ ফিচ এই অংশের নাম হিসাবে 'কোচ' নামের উল্লেখ করেছেন।[৪] তারিখ-ই-ফেরিস্তা, আকবরনামা, এবং তোজক-ই-জাহাঙ্গিরী পুস্তকে এই দেশের কোচ নাম লিপিবদ্ধ আছে। সপ্তদশ শতকে ভ্রমণকারী স্টিফেন ক্যাসিলা এই নির্দিষ্ট ভূভাগকে কোচ এবং রাজধানীর নাম 'বিহার' লিখেছেন।[৫] 'আইন-ই-আকবরী' এবং বাহারিস্তানে ঘায়বী গ্রন্থে কোচদেশ এবং তার মধ্যে কামতা ও কামরূপ দুটি রাজ্যের নাম লিখিত আছে। যোগিনীতন্ত্রে এবং ষোড়শ শতাব্দীর পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ অনূদিত মার্কণ্ডেয় পুরাণের ভনিতায় কামতা রাজ্যের নাম আছে।[৬] সপ্তদশ শতাব্দীর কোচবিহাররাজ প্রাণনারায়ণ এবং মোদনারায়ণ নিজেদের কামতেশ্বর বলে পরিচয় করিয়েছেন ১৭ শতাব্দীতে অনূদিত মহাভারত আদিপর্বের একখণ্ড পুথিতে ভনিতায় 'রত্নপীঠ' নামেও এই দেশের পরিচয় দেওয়া আছে। ১৭ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাদশাহনামা এবং শাহজাঁহানামায় এই অংশের পশ্চিমার্ধের নাম কোচবিহার এবং পূর্ব অর্ধের নাম কোচহাজো বলে বর্ণিত।[৭] এছাড়া আরও নানা উৎস থেকে ঘুরেফিরে এই নামগুলিই উঠে আসে। অনেকে বলেন প্রাচীনকালে এই দেশে জ্যোতিষের আলোচনা হত বলে জনশ্রুতি আছে। স্কন্দপুরাণ অনুসারে বলা হয় যে ব্রহ্মা প্রথমে নক্ষত্র সৃষ্টি করেছিলেন। এই কারণে এই স্থানের নাম 'প্রাগ্‌জ্যোতিষ' বলে খ্যাত। আবার কোথাও বলা হয় আগে দিনাজপুরের নাম ছিল জ্যোতিষপুর, আর তার পূর্বদিকে অবস্থিত

বলে এই দেশের নাম হয় প্রাগজ্যোতিষ। কামরূপ নামের উৎস সম্পর্কে বলা হয় যেহেতু ভগবতীর অপর নাম কামরূপা, তাই তাঁর পীঠ হিসাবে এই স্থানের নাম কামরূপ। আসামের 'খাম্ব' জাতির নাম থেকে কামরূপ নামের উৎপত্তি বলেও অনেকে মনে করেন। মতান্তরে হরকোপানলে ভস্মীভূত মদন বা কামদেব এখানেই পুনর্জন্ম পেয়েছিলেন বলে এই স্থানকে কামরূপ বলে। আবার কোচজাতির বিহারক্ষেত্র থেকে কোচবিহার নামের উৎপত্তি, কোচকুমারী এবং মহাদেবের বিহারক্ষেত্র থেকে কোচবিহার নামের উৎপত্তি ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের মত উঠে আসে। সঙ্কোশ নদের তটবর্তী বলে কোচ থেকে কোষ শব্দের উৎপত্তি বলে মনে করেন অনেকে। জাতিকৌমুদী এবং যোগিনীতন্ত্রের বিচারে 'কুবাচ' বা মন্দভাষী থেকে কোচ শব্দের উৎপত্তি মনে করা হয়। 'রাজোপাখ্যানে' লিখিত আছে জল্পীশ্বরের (শিবের) বিহারস্থান হিসাবে এই দেশের নাম বিহার হয়েছে।[৮] দরঙ্গের রাজা খড়্গনারায়ণের বংশাবলী অনুযায়ী আরিমত্ত নামে রাজার রাজধানী ছিল বিহার নগরে।[৯] ষোড়শ শতাব্দীর আহোমরাজ সুখাম ফা কামতারাজ নরনারায়ণকে 'বিহারেশ্বর' লিখেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজ্যের নাম কোচবিহার এবং রাজধানীর নাম বিহার দুর্গ হিসাবে লিখিত আছে। কোচবিহার রাজবংশের ইতিহাস রাজোপাখ্যান উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সঙ্কলিত হয়। এখানে কোচবিহার নয়, সর্বত্র বিহার-ই উল্লিখিত আছে। এছাড়া কোচবিহার রাজদরবার নিজবেহারও লিখে থাকে।

খ্রিস্টীয় প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীতে শূদ্রবংশীয় দেবেশ্বর কামরূপের রাজা ছিলেন। একাধিক মত আছে যে দেবেশ্বরের বংশধর পৃথু নামে এক রাজা ছিলেন, জলপাইগুড়ির দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত 'ভিতর গড়' বা 'পৃথু রাজার গড়' এই রাজার রাজধানী ছিল বলে কথিত। চতুর্থ শতাব্দীতে নাগশঙ্কর নামে জনৈক রাজা এই অংশে রাজত্ব করতেন। প্রায় চারশ বছর বা অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত নাগশঙ্কর বংশীয়দের রাজত্বকাল চলতে থাকে। আবার খ্রিস্টীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম শতাব্দীতে মাঙ্গলদেব নামে কোচজাতির এক শক্তিশালী রাজার নাম পাওয়া যায় যার শক্তিমত্তা এবং শৌর্যের খ্যাতি ছিল। তিনি হূন বিতাড়নে সমর্থ হন এমন কথাও বলা হয়। তিনি বঙ্গ থেকে মালব পর্যন্ত স্থান অধিকার করে লক্ষ্মৌতি বা লক্ষ্মণাবতী নগরীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে রাজধানী স্থাপন করেন। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে মগধের গুপ্তবংশীয় সমুদ্রগুপ্তের প্রভাব কামরূপ রাজ্যে বিস্তৃত হয়েছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মহারাজ যশোধর্ম বিষ্ণু বর্ধন উত্তর ভারতে পরাক্রম বিস্তার করে লৌহিত্য নদের তীর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। ষষ্ঠ শতাব্দীতেই রাজা শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত লৌহিত্যনদের উপকণ্ঠ পর্যন্ত প্রাধান্য বিস্তার করেন।

ষষ্ঠ বা মতান্তরে অষ্টম শতাব্দীতে চট্টগ্রামের রাজা গোপীচন্দ্র এবং তাঁর পিতা বিমল চন্দ্র কামরূপের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। ভগদত্ত বংশীয় কুমার ভাস্কর বর্মার নাম কামরূপের ইতিহাসে সমধিক বিখ্যাত। তাঁর সময় পশ্চিম কামরূপ, সমগ্র আসাম এবং ময়মনসিংহ জেলার কিয়দংশ কামরূপের অধীনে ছিল। সম্ভবত সমসাময়িক কর্ণসুবর্ণ রাজ্যও তিনি কিছুটা দখল করেছিলেন। হিউ-এন-সাঙের ভ্রমণ বিবরণী থেকে জানা যায় ভাস্করবর্মার অনুরোধে ৬৪৩ খ্রিঃ হিউ-এন-সাঙ কামরূপে আসেন। ভাস্করবর্মা ছিলেন সম্রাট হর্ষবর্ধন শীলাদিত্যের বন্ধু, হর্ষবর্ধনের অনুরোধেই তিনি মহামোক্ষ পরিষদে যোগদান করার জন্য এসেছিলেন। ভাস্করবর্মার অব্যহিত পরেই রাজা হন ম্লেচ্ছাধিনাথ শালস্তম্ভ। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য কর্তৃক প্রাগজ্যোতিষরাজ্য এবং স্ত্রীরাজ্য আক্রান্ত হয়েছিল। এরপর ললিতাদিত্য গৌড়দেশ জয় করে গৌড়রাজকে বন্দী করে দেশে ফিরে যান। সম্ভবত এই সুযোগেই কামরূপরাজ শ্রীহর্ষ বা হরিষ গৌড়, ওড্র, কলিঙ্গ ও কোশল রাজ্য অধিকার করেন। বাংলায় পালবংশের প্রথম রাজা গোপালদেব কামরূপের যে অংশ পেয়েছিলেন দ্বিতীয় পাল রাজা ধর্মপালদেব তা রক্ষার্থে বর্দ্ধনকোটের ৭০ মাইল উত্তরে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। কামরূপবাসীর আক্রমণ প্রতিহত করাই ছিল ঐ গড় নির্মাণের কারণ। পালরাজ দেবপাল প্রাগজ্যোতিষপুরে পাল আধিপত্য স্থাপন করেন। তাঁর সময় হিমালয় পর্বতের উপত্যকাবাসী কম্বোজ জাতি[১০] গৌড়রাজ্য আক্রমণ করেন। অনুমান করা হয় কোচ এবং মেচ

জাতি এই কম্বোজ জাতি থেকে উদ্ভূত। আবার একাদশ শতাব্দীতে চালুক্য রাজকুমার বিক্রমাদিত্য কামরূপ জয় করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। পালবংশীয় রাজা রামপাল বরেন্দ্রভূমির বিদ্রোহ দমন করে কামরূপ পুনরাধিকার করেন। পরবর্তী রাজা কুমার পাল তাঁর মন্ত্রী পুত্র বৈদ্যদেবকে প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা অন্য কোন অংশের অধিপতি নির্বাচন করেন। সেন বংশের রাজা বিজয় সেন এবং লক্ষণ সেনের আমলেও কামরূপ গৌড়াধিপতির অধিকারে ছিল।

কামতাপুর রাজ্য ও রাজবংশ

কামরূপ রাজ্যের ধনজনসমৃদ্ধ প্রধান নগর ছিল কামতাপুর। গুরুজনের কথাচরিত্র পুথিতে কামতাপুরের রাজা দুর্লভনারায়ণের নাম পাওয়া যায়।[১০] আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। শঙ্করদেবের শিষ্য শ্রুতিধর রূপনারায়ণ কামতেশ্বর কুলকারিকায় কামতেশ্বরদের রাজা বর্দ্ধনের বংশধর বলে উল্লেখ করেছেন। কারিকার উল্লিখিত ঃ

ছিড়িয়া গলার দড়ি ক্ষত্রি চিহ্ন লুপ্ত করি
প্রাণভয়ে ইতি উতি পলান্ত সলি।
সংগ্রামক ভয় করি ভঙ্গক্ষত্রি ন্নাম ধরি
আপনারে মানে কেহ রাজবংশী বুলী॥
বর্দ্ধনসুত পাঁচজন রত্নপীঠে নিল যান
আর কেহ লুকাইল যোনীবর্গ পীঠে।[১১]

ভ্রামরীতন্ত্রের দ্বিতীয় পটলেও লিখিত আছে যে বর্দ্ধনের পরাজিত পুত্ররা ক্ষত্রিয়াচার পরিত্যাগপূর্বক রত্নপীঠ বা কামতায় আশ্রয় গ্রহণ করে রাজবংশী নামে পরিচিত হন। কথিত আছে নীলধবজ প্রথম জীবনে রাখাল ছিলেন। পরে ঐ ব্রাহ্মণ তার শরীরে রাজ চিহ্ন দেখে তাঁকে ঐ বৃত্তি থেকে মুক্তি দেন। নীলধবজের রাজ্য লাভ বিষয়েও নানা মত আছে। কেউ বলেন তিনি হরচন্দ্র রাজা উত্তরাধিকারী পাল রাজার রাজ্য জয় করেন। কেউ কেউ বলেন তিনি ব্রাহ্মণ প্রভুর পরামর্শে পাল রাজত্বের শেষ রাজাকে গৌহাটিতে পরাস্ত করে লাভ করেন। গৌহাটি থেকে তিনি রাজধানী কামতাপুরে স্থাপন করেন, এবং বহুসংখ্যক মৈথিল ব্রাহ্মণকে সেখানে স্থাপন করেন।

নীলধবজের পর কামতাপুরের রাজা হন চক্রধবজ আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। প্রবাদ আছে যে রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী কামতেশ্বরী তারই প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে কোচবিহারের গোঁসানীমারী অঞ্চলে এই দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। কথিত আছে এবং গোঁসানীমঙ্গলের সাক্ষ্য অনুযায়ী প্রাগজ্যোতিষের রাজা ভগদত্ত ভারতযুদ্ধে নিহত হলে তার কবচ যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে ছিল, স্বপ্নাদিষ্ট রাজা চক্রধবজ তা আনিয়ে কামতাপুরে রাজধানী স্থাপন করেন।[১০] চক্রধবজ নির্মিত কামতেশ্বরী মন্দির কোথায় ছিল তার ধারণা করা কঠিন। কথিত আছে কামতেশ্বরী দেবীর অথবা গোসানীদেবীর মন্দির ধবংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে হোসেন শাহ মন্দির বিনষ্ট করেন এবং রাজ্য অধিকার করেন। পরবর্তীকালে রাজা বিশ্বসিংহের আমলে কামতাপুরে দৈবলব্ধ গোঁসানীদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। চক্রধবজের পর রাজ্যশাসন করেন কামতেশ্বর নীলাম্বর। তাঁর সময় রাজ্য সুশাসিত ছিল। মৎস্যদেশ পর্যন্ত ভূভাগে স্বীয় অধিকার তিনি বিস্তার করেছিলেন। রাজধানী কামতাপুর থেকে রাজ্যের প্রান্তসীমা পর্যন্ত অনেকগুলি রাজপথ নির্মাণ করেছিলেন। বাণেশ্বর (কোচবিহার) এবং কোটেশ্বর (রংপুর) জেলার শিবমন্দির রাজা নীলাম্বর নির্মাণ অথবা সংস্কার করেন। বস্তুত গৌড়েশ্বর আহমদ শাহের রাজত্বকালে পাঠান রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ায় কামতাপুরের অধিপতিদের পক্ষে রাজ্যবিস্তারের সুবিধা হয়। গৌড়েশ্বর বরবক শাহের রাজত্বকালে

কামতাপুর আক্রান্ত হয়েছিল। তাঁর সেনাপতি রহমত খাঁ যুদ্ধে পরাজিত হন এবং করতোয়ার জলপথে আত্মরক্ষার্থে পালিয়ে যান। পরে বগুড়া জেলায় জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে কোচ সৈন্যের হাত থেকে মুক্তিলাভ করেন। ফতে শাহের আমলে গৌড়ের অধিপতি কামতাপুরের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করলে কামতেশ্বর স্ত্রী পুত্রকে রেখেই অহোমরাজের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন, এবং করতোয়া নদীর তীরে গৌড়েশ্বরের বাহিনী অহোমরাজের বাহিনীর কাছে পরাস্ত হয়। গৌড়েশ্বর হোসেন শাহ রাজ্যলাভের অব্যবহিত পরেই কামতাপুর বিজয় সম্পন্ন করেন। ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে কামতাপুর বিজয় করে তিনি কামতা বিজয়ী উপাধি ধারণ করেন। তার 'কামরূপ' ও কামতা বিজয়ের সংবাদ ৯০৭ হিজরী (১৫০২ খ্রিঃ) নির্মিত গৌড়ের একটি মসজিদের দ্বারলিপিতে এবং রংপুর জেলার কাঁটাদুয়ারের আর একটি মসজিদে উৎকীর্ণ আছে।[১১] কামতাপুর অধিকারের পর হোসেন শাহ আসাম বিজয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। আসাম অধিপতি যুদ্ধে অসমর্থ হয়ে পার্বত্য অঞ্চলে আত্মগোপন করলে হোসেন শাহ নিজ পুত্রের উপর রাজ্য শাসনভার অর্পণ করে ফিরে আসেন। পরে বর্ষায় জলপথ অপেক্ষাকৃত দুর্গম হলে আসামের সৈন্যরা আবার ফিরে আসে। হোসেন শাহের পুত্র নিহত হলে গৌড়সেনা পিছু হটে। আসামের ইতিহাস গ্রন্থ জানায় কামতাপুর বিজয়ের পর হোসেন শাহ পুত্র দানিয়েলকে হাজোতে স্থাপন করেন। পরে আসামী সৈন্যের আক্রমণে তিনি বিজিত রাজ্য ত্যাগ করেন। রিয়াজ-উস্-সালাতিনেও এই বক্তব্য আছে। ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ গৌড় সৈন্যদল কামতাপুর ত্যাগ করে। কামতাপুর গৌড়েশ্বরের অধিকারভুক্ত হলে কামতেশ্বরের পুত্র দুর্লভেন্দ্র আসামে আশ্রয় নেন। পরে আপন ভ্রাতুষ্পুত্র ফেঙ্গুয়ার হাতে নিহত হন। ফেঙ্গুয়ার মৃত্যুর পর অহোমরাজ তার রাজ্য হস্তগত করতে চাইলেও পেরে ওঠেননি। এই রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে কামতাপুর রাজধানীর আশেপাশের অঞ্চলে অন্যান্য ভুঁইয়ারা শক্তিবৃদ্ধি করছিল। কামতার পূর্বাংশে হরিদাস মণ্ডলের পুত্র বিশু বা বিশ্বসিংহ পিতার চেয়েও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। কামতাপুরের প্রায় ৩০ মাইল উত্তরে চন্দন ও মদন নামে দুই ভাই মুরলাবাস নামক স্থানে বেশ শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন। হরিদাস মণ্ডল এবং তার বংশধরগণের কথাই সবিস্তারে আলোচিতব্য।

হরিদাস মণ্ডল

খড়্গনারায়ণের বংশাবলী (৭ পত্র) হরিদাস মণ্ডল সম্পর্কে যা জানায় তা হল ঃ

'পুবত মানাহ সনকোষ পশ্চিমত,
উত্তরে ধবলগিরি দক্ষিণে লোহিত,
সবে আসি হাড়িয়াক মণ্ডল পাতিলা,
ভোজ ভাত খায়া সব আনন্দে চলিলা।
সেই ধরি বার গ্রামে ভেলা অধিকারী,
কাহাকেও না দেয় কর এই সীমা ধরি॥[১২]

বর্তমান গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত এবং পূর্বে মানস নদ, পশ্চিমে সনকোষ নদ, দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র এবং উত্তরে হিমালয় পর্বত, এই চতুঃসীমার মধ্যবর্তী ভূখণ্ডের প্রজাদের সম্মতিক্রমে হরিদাস 'মণ্ডল' হিসাবে পরিগণিত হন। হরিদাসের যে সব ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তি ছিল তিনি তাতে কৃষিকাজ করাতেন। পরবর্তীকালে রাজা দমাম্বুর নয় বছর বয়সী বালিকা হীরার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। জীরা নামেও হরিদাসের অপর এক স্ত্রী ছিলেন। কালক্রমে হরিদাস ও হীরার যথাক্রমে শিশু ও বিশু নামে দুই পুত্র সন্তান জন্মায়। উনবিংশ শতকে লিখিত 'রাজোপাখ্যান' থেকে জানা যায়। জীরা দেবীর গর্ভে চন্দন ও মদন নামে দুই পুত্র সন্তান জন্মায়। কিন্তু চন্দন ও মদন সম্পর্কে নানাবিধ পরস্পর অসম্বন্ধ উক্তি নানা জায়গায় প্রচলিত, এবং অনেক প্রামাণ্য সূত্রেই চন্দন আর মদনের কোন নাম পাওয়া

যায় না। জয়নাথ ঘোষের রাজোপাখ্যানে চন্দন আর মদনের নাম থাকলেও রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ রচিত 'উপকথা' পুথিতে নিজ বংশের পরিচয় প্রদানকালে চন্দন এবং মদনের নাম করেন না। তাঁর আদেশে পরমানন্দ তর্কালঙ্কার কর্তৃক অনূদিত বেনপর্ব্ব পুথির ভনিতায় সে রাজবংশলতা আছে সেখানেও চন্দন এবং মদনের নাম নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রংপুরের কালেক্টর ও কোচবিহারের পলিটিক্যাল অফিসার মিঃ মুরের রিপোর্ট (১৭৮৪ খ্রিঃ) এবং কমিশনার মার্শী ও শোভের (১৭৮৮ খ্রিঃ) রিপোর্টে যে বংশলতা উল্লিখিত সেখানেও রাজবংশলতিকায় চন্দন ও মদনের নাম নেই।[১৩] হরিদাস মণ্ডল যথাকালে দুই পুত্রের শাস্ত্রশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ক্রমশ মৃগয়া প্রভৃতি সাহসিকতাপূর্ণ কাজে বিশুকেই এগিয়ে আসতে দেখা যায়। বিশুর বয়ঃপ্রাপ্তির পর পুত্রের যুদ্ধস্পৃহা হরিদাসকেও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি অধিকারে উৎসাহিত করে। ফলে হরিদাস পার্শ্ববর্তী ভুঁইয়া বা ভৌমিক রাজ্যগুলি অধিকারে সচেষ্ট হন। আঞ্চলিক কথন বলে কর্ণপুরের ভুঁইয়াকে আক্রমণ করতে গিয়ে হরিদাস বন্দী হন। বিশু আত্মরক্ষার্থে আত্মগোপন করার সময় জঙ্গলে দৈবী উপায়ে এক দশভূজা দেবীপ্রতিমা লাভ করেন। এই বিগ্রহ প্রথমে মণিকূটে, পরে কামতাপুরে স্থানান্তরিত হয়েছিল। যুদ্ধের পর তেরো দিন পেরিয়ে গেলে বিজয়ী ভুঁইয়া হরিদাসকে মুক্তি দেন। কিন্তু এরপর বিশ্বাসঘাতকতা করেন বিশ্বসিংহ। জঙ্গলে আত্মগোপনকালে তিনদিন অনাহারে থাকার পর বিশু এক মেচনীর গৃহে আশ্রয়লাভ করেন এবং তাঁরই পরামর্শে কর্ণপুরের ভুঁইয়াকে বৈশাখ বিহুর উৎসবের দিনে হত্যা করেন। ভুঁইয়ার দুই ঘনিষ্ঠ কর্মচারী ও বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে সাহায্য করেন।

এইভাবে বিশ্বসিংহের হাতে একের পর এক ভুঁইয়া বা ভৌমিক পরাজিত হলে তাঁর রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশুর শক্তিবৃদ্ধিতে শঙ্কিত অহোমরাজ সু-সেন-ফার দৃষ্টি পড়ল বিশ্বসিংহের উপর। ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে অহোম সেনাপতি চন-খাম গোঁহাই বিশ্বসিংহের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। কিন্তু তখনও রাষ্ট্রশক্তি সংগঠিত না থাকায় দূরদর্শী বিশ্বসিংহ অহোম সেনাপতির সঙ্গে মিত্রতাপূর্ণ ব্যবহার করেন এবং অহোমরাজ্যের বশ্যতা স্বীকার করে নেন। এই সময়েই কামতাপুরের রাজা গৌড়সেনার আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত থাকায় বিশ্বসিংহের প্রতি নজর দিতে পারেন নি। সুচতুর বিশ্বসিংহ গৌড় এবং কামতাপুর রাজ্যের পারস্পরিক বিবাদের সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। গৌড়রাজ হোসেন শাহ যে কেবল কামতাপুর জয় করলেন তাই নয়, তিনি ক্রমশ পূর্বদিকে এগিয়ে পূর্ব কামরূপ বা আসাম রাজ্যে প্রবেশ করলে আসামরাজ আত্মরক্ষার্থে পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় নেন। ভুঁইয়া বা ভৌমিক রাজগণ এই সময় গৌড়রাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে এগিয়ে আসেন, অভীষ্টসিদ্ধির এই সুযোগ বিশুও ছাড়লেন না। যেহেতু বেশ কিছু ভৌমিক রাজ্য তাঁর অধিকারলব্ধ ছিল তাই তিনি কামতেশ্বর উপাধি গ্রহণ করে নিজেকে কামতা বা পশ্চিম কামরূপের রাজা হিসাবে ঘোষণা করেন। আনুমানিক ১৪৯৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর রাজ্যাভিষেক হয়। তিনি কামতেশ্বর উপাধি গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে যথাশাস্ত্র তাঁর অভিষেক হয়। অভিষেককালে ছত্র, দণ্ড, শ্বেত চামর, ধবজা ইত্যাদি যাবতীয় রাজচিহ্ন ব্যবহৃত হয়। অভিষেককালে 'বিশ্বসিংহ' এই রাজোচিত নামে ভূষিত হন বিশু এবং শিষ্যসিংহ বা শিবসিংহ নাম ধারণ করে শিশু রাজার মাথায় রাজছত্র ধারণ করেন। মহারাজ বিশ্বসিংহের স্বাধীনতা ঘোষণার কিছুকাল পরেই তাঁর পিতামহ দমাম্বু এবং পিতামহী উর্বশীর প্রয়াণ ঘটে।

রাজ্যাভিষেকের পরে স্বভাবতই রাজ্যবিস্তারের দিকে তিনি মনোযোগী হন। প্রথমত গৌড় সুলতানের সঙ্গে অকারণ সংঘর্ষ তিনি এড়িয়ে চলতে চাইতেন। ১৪৯৭ খ্রিস্টাব্দে আসামরাজের সঙ্গে তাঁর মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপিত হয় আনুষ্ঠানকভাবে উপহার আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে। সম্ভবত কামরূপ-কামতাপুর অঞ্চল থেকে মুসলমান সৈন্যদের বিতাড়ন প্রসঙ্গেই দুই রাজশক্তির এই সন্ধি স্থাপন। কিছুকালের মধ্যেই হোসেন শাহের পুত্র কামরূপের অন্তর্গত গরুড়াচলে অথবা হাজোতে পরাজিত হন এবং নিহত হন। এই সুযোগে বিশ্বসিংহ সমগ্র কামতাপুর করায়ত্ত করেন। কামরূপ কামতাপুরের অন্তর্গত প্রায় সমস্ত ভুঁইয়ারাই একে একে বিশ্বসিংহের অধীনতা স্বীকার করে। উগারী, লুকীবকাই, পান্তান বকো, ভোলোগাঁও, ফুলগুলি, বিজনি, বেলতলা, মৈরাপুর, রানি, বনগাঁও,

কড়াইবাড়ী, আটিয়াবাড়ী, কামতাবাড়ী, বলরামপুর, পাণ্ডু, ঝাড়গাঁও, দীনলা, খুটাঘাট, কর্ণপুর, বেহার, রাউসীয়া প্রভৃতি ছোট ছোট রাজ্য এবং বড়ভুঁইয়া, সরুভুঁইয়া, আগুড়িভুঁইয়া, কুসুমভুঁইয়া প্রভৃতি ভুঁইয়া বা ভৌমিক রাজাগণ বিশ্বসিংহের বশ্যতা স্বীকার করে। পাণ্ডুর প্রতাপ ভুঁইয়ার ভাই শ্বেতধান নিরস্ত্র অবস্থায় নদীতে স্নানকালে বিশ্বসিংহ সহসা তাঁকে আক্রমণ করে হত্যা করেন। রাজ্যোপাখ্যান অনুযায়ী বিশ্বসিংহ জলপথে শিঙ্গরি পর্যন্ত গিয়েও অর্থাভাবের কারণে ফিরে আসেন। পররাজ্য লুণ্ঠন করে নিজের সৈন্যদলের রসদ বাড়ানোর নীতি তার মনঃপুত হয় নি। মহারাজ বিশ্বসিংহের রাজত্বকালে মুসলমানরা কয়েকবার আসাম আক্রমণ করে। ১৫৩৩ খ্রিঃ আসামরাজের সৈন্যদল গৌড়সেনাকে পরাস্ত করে ও করতোয়াতীর পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করে। এই সময় গৌড়র সুলতান ছিলেন নসরত শাহ। রাজোপাখ্যানে বিশ্বসিংহের গৌড় বিজয়ের কথা জানা যায়, কিন্তু সমসাময়িক কোন মুসলমান ঐতিহাসিকের বিবরণে এর সমর্থন নেই।

বিশ্বসিংহের পিতা হরিদাস মণ্ডলের সময় তাঁর রাজধানী ছিল চিকনা নামক স্থানে। কথিত আছে যে মৃগয়াকালে একটি বাঁশের কঞ্চি বা চিকনি মাটিতে গেঁথে ভগবতী জ্ঞানে বিশু পুজো করেছিলেন বলে এই স্থানের নাম চিকনা। তবে হরিদাস মণ্ডলই চিকনা নগরের প্রতিষ্ঠাতা। ধুবড়ীর উত্তরে পঞ্চাশ মাইল পেরোলে গোয়ালপাড়া জেলায় সরল ভাঙ্গা এবং চম্পাবতী নদীর সঙ্গমস্থলে চিকন নগরীর ধবংসাবশেষ এখনও দেখা যায়। আসাম থেকে প্রত্যাবর্তনের পর বিশ্বসিংহ রাজধানী কামতাপুরে স্থানান্তরিত করেন। সমুদ্রনারায়ণের বংশাবলীতে কামতাপুর প্রসঙ্গে লিখিত আছে।

'অগ্নিকোণে দেবীগঞ্জ আছয় সাক্ষাত।
নামত কামতেশ্বরী দেবী আছে তাত॥
উত্তরে আছয় শিব বাণেশ্বর নাম।
যাক সেবি পাবে ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষকাম॥"[১৪]

বিশ্বসিংহের পুত্র শুক্লধবজের আদেশে রচিত মার্কণ্ডেয় পুরাণে রয়েছে

'মহারাজ বিশ্বসিংহ কামতা নগরে।
তার পুত্র ভোগে তুল্য নহে পুরন্দরে॥'

বা

'অতি সুরপুর সে যে কামতানগর।
(তথায়) আছয় বিশ্বসিংহ নৃপবর॥"[১৫]

মহারাজ বিশ্বসিংহ কটি বিবাহ করেছিলেন তা জানা যায় না। তবে দরঙ্গ বংশাবলীতে তাঁর বেশ কয়েকজন মহিষীর নাম এবং তাঁদের সন্তানদের নাম পাওয়া যায়। তাঁর মহিষীরা পার্শ্ববর্তী নেপাল গৌড় বা মিথিলা থেকেও যেমন এসেছিলেন, তেমনই কোশল ও কাশী থেকেও অনেকে বিবাহসূত্রে কোচ রাজপরিবারে এসেছিলেন। যদিও বিশ্বসিংহের রাণীদের পরিচয় ও সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। বিশ্বসিংহের আঠারো বা উনিশজন পুত্রসন্তানের কথা দরঙ্গ বংশাবলী, খড়্গনারায়ণের বংশাবলী, বিশ্বসিংহচরিতম্ প্রভৃতি গ্রন্থে ঘুরে ফিরে আসে। রাজপুত্রদের মধ্যে নরসিংহ, নরনারায়ণ (মল্লদেব), শুক্লধবজ (চিলারায়), কমলনারায়ণ (গোঁহাই কমল), সূর্য্য (গোঁহাই সূর্য্য), রামচন্দ্র, হেমধর এবং দীপসিংহের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা নানা ক্ষেত্রেই নিজ নিজ কীর্তিবশত খ্যাতিমান। দরঙ্গ বংশাবলীগুলিতে এক অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। পুত্র নরসিংহ অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ এবং বিশ্বসিংহের অত্যধিক স্নেহভাজন হওয়ায় অভিমানবশত নরনারায়ণ এবং শুক্লধবজ দেশ ত্যাগ করে বারাণসীতে পৌঁছান এবং

সেখানে ব্রহ্মানন্দ বিশারদ নামে সন্ন্যাসীর আশ্রয়ে থেকে নানা বিদ্যাশিক্ষা করেন। তাঁরা ব্যাকরণ, সাহিত্য, জ্যোতিষ, শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায় মীমাংসা এবং পুরাণ প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পরবর্তীকালে অবশ্য নরনারায়ণ সিংহাসন লাভ করেন।

বিশ্বসিংহ একজন দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। রাজ্য পরিচালনার জন্য তিনি নানা পদের সৃষ্টি করেন। নিজ ভ্রাতা শিষ্যসিংহ বা শিবসিংহকে তিনি 'রায়কত' (রায় কোট বা দুর্গাধ্যক্ষ) এবং প্রধান সেনাপতির পদে বৃত করেন। স্ববংশীয় বারো জন উপযুক্ত ব্যক্তিকে কার্য্যী বা কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন। এছাড়া যুদ্ধ এবং পররাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রীর পদ সৃষ্টি করেছিলেন, বিচারবিভাগের অধিপতি একজন ছিলেন। আবার প্রধান সেনানায়কের অধীনে অন্যান্য সেনাপতিরাও ছিলেন। রাজকর্মচারীদের মধ্যে কুড়ি জনের উপর যিনি কর্তৃত্ব করেছিলেন তাঁকে ঠাকুরিয়া, একশত জনের উপর যিনি কর্তৃত্ব করতেন তাঁকে বলা হত 'শয়কিয়া', হাজার জনের উপর যিনি কর্তৃত্ব করতেন তাকে বলা হত হাজারিকা, তিন সহস্রের উপর আধিপত্যকারীকে 'ওমরা', বাইশ ওমরার উপর কর্তৃত্বকারীকে বলা হত নবাব।[১৬] প্রভাবশালী ব্যক্তিকে লস্কর, ভুঁইয়া প্রভৃতি উপাধি সহ তিনি সীমান্ত অঞ্চলগুলিকে স্থাপন করতেন, যাতে সীমা সুরক্ষিত থাকে, শান্তি বজায় থাকে। মহারাজা বিশ্বসিংহ গৌহাটির নিকটবর্তী নীলাচলে অবস্থিত কামাখ্যাপীঠের পুনরুদ্ধার করেন। এ বিষয়ে একটি লোকশ্রুতিও প্রচলিত আছে। কথিত আছে একবার বিশ্বসিংহ ও শিষ্যসিংহ সৈন্যদলের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তাঁরা বনে পরিভ্রমণ করতে করতে একটি স্তূপের কাছে পার্বত্য অধিবাসীদের দেবস্থান দেখতে পান, এবং এক বৃদ্ধা তাদের জানান যে এই দেবস্থান জাগ্রত। বিশ্বসিংহ ও শিষ্যসিংহ মানত করেন সৈন্যদলের সঙ্গে মিলিত হতে পারলে তিনি সোনার মন্দির বানিয়ে দেবেন। অল্প সময় পরেই সেনাদের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। পরবর্তীকালে ঐ মাটির স্তূপ খনন করলে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। বিস্মিত রাজা অনুসন্ধানের পর জানতে পারেন ওটিই প্রাচীন মহাপীঠ কামাখ্যা। সেই ভগ্নাবশেষের মধ্যে যে প্রাচীন পাথরের মন্দিরে মূল অংশ আবিষ্কার হয় রাজা বিশ্বসিংহ তার উপরেই নবনির্মিত ইটের মন্দির নির্মাণ করেন। লোকশ্রুতি আছে যে রাজা সোনার মন্দির গড়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বলে প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে প্রতিটি ইঁটেই একরতি করে সোনা মিশিয়ে ইঁটগুলি প্রস্তুত করেন। বিশ্বসিংহ শিব ও দুর্গার উপাসক ছিলেন এবং কালীচন্দ্র ভট্টাচার্য নামে এক ব্রাহ্মণের কাছে তিনি শৈবধর্মে দীক্ষাও নিয়েছিলেন। কনৌজ কাশী এবং অন্যান্য অঞ্চল থেকে ব্রাহ্মণদের এনে তিনি নিজ রাজ্যে তাঁদের বসবাসের ব্যবস্থা করেন। তৎকালীন নানা রচনা এবং ইতিহাসেরও নানা সূত্র থেকে বোঝা যায় বিশ্বসিংহের সময়েই কোচজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রথম প্রতিষ্ঠা পায়। ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বসিংহ পরলোকগমন করলে পুত্র নরসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিশ্বসিংহ কর্তৃক প্রবর্তিত এক রাজশক বিশ্বসিংহের রাজত্বের স্বাধীনতা ঘোষণার দিনটিকে সূচিত করে।

কুমার নরসিংহের রাজা হওয়ার পর নরনারায়ণ ও শুক্লধবজের ধাত্রী (ধাইমা) নাগভোগ নামে এক সন্ন্যাসীর দ্বারা পত্রযোগে সমস্ত সংবাদ তাঁদের কাছে কাশীতে প্রেরণ করেন। বিশ্বসিংহ এক অভিনব ব্যবস্থার দ্বারা পুত্রদের ভবিষ্যৎ নিরূপণ করেছিলেন। তাতে নরসিংহ সোনা পেয়েছিলেন বলে তাঁর বিদেশে রাজ্যভোগ এবং নরনারায়ণ মাটি পেয়েছিলেন বলে তাঁর স্বদেশে রাজ্যভোগ নিশ্চিত করা হয়েছিল। শুক্লধবজ পেয়েছিলেন লোহা, এতে তিনি রণধর্ম্ম গ্রহণে বাধ্য ছিলেন এবং বস্তুপক্ষে শুক্লধবজ এক অনন্যমনা যোদ্ধা ছিলেন। যাইহোক নরনারায়ণ এবং শুক্লধবজ এসে পিতার ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী স্বদেশে নরনারায়ণের রাজ্যাভিষেক দাবি করলেন এবং অন্যান্য রাজপুত্রেরাও তাতে সমর্থন জানালে নরসিংহ বাধ্য হয়ে সপুত্র মোরঙ্গরাজ্যে পালিয়ে যান পরে সেখান থেকে নেপাল এবং নেপাল থেকে কাশ্মীরে পালিয়ে যান। তিনি কোচরাজ্য ত্যাগ করার সময় দেবী দশভূজার মূর্তি এবং হনুমানদণ্ড এনেছিলেন। নরনারায়ণ এবং শুক্লধবজ নেপাল পর্যন্ত তাঁকে তাড়া করলে তিনি ঐ মূর্তি আর দণ্ড তাঁদের দিয়ে দেন, এবং কাশ্মীর যান। পরে তিনি সপুত্র ভূটানে চলে যান এবং পরে পুনাখায় তিনি রাজা হয়েছিলেন

এমন তথ্য জানা যায় দরঙ্গ বংশাবলী থেকে।[১৭] ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে মহারাজ নরনারায়ণ কামরূপ-কামতার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মহারাজ নরনারায়ণ (১৫৩৪-১৫৮৭ খ্রিঃ)

১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে নরনারায়ণের রাজ্যাভিষেক হয়। অভিষেককালে রায়কত শিষ্যসিংহ রাজার মাথায় রাজছত্র ধারণ করেন। রাজা নরনারায়ণ স্বনামে মুদ্রা প্রস্তুত করেছিলেন। এই সময় রাজ নামাঙ্কিত ছাপ বা শীলমোহর প্রস্তুত হয়েছিল। এই নামাঙ্কিত ছাপটি ছাড়াও সিংহের মূর্তিসমন্বিত আর একটি ছাপ তৈরি হয়েছিল যা বিশেষ বিশেষ রাজাদেশে ব্যবহৃত হত। অধীন সামন্ত রাজারা মহারাজ নরনারায়ণের অভিষেক উপলক্ষে উপহার এবং কর পাঠিয়ে বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন।

নরনারায়ণের রাজত্বের সূচনাকালে বাংলার আধিপত্য নিয়ে গৌড়ে অত্যন্ত গোলযোগের সূচনা হয়। নসরত শাহের মৃত্যুর পর পুত্র ফিরোজ শাহ গৌড়ের অধিপতি হন। কিন্তু ১৫৩৮ খ্রিঃ শের খাঁ তাঁকে তাড়িয়ে গৌড় দখল করেন। এই নানামুখী বিবাদের সুযোগ নিয়ে নরনারায়ণ দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করেছিলেন। তবে রাজত্ব সূচনাপর্বে মহারাজ নরনারায়ণকে সর্বাধিক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল আসাম রাজের সঙ্গে বিরোধ নিয়ে। রাজা বিশ্বসিংহের রাজত্বের শেষভাগে আসামের সঙ্গে যে গোলাযোগ চলছিল তা ক্রমশ ব্যাপক আকার নিতে থাকে। কামতারাজের যে রক্ষিসৈন্যরা আসামের সীমান্ত প্রদেশে অবস্থান করত আসাম রাজপুত্র তাদের হোলা নামক স্থানে তাড়িয়ে দেন (১৫৪৩ খ্রিঃ)[১৮]। মহারাজ নরনারায়ণের ভাই কুমার দীপ সিংহ, হেমধর ও রামচন্দ্র রাজ্যের পূর্বদিকে নানা রাজকার্যে লিপ্ত ছিলেন। তাঁদের ভ্রমরাকুণ্ডে তীর্থ স্নান উপলক্ষ্যে আসাম রক্ষীদলের সঙ্গে বচসা হয়। ক্রমে তা যুদ্ধ পর্যন্ত গড়ায়। যুদ্ধে প্রাথমিকভাবে কামতারাজসেনার বিজয় হলেও আসাম সেনাদল ক্রমেই সংগঠিত হতে থাকে এবং নানা জায়গায় কামতাপুরের সৈন্যদের পর্যুদস্ত করে। দীপ সিংহ, হেমধর, রামচন্দ্র তিন রাজ ভ্রাতারই মৃত্যু হয়। বর্তমান আসামের শিবসাগর জেলায় 'মঠাডাঙ্গ' নামে একটি জায়গা আছে, জনশ্রুতি আছে যে ঐ 'মঠাডাঙ্গ' খ্যাতনামা হয় কারণ আসাম সেনাদল কামতারাজের পাঁচ হাজার সৈন্যের মাথা কেটে তা ঐখানে জমা করে স্তূপ বানিয়ে রাখে। ১৫৪৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ কামতারাজের সেনাদল সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। পূর্ব আসামের এই যুদ্ধ বিগ্রহ নরনারায়ণকে এতটাই ব্যতিব্যস্ত রেখেছিল যে ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে পাঠান সেনাপতি কালাপাহাড় যখন হাজো ও কামরূপ আক্রমণ করে মন্দির এবং মূর্তি ধবংস করতে থাকে তখন নরনারায়ণের তরফে তার কোন প্রতিরোধের বিবরণ জানা যায় না। আসামরাজের সঙ্গে বিবাদ অন্য মাত্রা পায় আরও একটি কারণে। হোসেন শাহ কামতাপুর আক্রমণ করলে কামতেশ্বরের পুত্র দুর্লভেন্দ্র পূর্বদেশে গিয়ে একটি ছোট রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁর পুত্র সুচারুচান্দ পরবর্তীকালে আসামরাজের সাহায্য পেয়ে গৌড়েশ্বরের পরামর্শে বেহাররাজ্যে স্থাপিত হয়েছিলেন। পরে নরনারায়ণ (১৫৫৫ খ্রিঃ) সুচারুচান্দকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেন। এই সুযোগে কামতাপুরের জনৈক সামন্ত রাজা বিদ্রোহী হয়ে আসামরাজের পক্ষ অবলম্বন করেন। এভাবেই দুই রাজ্যের বিরোধ চরমে ওঠে। ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে আষাঢ় মাসে মহারাজ কয়েকজন দূতের হাতে কিছু উপহার সামগ্রী আসামের রাজার জন্য পাঠান, এবং তিন রাজকুমারের মৃত্যুর জন্য অনুযোগ করেন।

দূত হিসাবে পাঠান শতানন্দকর্মী, রামেশ্বরশর্মা, কালকেতু সরদার, ধূমা সরদার, উদ্দণ্ড চাওনিয়া ও শ্যামা রায় চাওনিয়াকে। আসাম রাজধানী গড়গাঁওতে উপস্থিত হয়ে তারা কামতারাজের প্রদত্ত চিঠি ও উপহার দ্রব্যগুলি উপস্থিত করলে আসামরাজমন্ত্রী বড় গোঁসাই তাদের তীক্ষ্ম সমালোচনা করেন। দূতের দল ভগ্নমনোরথ হয়ে ফিরে এলে মহারাজ নরনারায়ণ তাদের কাছ থেকে আসাম রাজের যে প্রত্যুত্তর পান তাতে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগ করেন। যাতায়াতের পথ অত্যন্ত দুর্গম থাকায় রাজভ্রাতা গোঁহাই কমল বা গোঁসাই কমলের উপর ভার

পড়ে সৈন্য এবং যুদ্ধ রসদ যাওয়ার পথ তৈরি করার। সেই আজ্ঞা অনুসারে তিনি ভূটান পর্বতশ্রেণীর উপর দিয়ে ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্তী প্রদেশের উপর দিয়ে পরশুকুণ্ড পর্যন্ত প্রশস্ত রাজপথ নির্মাণ করেন। জলের ব্যবস্থার জন্য নির্দিষ্ট দূরত্ব মেপে রাস্তার ধারে তৈরি হয়েছিল পুষ্করিণী। গোঁহাই কমলের নামেই এই রাজপথের নামকরণ হয়েছিল। পথ প্রস্তুত হলে প্রধান সেনাপতি শুক্লধবজ কোচ, ডোম, কেওট জাতীয় প্রায় ষাট হাজার সেনাদলের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করেন। স্থলপথ ও জলপথে আসাম আক্রমণের আয়োজন হয়েছিল। নৌসেনাপতি ভক্তমাল এবং টেপুর সৈনাপত্যে এক বৃহৎ নৌবহর নদীপথে যাত্রা করে, এবং সেনাপতি ভীমবল এবং বাহুবল পাত্রের নায়কত্বে বাহান্ন হাজার সৈন্য স্থলপথে যুদ্ধযাত্রা করেন। যুদ্ধযাত্রার শেষভাগে রাজা নরনারায়ণ, রানী ভানুমতী সহ যুদ্ধযাত্রায় যোগ দেন। সুদীর্ঘ যাত্রাপথে ভুটিয়া অধিবাসীদের কাছ থেকে তিনি কর আদায় করেন এবং তারাও সেনাদলে যোগ দেন। পথিমধ্যে আসামরাজের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ভুঁইয়ারাও রাজা নরনারায়ণের পক্ষে যোগ দেন। দফলা নামে পার্বত্য উপজাতিরাও রাজা নরনারায়ণের পক্ষে যোগ দেন। ১৫৬২ খ্রিঃ আসাম ও কামতাপুর রাজের মধ্যে প্রকৃত সম্মুখসংগ্রাম শুরু হল।[১৯] জলপথে ও স্থলপথে আসাম সৈন্য পরাজিত হলে আসামরাজের পক্ষ থেকে তিনজন দূত এসে সন্ধির প্রস্তাব দেন। রাজা নরনারায়ণের পক্ষ থেকেও আসাম রাজের কাছে দূত যায় এবং সন্ধির প্রস্তাব স্বীকৃত হয়। কিন্তু উপহারের আদানপ্রদান হয়ে সন্ধি হলেও যুদ্ধবিগ্রহ কমে না। কামতাপুরের নৌসেনাপতি টেপু আসামের অধিকৃত অঞ্চলে লুঠতরাজ চালাতে থাকলে আবার যুদ্ধ বাধে। আসাম সৈন্য পরাস্ত হয়। আসাম রাজ নাগাপর্বতে আত্মগোপন করেন, আসাম রাজধানী গড়গাঁও অধিকৃত হয়। পরে আসাম রাজের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব এলে নরনারায়ণ স্বীকৃত হন আসাম রাজের পক্ষ থেকে রাজকুমার ও অন্যান্য অভিজাতরা এসে রাজার বশ্যতা স্বীকার করলে সন্ধি হয়। আসাম রাজের পক্ষ থেকে প্রচুর সোনা, রূপো, হাতী, সুন্দরী কন্যা, ৩০০ জন মানুষ এবং রক্তবর্ণ রাজছত্র মহারাজ নরনারায়ণকে উপহার হিসাবে পাঠান। এই সময় ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরের প্রায় সমস্ত ভূভাগ নরনারায়ণের অধিকারভুক্ত হয়। কুমার কমলনারায়ণ মোরঙ্গ দেশের (লক্ষীপুর জেলা) রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হন। আসাম বিজয়ের পর মহারাজা নরনারায়ণ কাছাড়রাজ্য জয় করেছিলেন। শুক্লধবজ কয়েকজন মাত্র অশ্বারোহী নিয়ে অকস্মাৎ কাছাড়ে অতর্কিত আক্রমণ করলে কাছাড়রাজ মেঘনারায়ণ ভীত হয়ে বিবিধ মূল্যবান দ্রব্যাদি এবং ২৮টি হাতী উপঢৌকন দিয়ে এবং বার্ষিক ৭০ হাজার রৌপ্যমুদ্রা, এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা এবং ৬০টি হাতি করদানের অঙ্গীকার করে মহারাজ নরনারায়ণের বশ্যতা স্বীকার করেন। শুক্লধবজ এই সময় কাছাড়ে একটি উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং স্বজাতীয়দের সেখানে উপনিবিষ্ট করান। এরা পরবর্তীকালে 'দেওয়ান' বা উচ্চারণ বিভ্রাটে 'ধেয়ান' নামে পরিচিত ছিলেন। কাছাড় বিজয়ের পর নরনারায়ণ মণিপুর রাজ্যের দিকে অগ্রসর হন। মণিপুররাজ ২০ হাজার রৌপ্যমুদ্রা, তিনশত স্বর্ণমুদ্রা, দশটি হাতি বার্ষিক করদানের অঙ্গীকারে সন্ধি করেন। এরপর জয়ন্তিয়ারাজ শুক্লধবজের হাতে নিহত হলে মহারাজ নরনারায়ণের আদেশে রাজপুত্রকে রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং ১০ হাজার রৌপ্যমুদ্রা, ৭০টি ঘোড়া এবং তিনশত নাকৈ দাও তাঁর বাৎসরিক কর হিসাবে স্বীকৃত হয়। শ্রীহট্টের অধিপতির কাছে বশ্যতা স্বীকারের জন্য দূত পাঠিয়েছিলেন শুক্লধবজ, কিন্তু তিনি সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করায় শুক্লধবজ শ্রীহট্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। দুই দিন যুদ্ধের পর শুক্লধবজ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করে শত্রুসৈন্য বিমথিত করে শ্রীহট্টের আমিলকে বধ করেন। পরে যথাসময়ে তার ভাই নরনারায়ণের কাছে আনীত হলে মহারাজ তাঁকে আমিলের পদাভিষিক্ত করেন এবং ১০০টি হাতি, ২০০টি অশ্ব, তিন লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা, দশসহস্র স্বর্ণমুদ্রা বার্ষিক করদানের অঙ্গীকার করলে তাঁকে শ্রীহট্ট রাজ্যের পুনরাধিকার দেওয়া হয়। মহারাজ নরনারায়ণের আদেশে শুক্লধবজ ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন। ত্রিপুরারাজের সঙ্গে শুক্লধবজের লঙ্খাই নামক স্থানে ভয়ানক যুদ্ধ হয় এবং উভয়পক্ষেই প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। ত্রিপুরারাজের মৃত্যুতে এই যুদ্ধের সমাপ্তি হয়। ত্রিপুরারাজের ভাই বা মতান্তরে পৌত্র ১০০০০ রৌপ্যমুদ্রা, একশত স্বর্ণমুদ্রা

এবং ত্রিশটি অশ্ব প্রদান করে সন্ধি প্রার্থী হলে বার্ষিক নয় হাজার টাকা করের বিনিময়ে তাঁর রাজ্য পুনঃপ্রদান করা হয়। এই সময় চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চলে ত্রিপুরার আধিপত্য ছিল, তা লোপ করা হয়। মহারাজ নরনারায়ণ নববিজিত প্রদেশে প্রভুত্ব রক্ষার জন্য ব্রহ্মপুরে একদল সৈন্য মোতায়েন করেন। তার থেকেই এই স্থান প্রথমে কোচপুর, পরে খাসপুর নামে পরিচিত হয়। খাইরম রাজ, ডিমরুয়ারাজ প্রমুখ পার্বত্য প্রজাতির রাজারা পরাক্রান্ত প্রতিবেশীদের পরাজয়ের বিবরণ প্রত্যক্ষ করে বার্ষিক করের বিনিময়ে নরনারায়ণের বশ্যতা স্বীকার করেন। আসাম বিজয়ের পরে কামাখ্যার মন্দির নির্মানের আগে নরনারায়ণ কর্তৃক গৌড় আক্রমণের কথা আসাম বুরঞ্জী এবং প্রায় সমস্ত বংশাবলীগুলিতে পাওয়া যায়। কিন্তু গৌড় আক্রমণ করলেও তিনি জয়লাভ করতে পারেন নি। যুদ্ধে তাঁর সেনা পরাজিত, সেনাপতি শুক্লধবজ বন্দী হন। শুক্লধবজ মুক্তিলাভ না করা পর্যন্ত নরনারায়ণ অন্ন গ্রহণ করেন নি। দরঙ্গ বংশাবলী অনুযায়ী শুক্লধবজ গৌড়েশ্বরের মাতাকে সাপে কাটার চিকিৎসায় বিষমুক্ত করলে তিনি তাঁকে পুত্র সম্বোধন করে করে মুক্তি দেন, পাঁচজন সদ্বংশজাতা কন্যার সঙ্গে বিবাহ দেন এবং বিস্তীর্ণ ভূভাগ যৌতুক হিসাবে দেন।[২০] গৌড়েশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ এবং পরাজয় নরনারায়ণের খ্যাতিকে অনেকটাই ম্লান করে দেয়। এই বিপর্যয়ের সুযোগে আসামরাজ আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেন। দুবার জলপথে আক্রমণ করলে দুবারই কামতাপুরের সৈন্যরা পরাজিত হয়। অবশেষে ১৫৭১ খ্রিঃ আসামরাজ পুনরায় স্বাধীনতা অর্জন করেন। কিন্তু আসাম ও কামতাপুরের মধ্যে নানাবিধ আচার ব্যবহারের আদান প্রদান ছিল। কামতাপুরের আড়ম্বর সহ দুর্গাপুজোর বর্ণনা শুনে আসামরাজও নিজ রাজ্যে দুর্গাপুজোর ব্যবস্থা করেছিলেন। আইন-ই-আকবরীতে উল্লিখিত আছে দিল্লীশ্বর আকবরের সঙ্গে নরনারায়ণের যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল।[২১] ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দে এই পরিচয়ের সূত্রপাত এবং তিনি দিল্লিতে নানা উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন। তবে সম্ভবত অধীন রাজা তিনি ছিলেন না। বস্তুত রাজভ্রাতা শুক্লধবজের বাহুবলের উপর ভিত্তি করে রাজা নরনারায়ণ এক সুবিশাল সাম্রাজ্যের স্থাপনা করেছিলেন। রাজ্যশাসন প্রক্রিয়া সুচারুরূপে চালানোর জন্য নানা অংশে তিনি নিজ ভাইদের বা রাজকুমারদের শাসনকার্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সঙ্কোশ এবং ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বদিকে অবস্থিত সামন্ত রাজ্যগুলির উপর আধিপত্য ছিল শুক্লধবজের। কমলনারায়ণ বা গোঁহাই কমল ডিব্রু অঞ্চলে সাম্রাজ্যের পূর্বভাগের দায়িত্বে ছিলেন। পরে কাছাড় অঞ্চলে তিনি স্থানান্তরিত হন। মহারাজ নরনারায়ণের শাসনকালের অন্যতম মুখ্য ঘটনা হল আসামের প্রখ্যাত বৈষ্ণব ধর্মাচার্য শঙ্করদেবের কামতাপুরে আগমন। তিনি কামতাপুরে এসে রাজপৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। জীবনের বাকি দিনগুলি শঙ্করদেব কামতাপুরেই কাটিয়েছিলেন। তাঁর প্রভাবে কালক্রমে বৈষ্ণবধর্ম রাজধর্মরূপে স্বীকৃত হয়। শঙ্করদেবের প্রসঙ্গ রাজপরিবার ও বৈষ্ণবধর্ম আলোচনা প্রসঙ্গে বর্ণিতব্য।

মহারাজ নরনারায়ণ পূর্ব ও উত্তর পূর্ব ভারতের এক বিরাট অংশে রাজ্যবিস্তার করেছিলেন। অনেক ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা এবং সামন্তপ্রভুরা তাঁর অধীনতা স্বীকার করেছিলেন। তাঁর ক্ষমতার মধ্যগগনে তাঁর রাজ্য পূর্বে ব্রহ্মদেশের সীমান্তবর্তী পার্বত্য অংশ, উত্তরে তিববত, পশ্চিমে মিথিলা বা ত্রিহুতের সীমান্ত, দক্ষিণে ঘোড়াঘাট পর্যন্ত প্রসারিত হয়। তাঁর সাম্রাজ্যের সীমারেখা চট্টগ্রামের কাছে সমুদ্রতীরে এসে মিলেছিল। রাজ্য শাসনের সুবিধার জন্য নানা জায়গায় অস্থায়ী রাজধানী স্থাপন করতেন মহারাজ নরনারায়ণ। গোঁহাই কমল আলী বা গোঁসাই কমলের রাজপথ তাঁর এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। এই সমগ্র রাস্তার ধারে তো বটেই, প্রচুর দীঘি খনন করিয়েছিলেন তিনি রাজ্যের প্রজাদের জলকষ্ট দূর করতে। কামাখ্যা মন্দির সংস্কার এবং হাজোর হয়গ্রীব মাধবের প্রাচীন মন্দিরের সংস্কার সাধন তাঁর শাসনকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মন্দিরের ব্যয় নির্বাহের জন্য বহু নিস্কর ভূমি 'দেবোত্তর' করে দেন। নিজ বংশে দশভূজা দুর্গাপুজোরও তিনি প্রবর্তন করেন। বর্তমানেও কোচবিহার 'দেবীবাড়ী' নামক স্থানে একটি মন্দিরে দুর্গার বাৎসরিক পুজো হয়। এই দুর্গামূর্তির অভিনবত্ব হল এখানে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক বা গণেশ পূজিত হন না। কথিত আছে রাজা বনভূমির মধ্যে যে দেবীর মূর্তি পেয়েছিলেন সেই মূর্তি রূপেই এই দেবীমূর্তি

কল্পিত। শঙ্করদেবের পরামর্শে তিনি একটি নারায়ণমূর্তি প্রতিষ্ঠাও করেন এবং সভাকবি পণ্ডিত অনন্ত কন্দলীকে (শঙ্করদেবের শিষ্য) ঐ মূর্তির পূজার দায়িত্ব নেন। মিথিলা ও গৌড় প্রভৃতি স্থান থেকে ব্রাহ্মণদের এনে স্বরাজ্যে বসতি করান। তাঁর রাজসভাতেও নানা বিদ্যায় বিদ্বান বিশিষ্ট পণ্ডিতদের অবস্থান ছিল। শিক্ষা সাহিত্যের নানাভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন তিনি। তাঁর আমলে রাজকর্মচারীদের নির্দিষ্ট মান পর্যন্ত শিক্ষালাভ বাধ্যতামূলক ছিল। মূর্খ কর্মচারী নিয়োগ তিনি নিষিদ্ধ করেছিলেন। মল্লবিদ্যার অধিকারী ছিলেন বলে তাঁকে মল্লদেব নামে ভূষিত করা হয়। দিল্লির দরবারেও উদীয়মান এই নবীন শক্তির সপ্রশংস সদর্থক আলোচনা হত।

মহারাজ নরনারায়ণের কথা বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে যাঁর কথা বলা অবশ্যম্ভাবী তিনি রাজভ্রাতা 'শুক্লধবজ'। মূলত তাঁরই বাহুবল ও রণকুশলতায় রাজা নরনারায়ণ এই সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের অধিকারী হতে পেরেছিলেন বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। কথিত আছে আসাম যুদ্ধের সময় ঘোড়ার পিঠে চেপে ধরলা নদী পার হয়েছিলেন বলে ইনি চিলা রায় নামে খ্যাত। মতান্তরে লোকশ্রুতি, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুসেনার উপর চিলের মত লাফিয়ে পড়তেন বলে তাঁর নাম হয়েছিল চিলা রায়। রাজা নরনারায়ণের প্রিয়তম ভাই এবং সাম্রাজ্য বিস্তার ও পরিচালনায় তাঁর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন শুক্লধবজ। তিনি যুবরাজ নামে পরিচিত ও মান্য ছিলেন। প্রগাঢ় পণ্ডিত এই ব্যক্তির নিঃস্বার্থ দেশসেবা তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক জগতে আলোচিত ছিল। 'চিলা রায়ের গড়' বা চিলাপাতার জঙ্গল ইত্যাদি আজও কোচবিহারে পরিচিত নাম। বারকোদালী গ্রামে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ছোট মহাদেব আজও পূজিত। সম্ভবত ১৫৭১ খ্রিঃ দ্বিতীয়বার গৌড় আক্রমণের সময় গঙ্গাতীরে বসন্ত রোগে তাঁর মৃত্যু হয়।[২২] শুক্লধবজ নিজেও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন, পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেও তিনি ছিলেন উৎসাহী। তাঁর উৎসাহ ও অনুরোধে পীতাম্বর সিদ্ধান্ত বাগীশ মার্কণ্ডেয় পুরাণ লিখতে উৎসাহী হন, কিন্তু সম্ভবত গ্রন্থ রচনার আগেই শুক্লধবজের মৃত্যু হয়। কামাখ্যা মন্দিরের সংস্কারসাধনেও তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। প্রথমে এই কাজের ভার রাজার পক্ষ থেকে মহৎরাম বৈশ্যকে দেওয়া হয়। পরে তিনি অসাধুতার পরিচয় দিলে সেনাপতি মেঘা মকদুম এই কাজের দায়িত্ব নেন এবং তা বিশ্বস্ততার সঙ্গে শেষ করেন।

নরনারায়ণের রাজত্বের শেষভাগ এই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সমাপ্তির উপযুক্ত নয়। প্রথমত এই সুবিশাল রাজ্য ভেঙে পড়ার কারণ শুক্লধবজের মৃত্যু। দ্বিতীয়ত রাজপরিবারের গৃহবিবাদ। শুক্লধবজের প্রবল পরাক্রমের অভাব যে কোন অধীন সামন্ত রাজাকে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে সুযোগ দিয়েছিল। ফলে সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে বিদ্রোহী শক্তি মাথাচাড়া দিচ্ছিল। এছাড়া মোগল শক্তির ক্রমবিস্তার কোচরাজ্যের আয়তনকে খানিকটা ছোট করে ফেলেছিল। দ্বিতীয়ত রাজপরিবারের আভ্যন্তরীণ বিবাদ বিসংবাদ এবার আত্মপ্রকাশ করে। প্রথমত, নরনারায়ণের ভাই গোঁহাই কমল, যিনি কাছাড়ের খাসপুরে (কোচপুর) রাজপ্রতিনিধি ছিলেন তিনি স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। পরবর্তীকালে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত তাঁর বংশধরগণ ঐ অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন। দ্বিতীয়, আঘাতটি আসে শুক্লধবজের পরিবারের দিক দিয়ে। মহারাজ নরনারায়ণ সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন। শুক্লধবজের পুত্র রঘুদেবকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্তও করেছিলেন। রঘুদেব পাটকুমার নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সে নরনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণের জন্ম হয়। পরে বলিনারায়ণ ও প্রভাবতী নামে তাঁর একটি পুত্র ও একটি কন্যার জন্ম হয়। লক্ষ্মীনারায়ণের জন্মলাভের পর রঘুদেবের সিংহাসনে বসার সম্ভাবনা থাকে না। এর মধ্যে শুক্লধবজের মৃত্যুর ফলে তাঁর কিছু ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা রঘুদেব নারায়ণকে মন্ত্রণা দিতে থাকেন এই অবিচারের শোধ নেওয়ার জন্য। শুক্লধবজের মৃত্যুর পর তাঁর হাতি ঘোড়া, রথ ইত্যাদি রাজাজ্ঞায় রাজধানীতে আনা হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্লধবজের অনুগত কবীন্দ্র পাত্র, গদাধর চাওনিয়া, পুরন্দর লস্কর, যুধিষ্ঠির ভাণ্ডার কায়স্থ, কর্ণপুরগিরি, সোনাবর, রূপাবর সর্দার প্রমুখ চিলা রায়ের ঘনিষ্ঠরা নরনারায়ণের বিরোধিতার রাস্তা খুঁজতে থাকেন। অচিরেই রঘুদেব নারায়ণের মন বিষাক্ত হয়ে ওঠে এবং পিতৃব্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে

তিনি রাজধানী ত্যাগ করে মানস নদের তীরে বড়নগরে এক বাসস্থান নির্মাণ করে সেখানে বাস করতে থাকেন। গদাধর নদের তীরে ঘিলাবিজয়পুরেও তিনি আর একটি দুর্গ তৈরি করেছিলেন। এরপর তিনি কোচরাজ্যের 'বাহারবন্দ বিভাগ' (রঙ্গপুর) লুণ্ঠন করেন। নরনারায়ণ বিরূপাক্ষ কার্য্যী নামে এক দূত রঘুদেবের কাছে পাঠালে রঘুদেব তাঁকে বন্দী করেন। এরপর যুদ্ধ ছাড়া কোন পথ খোলা থাকে না। রাজা গোঁহাই মদন বা গোঁসাই মদনকে যুদ্ধে পাঠিয়ে নিজেও যুদ্ধে যোগ দেন। নিজে এই যুদ্ধে সম্মুখ সমরে হার অনিবার্য বুঝতে পেরে এক নীচ উপায় অবলম্বন করেছিলেন রঘুদেব নারায়ণ তিনি তাঁর স্ত্রীদের যোদ্ধার বেশে সাজিয়ে পিতৃব্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠান। এই অল্পসংখ্যক বালক সৈন্য দেখে নরনারায়ণ বিস্মিত হন। পরে প্রকৃত বিষয় জানতে পেরে লজ্জায় অধোবদন রাজা যুদ্ধ ছেড়ে চলে যান সসৈন্যে, পরে রঘুদেবকে সন্তুষ্ট করতে সঙ্কোশ নদের পূর্বতটবর্তী ভূ-ভাগ রঘুদেব নারায়ণকে দেওয়া হয়। নিজের ভাই বা ভ্রাতুষ্পুত্রকে স্নেহ করার মাশুল গুণতে হয় কোচরাজাকে। রঘুদেব 'ছোটরাজা' উপাধি পেয়েছিলেন। সামান্য কিছু বার্ষিক করদানের অঙ্গীকার ছাড়া অন্য কোন অধীনতার চিহ্ন তাঁর ছিল না। মুদ্রা নির্মাণের উপর নিষেধাজ্ঞার জন্য তিনি স্বাধীন মুদ্রা বের করতে পারেন নি। ১৫৮১ খ্রিঃ নাগাদ এই রাজ্যবিভাগ ঘটে। শুক্লধবজের পুত্র বা গোঁহাই কমলের প্রতি এই ব্যবহার নরনারায়ণের স্নেহকোমল মনের পরিচায়ক। ১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দে মহারাজ নরনারায়ণের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ রাজত্বভার গ্রহণ করেন। খ্রিস্টীয় পঞ্চ দশ শতাব্দীর শেষভাগে মহারাজ বিশ্বসিংহ অসামান্য প্রতিভাবলে যে নতুন রাজশক্তির বিকাশ ঘটিয়েছিলেন, পরবর্তী প্রজন্মে নরনারায়ণ ও শুক্লধবজের অক্লান্ত তপস্যায় যা গৌড়ের প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠেছিল, নরনারায়ণের জীবনের শেষভাগে তা নানা খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ল। রণক্লান্ত নরনারায়ণের জীবনের শেষভাগে এটাই চরম ট্র্যাজেডি।

মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণ (১৫৮৭-১৬২৭)

১৫৮৭ খ্রিঃ মহারাজ নরনারায়ণের মৃত্যুর পর কুমার লক্ষ্মীনারায়ণ রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অব্যবহিত পরেই স্বনামে মুদ্রা প্রচার করেন। বৈকুণ্ঠপুরের রায়কতগণ এবং মন্ত্রীরা নতুন রাজাকে নজর প্রদান করেন। অভিষেকের পর রাজ্যশাসনকালে তিনি পিতার আমলের মন্ত্রীদের পুনর্বহাল করেছিলেন। অভিষেক উপলক্ষে নানা রাজ্য থেকে মঙ্গলকামনার্থে উপঢৌকন এসেছিল, বিভিন্ন রাজদূতদের তিনি সন্তোষজনক পারিতোষিকে আপ্যায়িত করেছিলেন। মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের রাজ্যাভিষেককালে দিল্লিতে জালালউদ্দীন মোহাম্মদ আকবর শাহ দিল্লির সিংহাসনে আসীন ছিলেন। তাঁর গৌড়ের প্রতিনিধিরা সেই সময় বিদ্রোহী পাঠানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন এবং সাহাবাজ খাঁ এবং ওয়াজিদ খাঁ পাঠানদের ব্রহ্মপুত্র তীর পর্যন্ত বিতাড়িত করেছিলেন। রাজোপাখ্যান থেকে জানা যায় লক্ষ্মীনারায়ণের রাজ্যের দক্ষিণ অঞ্চ লের শাসনকর্তা কুমার অনিরুদ্ধ ঐ সময়ে মোগল সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়। লক্ষ্মীনারায়ণের রাজ্যলাভের কিছুকালের মধ্যেই শুক্লধবজপুত্র রঘুদেব নারায়ণ পূর্ব কামরূপের স্বাধীন রাজা হিসাবে মুদ্রা প্রচার করেন। এই ঘটনায় লক্ষ্মীনারায়ণের সঙ্গে তার বিবাদ বাধে, এবং তা ঘোরতর যুদ্ধে পর্যবসিত হয়। রঘুদেবপুত্র কুমার পরীক্ষিৎ এক সন্ন্যাসীর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। এই মেলামেশা রঘুদেব জোর করে বন্ধ করতে চান, ফলে পুত্র এতদূর বিদ্রোহী হয় যে পিতৃহত্যার ষড়যন্ত্র পর্যন্ত করে। বাধ্য হয়ে রঘুদেব পরীক্ষিৎকে বন্দী করেন কিন্তু পরীক্ষিৎ কৌশল ক্রমে পালিয়ে পিতৃব্য লক্ষ্মীনারায়ণের আশ্রয় গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে রঘুদেব পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ বারো ভুঁইয়ার অন্যতম ঈসাখাঁর সঙ্গে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হন, এবং মিলিতভাবে কামতাপুর আক্রমণ করেন। আক্রমণের মোকাবিলায় লক্ষ্মীনারায়ণ প্রথমে আসামের রাজার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন, পরে আকবরের সাহায্য ও আশ্রয়লাভের উদ্দেশ্যে বাংলার সমকালীন সুবেদার মানসিংহের কাছে নিজের অবস্থা ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে দূত পাঠান। মানসিংহ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে

মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ চল্লিশ ক্রোশ পথ এগিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। উভয়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়। লক্ষ্মীনারায়ণের ভগিনী প্রভাবতী দেবীর সঙ্গে মানসিংহের বিবাহ হয় (১৫৯৬ খ্রিঃ)। পরবর্তীকালে (১৬১৪ খ্রিঃ) মানসিংহের মৃত্যু হলে প্রভাবতী দেবী সহমৃতা হন। কিন্তু সে ভিন্ন প্রসঙ্গ। কামতারাজ এবং দিনাজপুরের মহারাজের সঙ্গে সুদীর্ঘকালব্যাপী এক বিবাদ ছিল উত্তরাংশের ভূমিখণ্ডের অধিকার নিয়ে। মানসিংহের মধ্যস্থতায় এই বিবাদের নিষ্পত্তি হয়ে উভয়ের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হয়। রাজা রঘুদেব নারায়ণ কিন্তু অপেক্ষায় ছিলেন, এবং মানসিংহের প্রত্যাবর্তনের কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি আবার কামতাপুর আক্রমণ করেন। তিনি লক্ষ্মীনারায়ণের রাজ্যের কিয়দংশ আক্রমণ করে অধিকার করলে পরাজিত লক্ষ্মীনারায়ণ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে মানসিংহের কাছে সংবাদ পাঠান। সংবাদ পাওয়া মাত্রই মানসিংহের আজ্ঞাবহনকারী মোগল সেনাপতিরা সসৈন্যে রঘুদেবের সেনাদলকে বিতাড়িত করে (১৫৯৭ খ্রিঃ) ভারতবর্ষের তৎকালীন মোগল-পাঠান বিরোধের ইতিহাস কোচবিহার রাজ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। মহারাজ নরনারায়ণ তাঁর রাজত্বকালে রাজনৈতিক সুবিধা অনুযায়ী কখনও পাঠান, কখনও বা মোগলের পক্ষ অবলম্বন করতেন। কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণ সরাসরি মোগলপক্ষীয় হয়ে পড়ায় পূর্ব ও উত্তর পূর্বাঞ্চলে পাঠানরা কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সুযোগে রাজা মানসিংহের পক্ষে পাঠান দমন কার্য সহজসাধ্য হয়। পাঠানরা পূর্ববঙ্গ ও উড়িষ্যায় আত্মগোপন করতে থাকে। পাঠান দলপতি মাসুম খাঁ কাবুলী ঢাকার সুবর্ণগ্রামে ঈসা খাঁর সঙ্গে মিলিত হন। ঈসা খাঁ আগেই রঘুদেবের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। এবার রাজনৈতিক স্বার্থ অনুযায়ী স্পষ্টতই দুটি দল গঠিত হয়। ঈসা খাঁ লক্ষ্মীনারায়ণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলে মানসিংহের পুত্র দুর্জনসিংহ বা অর্জুনসিংহ ঈসা খাঁর বিরুদ্ধে লক্ষ্মীনারায়ণের পক্ষ অবলম্বন করেন। জলযুদ্ধে দুর্জনসিংহ পরাস্ত হন এবং মারা যান। লক্ষ্মীনারায়ণ কোন মতে আত্মরক্ষা করেন, এরপর (১৫৯৯ খ্রিঃ) ঈসা খাঁর মৃত্যু হলে রঘুদেব নিজকন্যা মঙ্গলদেবীকে আসামরাজের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে সন্ধি স্থাপন ও মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হয়। লক্ষ্মীনারায়ণ তথা কোচরাজ্য এরপর দ্বিতীয়বার বিপদের মুখোমুখি হয় রঘুদেবের পুত্র পরীক্ষিতের আচরণে। প্রায় ১৩ বছর পিতৃব্য লক্ষ্মীনারায়ণের আশ্রয়ে বাস করেন পরীক্ষিৎ। এরপর পিতা রঘুদেবের মৃত্যু হলে পরীক্ষিৎ রাজা হন। লোকশ্রুতি ছিল রঘুদেবের মৃত্যুতে পরীক্ষিৎ এবং পূর্বকথিত সন্ন্যাসীর যোগ আছে। রাজা হলে পরীক্ষিৎ নিজের ভাই ইন্দ্রনারায়ণকেও হত্যা করান। তাঁর অপর ভাই মানসিংহ প্রাণের ভয়ে আসাম পালিয়ে যান এবং রাজার কাছে আশ্রয় লাভ করেন। এরপর পরীক্ষিৎ লক্ষ্মীনারায়ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং কোচরাজ্যের 'বাহারবন্দ' বিভাগ লুঠ করেন। পাঠান সহায়তাও পরীক্ষিতের সঙ্গে ছিল। লক্ষ্মীনারায়ণ আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হলেও তাঁর ১২ জন কার্য্যী পাঠানদের হাতে বন্দী হন। এই যুদ্ধেই লক্ষ্মীনারায়ণের ভাই বলিনারায়ণের মৃত্যু হয়, পরীক্ষিৎ বলিনারায়ণের যথাবিধি সৎকার শেষ করে লক্ষ্মীনারায়ণের কাছে 'অস্থি' প্রেরণ করেন। পরে লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দী কার্য্যীদের মুক্তি প্রার্থনা করলে রঘুদেবের আমলের রাজছত্র, যা কোচ রাজবংশ কর্তৃক বিজিত হয়েছিল সেই পৈতৃক রাজছত্র দাবি করেন। পৈতৃক রাজছত্রের বিনিময়ে পরীক্ষিৎ কার্য্যীদের মুক্তি দেন। ইতিমধ্যে দিল্লীর দরবারের পালা বদল হতে থাকে। ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ একবার মানসিংহের বদলে আবদুল মজিদ আমক খাঁ বাংলার সুবাদার হয়ে আসেন। ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে আকবরের মৃত্যু হলে যুবরাজ সেলিম, জাহাঙ্গীর উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে বসেন। তিনি মানসিংহকে আবার বাংলার সুবাদার করে পাঠান। কিন্তু এক বছর যেতে না যেতেই তাকে বাদশার দরবারে ফিরে আসতে হয়। বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন কুতুবউদ্দীন খাঁ, এবং শের আফগান ঘটিত বিষয়টিও এই সময় ঘটে। ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিহত হন। পরবর্তী শাসনকর্তা জাহাঙ্গীর কুলি খাঁও এক বছরের মধ্যে মারা যান। এরপর সেখ আলাউদ্দিন এসলাম খাঁ সুবাদার নিযুক্ত হন। এইভাবে বারবার শাসনকর্তা বদলের সুযোগে পাঠান রাও স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করে, জমিদারের মধ্যেও কেউ কেউ বিদ্রোহী হন। পরীক্ষিৎ নারায়ণও এই সুযোগে পিতৃব্য লক্ষ্মীনারায়ণের রাজ্যের নানা অংশ আক্রমণ ও

অধিকার করে তাকে বিপন্ন করে তুলেছিল। এরপর মোগল সুবাদার এসলাম খাঁ বারো ভুঁইয়াদের উচ্ছেদ করে কামতারাজের কাছে দূত পাঠালে তিনি নানা উপহার দ্রব্যে তাকে আপ্যায়িত করে নিজ অবস্থা বিবৃত করেন। উভয়ে একযোগে পরীক্ষিতের রাজ্য আক্রমণে করবেন, এবং রাজ্য অধিকৃত হলে তা লক্ষ্মীনারায়ণকে প্রদত্ত হবে এমনটাই ঠিক হল। ১৬১২ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে মোগল সৈন্য ধুবড়ী দুর্গ অধিকার করে। দ্বিমুখী আক্রমণে এক ভয়ানক যুদ্ধের পর পরীক্ষিৎ পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করেন। ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে পরীক্ষিতের কামরূপ রাজ্য অধিকৃত হল এবং মোগল সেনাপতি তা লক্ষ্মীনারায়ণকে ফিরিয়ে দেন। কিন্তু এর কিছুকালের মধ্যেই সুবাদার এসলাম খাঁর মৃত্যু এবং পরীক্ষিতের সসম্মানে ঢাকায় অবস্থিতি এই দুই সংবাদ লক্ষ্মীনারায়ণকে বিচলিত করে তুলল। পরবর্তী সুবাদার কাসেম খাঁ লক্ষ্মীনারায়ণের সাক্ষ্য প্রার্থনা করে দূত পাঠিয়েছিলেন, এবং বলে পাঠিয়েছেন পূর্ববর্তী সুবাদার কর্তৃক গৃহীত প্রতিশ্রুতি সমূহ যথাযথভাবে পালন করা হবে। পরে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ সাক্ষাৎ করতে গেলে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে বন্দী করে আগ্রায় পাঠানো হয়। এই সংবাদে কামতাপুরের রাজভক্ত মানুষেরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে, আবার বিদ্রোহীরাও অরাজকতার সুযোগে স্বাধীনতা ঘোষণা করে পরিস্থিতি আরও জটিল করে তোলে। লক্ষ্মীনারায়ণের পৌত্র রাজা মধুসূদন অস্ত্রধারণ করে বিদ্রোহী 'নব'কে বন্দী করলে বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। ইতিমধ্যে সুবাদার কাসেম খাঁ পদচ্যুত হলেন। পরবর্তী সুবাদার ইব্রাহিম ফতেজঙ্গ জাহাঙ্গীরকে কামরূপ কামতার রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ এবং পরীক্ষিৎ নারায়ণ উভয়ের মুক্তি প্রার্থনা করেন। জাহাঙ্গীর প্রচুর উপঢৌকন সহ রাজাকে স্বদেশে ফেরবার অনুমতি দেন। তিনি পরীক্ষিৎ ও রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের মধ্যে সদ্ভাব উৎপাদনের চেষ্টাও করেন। কিন্তু মূলত পরীক্ষিতের অহংকারের জন্য তা ফলপ্রসূ হয় নি। এরপর ঢাকায় এসে সুবাদারের সঙ্গে রাজা সাক্ষাৎ করেন। আঞ্চলিক বিদ্রোহ প্রশমনের জন্য মোগল সৈন্য তখন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নানাস্থানে খণ্ডযুদ্ধ করছে। মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ মোগল সৈন্যকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। রাজার পক্ষে মধুসূদন, মধুসূদন পুত্র পশুপতি, লম্বোদর এবং সূর্য গোঁসাই-এর পুত্র রামসিংহ বিশেষ কৃতিত্ব ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। মোগল সেনাপতি খেতাব খাঁ, কামাল এবং ভূষণার রাজা সত্রাজিতের সঙ্গে লক্ষ্মীনারায়ণের হৃদ্যতা ছিল। তিনি আসামরাজ ও মোগল সম্রাটের মধ্যে সদর্থক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়নি। বিরূপাক্ষ কার্য্যী নামে এক কর্মচারীকে তিনি দূত হিসাবে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি বন্দী হন।

এরপর দিল্লী দরবারে এক অভাবনীয় পালাবদল ঘটে। জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহজাহান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন এবং বাংলার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন ও নিহত করেন। বাংলার অধিকার গ্রহণ করে তিনি সেতাব খাঁকে লক্ষ্মীনারায়ণের কাছে নিজ বিজয়ের সংবাদ জানিয়ে নিজ পক্ষভুক্ত সেতাব খাঁয়ের নির্দেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী চলতে অনুরোধ জানান।[২৩] শাহজাহানের ফরমান তাঁর হস্তগত হলেও শাহজাহান বাংলাদেশ ত্যাগ করলেই তিনি বাদশাহের পক্ষভুক্ত হয়ে কাজ করতে থাকেন। ১৬২৬ খ্রিঃ খ্রিস্টধর্ম প্রচারক স্টিফেন ক্যামিলা লক্ষ্মীনারায়ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, এবং ভূটান রাজ্যে যাওয়ার ব্যাপারে অনুসন্ধান করেন। লক্ষ্মীনারায়ণের হাজোর প্রাসাদে সাক্ষাৎ করেন। এরপর তাঁরা রাজার নির্দেশিত পথে প্রথমে বেহার রাজ্যে, পরে রাঙ্গামাটি হয়ে ভূটানের পথে রওনা দেন। তাঁদের বেহার ত্যাগ করবার অল্পকাল পরেই লক্ষ্মীনারায়ণের লোকান্তর প্রাপ্তি ঘটে (১৬২৬ খ্রিস্টাব্দে) একথা সত্যি যে মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁর পিতা বা পিতামহের মত দোর্দণ্ডপ্রতাপ ছিলেন না। শারীরিক বা মানসিকভাবে তিনি প্রতিপক্ষ রঘুদেব নারায়ণ বা পরীক্ষিৎনারায়ণের তুলনায় হীনবল ছিলেন। ফলতই তাঁকে নানা প্রকার কৌশল আশ্রয় করতে হয়েছিল নিজের রাজ্য বাঁচানোর জন্য। তাঁর মুঘলদের আশ্রয় গ্রহণ রাজবংশেও তাঁর অনেক বিরোধীর সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু রাজা নরনারায়ণের আমলের অমীমাংসিত গৃহবিবাদ লক্ষ্মীনারায়ণের সামনে আর কোন পথ খোলা রাখে নি। তাঁকে পিতৃসিংহাসন রক্ষার তাগিদে বাধ্য হয়েই বাদশাহের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল। মহারাজ নরনারায়ণ মোগল পাঠান বিরোধের সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যসীমা

বহুদূর বাড়িয়েছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্বকালে তার অনেকাংশই হস্তচ্যুত হয়। আসামরাজ আগেই স্বাধীনতা অর্জন করেছিলেন। রঘুদেব নারায়ণ পূর্ব কামরূপে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কমলনারায়ণ বা গোঁহাই কমল কাছাড়ের খাসপুরে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছিলেন। পরে কামরূপে মোগল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ব্রহ্মপুত্রের পূর্বভাগে অবস্থিত ভূভাগের সঙ্গে লক্ষ্মীনারায়ণের কোন সম্পর্ক ছিল না। ডিমরুয়া, কাছাড়, জয়ন্তিয়ার রাজারা পারস্পরিক যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। জয়ন্তিয়ারাজ যশোমানিক উৎপীড়িত হয়ে মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণের সাহায্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু কোন সাহায্য রাজা করতে পারেন নি। স্টিফেন ক্যামিলার ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে জানা যায় কোচরাজের কোন পিতৃব্য ভ্রমণ করতে ভুটানে গিয়ে বন্দী হয়েছিলেন। এথেকে ধারণা করা যায় যে ভুটানেও তখন আর রাজার শাসন ছিল না। লক্ষ্মীনারায়ণের সেনাবাহিনী ছিল বিরাট। তাঁর রাজত্বকালে রাজধানীতে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের আগমন ঘটেছিল। এছাড়া নাপিত, রজক, স্বর্ণকার, গায়ক, বাদক, নট প্রভৃতি নানা শ্রেণীর মানুষ বাস করত। মহারাজ আগ্রা থেকে স্থপতি এনে রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন। আসামরাজ ও কামরূপরাজের উৎপীড়নের ফলে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারক মাধবদেব ও দামোদরদেব তাঁর রাজধানীতে আশ্রয় পান, এবং বৈষ্ণবধর্ম মহারাজ রাজধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি দেন। লোকশ্রুতি বলে যে তিনি অন্য ধর্মাবলম্বীদের যথেষ্ট নির্যাতন করেছিলেন।

মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ আঠারো জন রাজপুত্রের জনক, তাঁর কন্যার সংখ্যা কত ঠিক জানা যায় না। মহারাজ মাধবদেবের পৌত্রীকে বিবাহ করেছিলেন বলেও জানা যায়। কুমার বীরনারায়ণ ছিলেন পাটরাণীর গর্ভজাত সন্তান, তাই তিনিই রাজসিংহাসনের অধিকারী হন। তাঁর পুত্রদের মধ্যে ব্রজনারায়ণ, ভীমনারায়ণ এবং মহীনারায়ণ শক্তি ও সাহসের জন্য জনসমাজে পরিচিত ছিলেন। মহারাজের দিল্লী গমনকালে ব্রজনারায়ণ ও ভীমনারায়ণ রাজার সঙ্গে ছিলেন। পিতার জীবদ্দশাতেই এই দুই রাজকুমারের মৃত্যু হয়। ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দে মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যু হলে কুমার বীরনারায়ণ কামতারাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মহারাজ বীরনারায়ণ (১৬২৭-১৬৩২)

মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণের লোকান্তর প্রাপ্তির পরে কুমার বীরনারায়ণ কামতারাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৬২৭ খ্রিঃ)। মহারাজ বীরনারায়ণের এক ভগিনীর সঙ্গে আসামরাজের বিবাহ মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণের আমলেই ঠিক হয়েছিল। কুমার বীরনারায়ণের রাজত্বপ্রাপ্তির পর আসামরাজ সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে প্রচুর উপহারদ্রব্য সহ দূত পাঠান। কিন্তু বীরনারায়ণ এই বিবাহে সম্মতি দেন না। এই সুযোগে বিরূপাক্ষ কার্য্যী কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়াকে আসামরাজ এবং পৌত্রী হেমপ্রভাকে আসামের রাজপুত্রের সঙ্গে বিবাহ দেন। মোগল রাজকর্মচারীরাও অনেকে এই বিবাহে যোগ দেন এবং নানা উপহার যৌতুক ইত্যাদি দেন। বীরনারায়ণের রাজত্বকালে স্টিফেন ক্যামিলা ভূটান থেকে কামতারাজ্যে আসেন। বীরনারায়ণের বিদ্যোৎসাহিতা ছিল প্রশংসার্হ। তিনি রাজ্যের নানা স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাজা নিজে সেই বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করতেন। শিক্ষকদের যাবতীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্যের তত্ত্বাবধান করতেন। পিতৃপুরুষগণের মত বহুবিবাহ তিনিও করেছিলেন। কিন্তু তিনি অধিকাংশ সময়ই রাণীদের মহলে অতিবাহিত করতেন। রাজোপাখ্যান অনুযায়ী তাঁর রাজধানী আঠারকোটায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। কথিত আছে এক মণ্ডল তাঁকে একটি সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করে উপহার দিয়েছিলেন। সেই মণ্ডলাবাসে বসে তিনি অনেকটা সময় অতিবাহিত করতেন। কামান্ধ নৃপতি হিসাবে তাঁর অখ্যাতি ছিল। ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে রাজা বীরনারায়ণের লোকান্তরপ্রাপ্তি ঘটে।

মহারাজ প্রাণনারায়ণ (১৬৩২-১৬৬৫)

কুমার প্রাণনারায়ণ ১৬৩২ খ্রিঃ রাজপদে অভিষিক্ত হন। প্রথা অনুযায়ী অভিষেককালে রায়কত রাজার মাথায় রাজছত্র ধারণ করেন। এরপর মহারাজ প্রাণনারায়ণের নামে নতুন মুদ্রা ও ছাপ প্রস্তুত হয়। প্রাণনারায়ণের রাজত্বকাল খুব বেশি সমস্যা সঙ্কুল ছিল না। তবে এ ব্যাপারে উপাদানগুলির বক্তব্যে রকমফের আছে। রাজোপাখ্যান অনুযায়ী মহারাজ প্রাণনারায়ণের রাজত্বকালে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ কম ছিল এবং তাঁর রাজত্বের অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল।[২৪] কিন্তু আসাম বুরঞ্জী বা অন্যান্য স্থানীয় ইতিবৃত্ত থেকে জানা যায় তাঁর রাজত্বকালে জ্ঞাতিবিরোধ দানা বেঁধে উঠেছিল।[২৫] তবে একথাও অনস্বীকার্য যে গোলযোগ প্রবল হলে রাজোপাখ্যানেও তার বিবরণ থাকত। কিন্তু সমসাময়িক বাংলার সুবাদার সোলতান মোহাম্মদ সুজা তোডরমলের ভূমি রাজস্বসংক্রান্ত যে কাগজ সংশোধন করেন তার বিবরণ অনুযায়ী সরকার কোচবিহার (২৪৬ পরগণায় বিভক্ত) এবং দুই পরগণায় বিভক্ত সরকার 'বাঙ্গাল ভূম' (বাহারবন্দ এবং ভিতরবন্দ পরগণা) মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত বলে গণ্য হয়েছিল। মহারাজা প্রাণনারায়ণের সময়ে বাংলা তথা বহির্বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতিও ছিল ঘটনাবহুল। চিলারায়ের বংশধর পরীক্ষিৎ নারায়ণের পর তাঁর ভাই কুমার বলিনারায়ণ আসামরাজের সাহায্যে নিজ রাজ্য ফিরে পাওয়া চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। পরে (১৬৩৮ খ্রিঃ) তাঁর মৃত্যু হয়। পরীক্ষিতের পুত্র চন্দ্রনারায়ণ প্রথম দিকে বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করলেও কিছুকাল পরে আসামরাজের সঙ্গে মিলিত হয়ে পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। এই সময় অহোমরাজ মহারাজা প্রাণনারায়ণের কাছেও দূত পাঠান মোগল বিতাড়নের উদ্দেশ্য নিয়ে। তাঁর প্রস্তাব ছিল মোগলদের পরাস্ত করে সেই রাজ্যাংশ আসামরাজ ও কামতারাজের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার। কিন্তু মহারাজ প্রাণনারায়ণ এই প্রস্তাবে রাজি হননি। বলা বাহুল্য মোগল রাজকর্মচারী সত্রাজিৎ বাদশাহের বিরুদ্ধে নানা প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। সুবাদার ইসলাম খাঁ সমস্ত সংবাদ জানার পর বহুসংখ্যক সেনা ও বাদশাহী সেনা চন্দ্রনারায়ণ ও অহোমরাজের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। আসাম অভিযানে বাদশাহী সেনার সঙ্গে মহারাজ প্রাণনারায়ণও যোগ দিয়েছিলেন। ভরলী নদীর মোহনায় তিনি শিবির সংস্থাপিত করেন। কিন্তু যুদ্ধে বাদশাহী সেনার পরাজয় তাঁকে গৌহাটিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। পরে আসামরাজের কাছে দূত পাঠালে আসামরাজ সদর্থক উত্তর দেন না। একটি সাধারণ পত্রে তিনি উত্তর পাঠালে তা রাজদরবারে বিবেচনাযোগ্য বলে পরিগণিত হয় না। মধুপুর ধামের পূজারী বনমালী গোঁসাই-এর মধ্যস্থতার মিটমাটের চেষ্টাও ফলপ্রসূ হয় না। মানসিংহের মধ্যস্থতায় দিনাজপুর ও কামতাপুরের মধ্যে স্থাপিত মিত্রতা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কোচবিহার রাজ্যের সৈন্যরা মাঝে মাঝেই দিনাজপুর আক্রমণ করতেন এবং দিনাজপুররাজ শুকদেবের আত্মগোপন করে আত্মরক্ষা করা ছাড়া কোন পথ ছিল না। ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বাদশাহের অসুস্থতার সুযোগে ভারতব্যাপী অরাজকতার সৃষ্টি হয়। বাংলার তৎকালীন সুবাদার শাহজাদা সুজা সিংহাসন লাভের জন্য সসৈন্যে দিল্লী আক্রমণ করলেন কিন্তু পথেই তাঁর সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে। আত্মরক্ষার্থে তিনি আশ্রয় খুঁজতে থাকেন। এই রাষ্ট্রবিপ্লবের যুগে বাংলা প্রায় তিনবছর অরাজক ছিল। এই সময়ে মীর লুত্‌ফউল্লা মোগল অধিকৃত কামরূপের শাসনকর্তা হিসাবে কর দাবী করায় প্রাণনারায়ণ তাঁর দূতকে বিতাড়িত করেন ফৌজদারের অধীনতায় দুর্লভনারায়ণ কামরূপ বা কোচহাজোর শাসনকর্তা ছিলেন। প্রাণনারায়ণ তাঁকে আক্রমণ করলে তিনি পরাস্ত হয়ে আসামে আশ্রয় নেন। প্রতিশোধকল্পে ফৌজদারের পুত্র সসৈন্যে প্রেরিত হলে যুদ্ধ বাধে এবং মোগল সৈন্যের পরাজয় ঘটে, ফৌজদার স্বয়ং গৌহাটির দূর্গে আশ্রয় লাভ করেন। পরাজিত এবং আশ্রয়প্রার্থী দুর্লভনারায়ণকে আসামের রাজা বেলতলা নামক বিভাগের শাসনভার অর্পণ করেছিলেন। কোচবিহাররাজ দুর্লভনারায়ণকে প্রত্যর্পণের কথা বললেও আসামরাজ রাজি ছিলেন না। কোচ রাজমন্ত্রী ভবনাথ হাজো অধিকার করেন। এরপর ব্রহ্মপুত্রের উত্তর ও দক্ষিণ তীরভূমির উপর অধিকারের বিষয় নিয়ে আসাম ও কামতাপুরের মধ্যে আলোচনা চলে, কিন্তু আগে মোগলদের প্রতিপক্ষে আসামরাজের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রার প্রস্তাব

কামতারাজ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন বলে এই প্রস্তাবও ফলপ্রসূ হল না। এরপর (১৬৫৯ খ্রিঃ) অহোম সেনাপতি বড়ফুকনের প্রেরিত সৈন্যের সঙ্গে ভবনাথ কার্য্যীর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের প্রথমভাগে কামতাপুরের সৈন্যরা জয়ী হলেও শেষে তারা পরাস্ত হয়। সেই সময় পরীক্ষিৎ নারায়ণের পৌত্র, চন্দ্রনারায়ণের পুত্র জয়নারায়ণ বঙ্গদেশ থেকে কামরূপ প্রত্যাবর্তন করে আসামরাজের আশ্রয় গ্রহণ করলে আসামরাজ তাঁর সঙ্গে নিজের এক মেয়ের বিয়ে দিয়ে কামরূপের রাজত্ব তাঁকে দিয়ে ঘিলাবিজয়পুরে তার রাজধানী নির্দেশ করে দেন। পরে জয়নারায়ণ কামতাপুর ও আসামের রাজবংশের মধ্যে বিরোধ মেটাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি কৃতকার্য তো হতে পারেনই নি, উপরন্তু আসাম সেনাপতির কাছে অপমানিত হয়ে তিনি পালাতে বাধ্য হয়। ঘিলাবিজয়পুর আসাম সৈন্য কর্তৃক অধিকৃত হয়। ইতিমধ্যে কামতাপুর রাজসেনাদল ও নূতন বলে বলীয়ান হয়ে ফিরে আসে। ধুবরীতে আসাম ও কোচ সেনাদলের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে আসাম সেনাদলের জয় হয়। পরাজিত কামতাপুর সেনাদলের প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র এমনকি রণতরীও আসাম সেনাদলের হস্তগত হয়। কিন্তু মহারাজ প্রাণনারায়ণ নিরুৎসাহ ও হতোদ্যম না হয়ে নিজে সেনাদলের পুরোভাগে থেকে মোগল রাজশক্তির অন্যতম কেন্দ্র ঘোড়াঘাট আক্রমণ করেন এবং তৎকালীন বঙ্গের রাজধানী ঢাকা আক্রমণ করে অধিকার করেন। ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা প্রাণনারায়ণের মৃত্যু হয়।

মহারাজ মোদনারায়ণ (১৬৬৫-১৬৮০)

কুমার মোদনারায়ণ ১৬৬৫ খ্রিঃ পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। রাজা হিসাবে অভিষিক্ত হয়ে তিনি প্রথমেই আসামরাজের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার দিকে মন দেন। ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রেরিত দূতেরা আসামের রাজদরবারে সমাদৃত হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত প্রত্যাবর্তনের সময়ে মুঘল অধিকৃত অঞ্চলে গারোদের হাতে নিহত হন। পরে আবার দুজন দূতকে পাঠানো হয় এবং তাঁরাও আসামরাজ কর্তৃক সাদরে গৃহীত হন। যদিও এই সৌহার্দ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীশ্বরের সেনাপতি অম্বররাজ রামসিংহ আসাম জয়ের উদ্দেশ্যে কোচবিহারে এলে কোচবিহাররাজ ১৫ সহস্র ঢালী ও কাঁড়ী সৈন্য দেন। রাজকর্মচারী কবিকিশোর বড়ুয়া, মন্মথ বড়ুয়া এবং ঘনশ্যাম বখশী এই সৈন্যদলের পরিচালক ছিলেন। সিন্দুরী ঘোপা নামক স্থানে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। রাজ্যের আভ্যন্তরীণ গোলযোগও এই সময় ছিল পূর্ণমাত্রায়। তাঁর সময় রাজ্যের ছত্রনাজীর ছিলেন মহীনারায়ণ কিন্তু মহীনারায়ণ এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জগৎনারায়ণের ক্রমবর্ধমান উপদ্রব কামতাপুরের পক্ষে ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠতে থাকে। জগৎনারায়ণ রাজার আদেশে নিহত হন। মহীনারায়ণও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। মহীনারায়ণের অন্যান্য ছেলেরা ভূটানরাজের সাহায্য নিয়ে কামতাপুর আক্রমণ করেন। যদিও তারা জয়লাভ করতে পারে নি। শেষে মহীনারায়ণের পুত্র যজ্ঞনারায়ণকে ছত্রনাজীরের পদ দিয়ে পারিবারিক বিসম্বাদ কিছুটা মেটে। মহারাজ মোদনারায়ণ জল্পেশ্বর শিবের মন্দির নির্মাণকার্য সমাধা করেন। দেবতার সেবার্থে ৪৪টি জোত দেবোত্তর হিসাবে প্রদান করেন। তাঁর রাজত্বকালেও শিক্ষা ও সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা ছিল। অত্যন্ত সুনীতিপরায়ণ এই রাজা শুদ্ধশীল ও শান্ত চরিত্রের ছিলেন। ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। তাঁর কোনো পুত্রসন্তান না থাকায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসুদেবনারায়ণ রাজসিংহাসনে বসেন।

মহারাজ বসুদেবনারায়ণ (১৬৮০-১৬৮২)

মহারাজ মোদনারায়ণের পরলোকপ্রাপ্তির পর ছত্রনাজীর যজ্ঞনারায়ণ ভূটানের রাজার সাহায্যে সিংহাসন দখল করার চেষ্টা করেন। সেই সময় মন্ত্রীরা বৈকুণ্ঠপুরের রায়কত ভ্রাতৃদ্বয়ের সাহায্য প্রার্থনা করেন। রায়কত জগদেব

ও ভুজদেব কামতাপুরে এসে পৌঁছান। কিন্তু যজ্ঞনারায়ণ ভূটিয়াদের সাহায্যে রাজধানী লুঠপাট করেন, বেশ কিছু লোককে হত্যা করেন, কয়েকজনকে বন্দীও করেন। রাজপরিবারের অনেক সদস্যই প্রাণভয়ে অন্যত্র পালিয়ে যান। রায়কতদের আগমনের সংবাদ পেয়ে যজ্ঞনারায়ণ সসৈন্যে পালাতে থাকেন এবং পালানোর আগে মহারাজ বিশ্বসিংহের রাজছত্র, দণ্ড, সিংহাসন, ভগবতীপ্রদত্ত খঞ্জর প্রভৃতি পবিত্র পারিবারিক সম্পত্তি পর্বতের গুহায় ফেলে দেন। রায়কতদ্বয় নবনির্মিত ছত্র-সিংহাসনে নতুন রাজার অভিষেক করেন। রাজভ্রাতা বসুদেবনারায়ণ রাজপদে অভিষিক্ত হলেন। পূর্ব পারিবারিক প্রথা অনুসারে রায়কত তাঁর মস্তকে ছত্রধারণ করেন। রাজনামাঙ্কিত মুদ্রা ও সিংহছাপ মোহর প্রস্তুত হয়। কিন্তু গণ্ডগোল থামবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। রায়কত ভ্রাতৃদ্বয় বৈকুণ্ঠপুর ফিরে গেলেই, যজ্ঞনারায়ণ আবার অত্যাচার শুরু করেন। বারবার খণ্ডযুদ্ধে রাজা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়তে থাকেন। এমনই এক যুদ্ধে পরাজিত রাজা আত্মরক্ষার্থে যখন পালিয়ে যাচ্ছিলেন তখন ধরা পড়েন এবং নিহত হন। মহারাণী এবং বসুদেবনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র মহীন্দ্রনারায়ণ রাজচিহ্ন সহ আত্মগোপন করেন। কামতারাজের সেনাদল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। সৈন্যদল ও কর্মচারীরা নানাদিকে আত্মরক্ষার্থে পালাতে থাকে। এই অরাজতকার সুযোগে যজ্ঞনারায়ণ সিংহাসনে বসে নিজেকে রাজা ঘোষণা করেন। এইভাবে আটদিন কেটে যায়। রায়কত জগদেব এবং ভুজদেব যথাসময়ে রাজহত্যার সংবাদ পেয়ে সসৈন্যে মানসাই নদীর তীরে উপস্থিত হন। ছত্রভঙ্গ রাজসেনা ও মন্ত্রীরাও তাদের সঙ্গে মিলিত হন। মানসাই নদীর তীরে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। উভয়পক্ষেরই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। অবশেষে যজ্ঞনারায়ণ সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়ে পার্বত্য প্রদেশে পালিয়ে যান। যেহেতু মহারাজ বসুদেবনারায়ণ অপুত্রক অবস্থায় মারা যান তাই সেই রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে মহারাজ প্রাণনারায়ণের প্রপৌত্র কুমার মহীন্দ্রনারায়ণকে রায়কতদ্বয় নৃপতি নির্বাচন করেন এবং সিংহাসনে অভিষিক্ত করে অভিষেকের সময় রাজছত্র ধারণ করেন। নতুন রাজার নামে মুদ্রা প্রস্তুত হয়, ছাপমোহর প্রস্তুত হয়। এরপর রায়কতরা রাজাকে রক্ষার জন্য কিছু সৈন্য রাজধানীতে রেখে নিজ আবাসে ফিরে আসেন।

মহারাজা মহীন্দ্রনারায়ণ (১৬৮২-১৬৯৩)

কুমার মহীন্দ্রনারায়ণ তরুণ বয়সে কোচবিহার রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বকালে কোথাও শান্তিশৃঙ্খলা ছিল না। প্রাক্তন ছত্রনাজীর কুমার যজ্ঞনারায়ণ রাজশক্তির বিরোধিতা করছিলেন প্রাণপণে। এমনকি তিনি সৈন্য সংগ্রহ করে রাজাকে আক্রমণ করলেও জয়লাভ করতে পারেন নি। এছাড়াও আনুমানিক ১৬৮৫ খ্রিঃ বাংলার নায়েব সুবাদার ভবানী দাস কোচবিহার রাজ্য আক্রমণ করেন। বার বার যুদ্ধবিগ্রহে বিপর্যস্ত কামতাপুরে রাজকর্মচারীরাও তখন নানাভাবে রাজঅধীনতা থেকে বেরোতে চাইছিলেন। রাজ্যর দক্ষিণাঞ্চলের চাকলাগুলির ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীগণ রাজশক্তির বিরোধিতা করতে শুরু করেন। কেউ কেউ মোগল সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর বশ্যতা স্বীকার করে ঘোড়াঘাটের ফৌজদারের সেনাদলে যোগদান করেছিলেন। এরপর মহারাজ মহীন্দ্রনারায়ণ মন্ত্রীদের পরামর্শে রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য যজ্ঞনারায়ণকে আবার ছত্রনাজীরের পদ ফিরিয়ে দেন। এটি সম্ভবত তাঁর সবচেয়ে ভুল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। রায়কত ভ্রাতৃদ্বয় এই ব্যবস্থায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং কালক্রমে অসন্তোষ থেকে বিরোধ এবং ক্রমে তা প্রকাশ্য যুদ্ধের আকার ধারণ করে। মহারাজ মহীন্দ্রনারায়ণ এই রাজনৈতিক গোলযোগের মধ্যেই লোকান্তরিত হন। মহারাজ মহীন্দ্রনারায়ণ অতি বলিষ্ঠ আকৃতির এবং ধর্মাচরণে ছিলেন পরম বৈষ্ণব। হরি নাম গানে তাঁর যতটা ভক্তি ছিল ততটা আগ্রহ রাজ্যশাসনে ছিল না। তবুও তিনি নানাভাবে স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন। এই চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যেও রাজপৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হয়েছিল নানা কাব্য সাহিত্য। রাম কবিরাজ বা রাম সরস্বতী ছিলেন তাঁর অন্যতম সভাকবি। তিনি মহাভারত ভীষ্মপর্বের অনুবাদ করেছিলেন। মহীন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর গোলযোগ তীব্র আকার ধারণ করে। যজ্ঞনারায়ণের সঙ্গে রায়কতদের

বিরোধ আবার শুরু হয় পুরোমাত্রায়। যজ্ঞনারায়ণ নিজেকে পুনরায় রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন এবং মোগল বিরোধী পাঠান দলপতিদের সাহায্য তিনি এই সময় পেয়েছিলেন। কিন্তু রায়কতরা বারবার তাঁকে পরাস্ত করেন। এই সময় (আনুমানিক ১৭০০ খ্রিঃ থেকে ১৭০২ খ্রিঃ) রায়কতরাও যুদ্ধে নিহত হন। যজ্ঞনারায়ণেরও অনতিকাল পরেই লোকান্তর ঘটে। এরপর যজ্ঞনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রূপনারায়ণ সিংহাসনে বসেন। মহীনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র জগৎনারায়ণের তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র। নিদারুণ অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক গোলযোগের মধ্যে দিয়ে তিনি রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। কিন্তু এই বিবাদে সিংহাসন বিশ্বসিংহের বংশের অধিকারভুক্ত করার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব রূপনারায়ণের পিতৃব্য পুত্র শান্তনারায়ণের। রায়কতদের সঙ্গে শেষ যুদ্ধে শান্তনারায়ণ পূর্ণিয়ার ফৌজদারের সৈন্যশক্তির সঙ্গে মিলিতভাবে আক্রমণ করেন এবং জয়ী হন। রায়কত ভুজদেব এই যুদ্ধেই নিহত হন। শান্তনারায়ণের মত নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম ও রাজ আনুগত্য এই উপপ্লবের দিনে বিরল দৃষ্টান্ত।

মহারাজ রূপনারায়ণ (১৭০৪-১৭১৪)

১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে সর্বসম্মতিক্রমে কোচবিহারের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। নতুন রাজা কুমার শান্তনারায়ণকে ছত্রনাজীর নিযুক্ত করেন। কুমার সত্যনারায়ণকে দেওয়ান এবং কুমার কন্দর্প নারায়ণকে 'সুবার' কর্মে নিযুক্ত করেন। মহারাজ রূপনারায়ণের নামে মুদ্রা এবং ছাপমোহর নির্মাণ হলে ছত্রনাজীর প্রথা অনুযায়ী নতুন মুদ্রায় রাজাকে নজর প্রদান করেন। মহারাজ রূপনারায়ণ সসম্মানে পুরনো মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের নিজ পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এরপর সিংহাসনে প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই রঙ্গপুরে মোগল অধিকারভুক্ত অঞ্চলে ফৌজদারের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। বস্তুত পূর্বতন কামতাপুরের অধিকারসীমার যে সব অঞ্চ ল মোগলদের হস্তগত হয়েছিল তা পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা আর বিশেষ ছিল না। কারণ মোগলরা এ সময় কেবলমাত্র কিছু নজর বা উপঢৌকনে সন্তুষ্ট না থেকে অধিকৃত অঞ্চলগুলিকে কঠিনতর শাসনে বাঁধতে চাইছিলেন। তবুও ঘোড়াঘাট এবং রংপুর অঞ্চলে মহারাজা রূপনারায়ণ বারবার যুদ্ধ যাত্রা করেন। ফলে অঞ্চ লগুলি পুর্নবার লাভ করা না গেলেও উপদ্রুত অঞ্চলে মোগলরাও শাসনব্যবস্থা দৃঢ় রাখতে পারে না। যদিও একসময় বাদশাহী সৈন্যের হাতে বিদ্রোহী পাঠান সর্দার বা রাজার পক্ষভুক্ত সৈন্যদের পরাজয় ঘটতে থাকে। পরবর্তীকালে বেশ কিছু ভূমিভাগ রাজার হস্তচ্যুত হয় মোগলদের সঙ্গে সন্ধির ফলে। যদিও পরে রাজা আবার যুদ্ধ ঘোষণা করেন, কিন্তু তাঁর এই প্রয়াসও সদর্থক ফলপ্রসূ হয় না। ১৭১১ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধের পরাজয়ের পর নতুন করে সন্ধিপত্র লেখা হয়। এর কিছুকাল পরে (১৭১৪ খ্রিঃ) মহারাজা রূপনারায়ণের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। মহারাজ রূপনারায়ণের চার পুত্র ছিল। তাঁরা যথাক্রমে কুমার উপেন্দ্রনারায়ণ, খড়্গনারায়ণ, বিষ্ণুনারায়ণ এবং নরেন্দ্রনারায়ণ। এদের মধ্যে বিষ্ণুনারায়ণ এবং নরেন্দ্রনারায়ণ শৈশবেই মারা যান। মহারাজ রূপনারায়ণ জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার উপেন্দ্রনারায়ণকে যুবরাজের পদে অভিষিক্ত করেছিলেন, পিতার মৃত্যুর পর কুমার উপেন্দ্রনারায়ণ রাজা হন।

মহারাজ রূপনারায়ণ দয়ালু, প্রজ্ঞাবান এবং ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রাজধানী স্থানান্তরিত করে, বর্তমান কোচবিহার শহরে তৎকালীন গুড়িয়াহাটি গ্রামে স্থানান্তরিত করেন। রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার সাথে সাথে বেশ কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্যরাও নতুন জনপদে এসে বাস করতে থাকেন। মহারাজ রূপনারায়ণ তাঁর জীবদ্দশায় অধিকাংশ সময় যুদ্ধ বিগ্রহে কাটিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু শাস্ত্র চর্চাতেও তাঁর আগ্রহ ছিল। তবে ছত্রনাজীর শান্তনারায়ণের কথা না বললে মহারাজ রূপনারায়ণের রাজত্বকালের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। নির্ভীক বীর, স্বাধীনচেতা শান্তনারায়ণের ভ্রাতৃপ্রেম এবং নির্লোভ চরিত্র আজও কোচবিহারের ইতিহাসে সাদরে উল্লেখ্য। বস্তুত রূপনারায়ণ এবং শান্তনারায়ণকে ঘিরে মানুষ আবার বিশ্বসিংহ ও চিলারায়কে ফিরে পেতে চেষ্টা করেন। রূপনারায়ণের রাজত্বকাল নানা কারণে স্মরণীয়। প্রথমত, আভ্যন্তরীণ গোলযোগ এই সময় চূড়ান্ত মাত্রায় ছিল,

আর এর বিনাশকারী প্রবণতা ছিল অনেক বেশি। এছাড়া রাজকর্মচারীদের বিবেকহীনতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা রাজ্যের সর্বনাশকে ত্বরান্বিত করেছিল। সর্বোপরি ক্রমক্ষীয়মান মোগল সাম্রাজ্যের টিকে থাকার চেষ্টায় দেশীয় রাজ্যের উপর আক্রমণের নীতির কারণে এই সময়টি খুবই স্পর্শকাতর এবং সংকটপূর্ণ। মহারাজ রূপনারায়ণ এবং ছত্রনাজীর শান্তনারায়ণের যুগপৎ আবির্ভাব কোচবিহার রাজ্যকে মহাসংকট থেকে উদ্ধার করেছিল। বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর দরবারে মহারাজা রূপনারায়ণ রাজদূত পাঠিয়েছিলেন। কোচবিহারের ইতিহাসে মহারাজা রূপনারায়ণ ও ছত্রনাজীর শান্তনারায়ণ অনন্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত।

মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণ (১৭১৪-১৭৬৩)

কুমার উপেন্দ্রনারায়ণ পিতৃরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন ১৭১৪ খ্রিস্টাব্দে। ছত্রনাজীর এবং দেওয়ান দুজনে মিলে তাকে রাজা করেন। প্রথা অনুযায়ী ছত্রনাজীর রাজার মাথায় রাজছত্র ধারণ করেন। নতুন রাজার নামে মুদ্রা এবং ছাপমোহর প্রস্তুত হয়। তিনি রাজকার্য পূর্ববৎ পরিচালনার আদেশ দেন।

মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে ভূটানের আদিবাসীরা তাদের পার্বত্য প্রদেশ ছেড়ে সমতলে কোচবিহার রাজ্যের সীমার মধ্যে লুটপাট করতে থাকে। এভাবে রাজ্যের উত্তরাঞ্চল সর্বদা উপদ্রুত থাকত। রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ এবং নাজীর ভূটিয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা শুরু করেন। কিন্তু তাদের পুরোপুরি পরাস্ত করা সম্ভব হয়নি। মহারাজা উপেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সদ্ভাব ছিল। কিন্তু বাংলার পরবর্তী নবাব সুজাউদ্দীনের আমলে তার ব্যতিক্রম ঘটে। কিন্তু এরই মধ্যে পারিবারিক বিপর্যয় ঘটে অন্যভাবে। মহারাজা উপেন্দ্রনারায়ণ অপুত্রক ছিলেন বলে দেওয়ান সত্যনারায়ণের পুত্র দীননারায়ণকে দত্তক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং রাজ্য শাসনের বেশ কিছু কাজ তাকে দিয়েই করাতেন। দীননারায়ণ তাতে তৃপ্ত না হয়ে রাজার থেকে লিখিত প্রতিশ্রুতি আদায় করতে চেষ্টা করতে থাকেন, যাতে তাঁকেই পরবর্তী শাসক হিসেবে মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হয় না। কথিত আছে যে এক সন্ন্যাসী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন রাজা প্রৌঢ় বয়সে পুত্র লাভ করবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণীতে আশান্বিত মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণ ভবিষ্যতের কথা ভেবে দীননারায়ণকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করলেও ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী হিসেবে চিহ্নিত করেন নি। কিন্তু দীননারায়ণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাড়তেই থাকে এবং এক সময় দীননারায়ণ রংপুরের ফৌজদার সৈয়দ আহমেদের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং কোচবিহারের রাজসিংহাসনে বলপূর্বক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। শান্তনারায়ণ তখন প্রৌঢ়ত্বের শেষভাগে। ফলে তাঁর পরাজয় ঘটে। পরাজয় ঘটে রাজার পক্ষের সৈন্যদের। পশ্চাদপসরণ করেন দেওয়ান সত্যনারায়ণ (দীননারায়ণের পিতা) এবং খাসনবীশ মহাদেব রায়। অতঃপর মোগল সৈন্যকোচবিহার অধিকার করেন এবং দীননারায়ণ রাজপদে অভিষিক্ত হন (১৭৩৬ খ্রিঃ)। কিন্তু মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণ হতোদ্যম হন নি। তিনি নতুন করে সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করতে থাকেন। ভূটানের দেবরাজের সঙ্গেও তাঁর সন্ধিস্থাপন হল। দেবরাজ রাজাকে যথাসাধ্য সাহায্যে প্রতিশ্রুত হলেন। যথাসময়ে নাজিরের কাছে সংবাদ প্রেরিত হলে নাজিরও সৈন্য সংগ্রহে নামলেন। বিক্ষিপ্ত সেনাদল বহুযত্নে সঙঘবদ্ধ হল। ক্রমে সংগ্রাম আরম্ভ হল। যথাক্রমে পূর্ব, পশ্চিম এবং উত্তর দিক থেকে একযোগে ফৌজদারকে আক্রমণ করা হল। বহুসংখ্যক মোগল সৈন্য মারা যায়। ফৌজদার পরাজিত হয়ে রংপুর অভিমুখে পালিয়ে যান। এই ঘটনা ১৭৩৭ সালের। এরপর প্রবাসেই তাঁর মৃত্যু হয়। গৌরীপ্রসাদ বখশীর কর্মকুশলতায় প্রীত রাজা এরপর গৌরীনন্দন মুস্তোফীর জায়গায় গৌরীপ্রসাদকে খাসনবীশের পদ প্রদান করেন এবং পদউপযোগী খেলাত নাকরা, নিশান প্রদান করে তাকে সম্মানিত করেন। দীননারায়ণকে পিতা সত্যনারায়ণ সাহায্য করেছেন এই সন্দেহে সত্যনারায়ণ এবং তার অন্যান্য পুত্রদের রাজকার্য থেকে অপসারণ করা হয়। বৃদ্ধ বয়সে পদচ্যুত দেওয়ান সত্যনারায়ণ বন্দিভাবে ছত্রনাজীরের তত্ত্বাবধানে সেওড়াগুড়ি নামক স্থানে বসবাস করতে থাকেন।

এই যুদ্ধের ফলে মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের রাজ্যে ভুটিয়ারা মূর্তিমান উপদ্রবে পরিণত হয়। যুদ্ধজয়ে ভুটানের রাজার অবদান থাকায় ভুটিয়ারা কোচরাজ্যে উপদ্রব করাটা নিজেদের অধিকার বলে মনে করতেন। ফৌজদারের ভয়ে রাজাও তাদের বিরুদ্ধে যেতে ইতস্তত করতেন কিন্তু তবুও যুদ্ধ পরবর্তীকালে মহারাজ তাঁর শাসনক্ষমতায় কোচরাজ্যের শান্তি বজায় রেখেছিলেন। রাজা তাঁর রাজত্বকালে শস্ত্রের পাশাপাশি শাস্ত্রের চর্চাও করেছিলেন। তার রাজত্বকালে কামতানগরের অধিবাসী শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ মহাভারতের পদ রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত মহাভারত বিরাটপর্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। রাজভ্রাতা খড়্গনারায়ণের আদেশ ও পৃষ্ঠপোষকতায় নারায়ণ দ্বিজ নারদীয় পুরাণের অনুবাদ করেন। মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের সময় রাজ্যে ঢালা জব্দ বা রাজ্যব্যাপী জরিপ করানো হয়েছিল।

মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের দুই মহিষী ছিলেন। বড়রাণী 'বড় আইদেবতী' নামে অভিহিতা হতেন, তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালিনী নারী। রাজকর্মচারী ও প্রজাদের উপর তাঁর অপরিসীম প্রভাব ছিল। লালবাঈ নামে এক নর্তকীর সঙ্গে মহারাজ 'ধলিয়াবাড়ী' অঞ্চলে বসবাস করতেন। এই প্রসঙ্গে জানাজানি হতে তিনি রাজঅন্তঃপুরে মহারাজের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করতেন। প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে কনিষ্ঠা মহিষীর গর্ভে তার একটি পুত্র জন্মায়, তাঁর নাম রাখা হয় কুমার দেবেন্দ্রনারায়ণ। ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে ধলিয়াবাড়ীর অস্থায়ী রাজপ্রাসাদে তাঁর মৃত্যু হয়। 'বড় আইদেবতী' মহারাণী সেই সংবাদ জেনে কয়েকজন বিশ্বস্ত রাজকর্মচারী সহ সেখানে আসেন। ছত্রনাজীর ললিতনারায়ণ পরামর্শ করে শিশু রাজকুমার দেবেন্দ্রনারায়ণকে কোচবিহার রাজপ্রাসাদে আনেন। সেখানে তাঁর অভিষেক ক্রিয়া যথারীতি সুসম্পন্ন হয়। ১৭৬৩ খ্রিঃ ছত্রনাজীরের কোলে বসে রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণের অভিষেক ক্রিয়া হয়। নতুন রাজার নামে মৃত রাজার অন্তিম সৎকারের আদেশপত্র প্রস্তুত হয়। জ্যেষ্ঠা মহিষী 'বড় আইদেবতী' মৃত স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হন। মহারাণীর পরামর্শ অনুসারে গৌরীনন্দন মুস্তোফী, গৌরীপ্রসাদ বখশী, হরেশ্বর কার্য্যী বালক মহারাজের পক্ষে রাজকার্য পরিচালনা করতে থাকেন।

মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণ (১৭৬৩-৬৫)

বালক রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ মাত্র দু'বছর রাজত্ব করেছিলেন। মূলত রাজামাতা মহারাণীর আদেশানুসারে ছত্রনাজীর ও অন্যান্য বিশ্বস্ত রাজকর্মচারীরা রাজকার্য পরিচালনা করতেন। প্রথমতঃ এই সময় ভুটিয়াদের উপদ্রব অত্যন্ত বেড়েছিল। দ্বিতীয়তঃ বালক রাজার রাজ্যলাভের মাত্র আটমাস পরে বিশ্বস্ত নাজীর অভয়নারায়ণের মৃত্যু হয়। কিছুকাল পরে দেওয়ান খড়্গনারায়ণের মৃত্যু ঘটে এবং তাঁর পুত্র রামনারায়ণ পিতার পদাভিষিক্ত হন। ১৭৬৫ খ্রিঃ ১২ই আগস্ট দিল্লীশ্বর শাহ আমলের ফরমান অনুসারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজত্ব আদায়ের জন্য আদিষ্ট হন। এই ফরমান অনুসারে মোগল অধিকারে অবস্থিত বোদা, পাটগ্রাম এবং পূর্বভাগ চাকলার রাজস্ব কোম্পানির হাতে যেতে থাকে। এরপর শিশুরাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ দীর্ঘকাল বাঁচেন নি। রাজগুরু রামানন্দ গোস্বামী রাজাকে হত্যা করে নাজীরকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করতে চান। ফলে তিনি নানা যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকলাপ করতে থাকেন। কিন্তু এ সংবাদ রাষ্ট্র হয়ে গেলে রাজমাতা মহারাণী তাঁকে বহিষ্কার করেন। অপমানের জ্বালা রামনন্দকে জ্ঞানশূন্য করে ফেলে। রামানন্দের একদা ঘনিষ্ঠ অনুচর রতি শর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ রাজহত্যার দায়িত্ব নেয়। একদিন রাজপুত্র যখন খেলায় মগ্ন, ধূর্ত ব্রাহ্মণ তার কাছে এসে জল চায়। রাজার অনুচরদের একজন জল আনতে গেলে অন্যদের সাময়িক অন্যমনস্কতার সুযোগে রতি শর্মা রাজাকে হত্যা করে। নৃশংসতার এখানেই শেষ নয়। রাজার ছিন্নমুণ্ড নিয়ে রতি শর্মা রাজমন্দিরের চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে ধ্যানস্থ হয়। হতবুদ্ধি রাজঅনুচররা সম্বিত ফিরে পেয়ে রাজ হত্যাকরীকে খণ্ড বিখণ্ড করে। কিন্তু এরপর কামতাপুর রাজবংশ উত্তরাধিকারী সমস্যায় পড়ে। নাজীর এবং দেওয়ান উভয়েই রাজবংশজ। ফলে উভয় পরিবারের মধ্যে বিবাদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল। অবশেষে

গৌরীনন্দন, মুস্তোফী গৌরীপ্রসাদ বখশী প্রভৃতি মন্ত্রীরা পরামর্শ করে দুই যুযুধান পক্ষকে নিরস্ত্র করেন। অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে দেওয়ান খড়্গনারায়ণের তৃতীয় পুত্র কুমার ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণকে পরবর্তী রাজা মনোনীত করা হল। মৃত মহারাজের মা, মহারাণীও ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের নাম প্রস্তাব করেছিলেন। ফলে ১৭৬৫ খ্রিঃ মহারাজ ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ সর্বসম্মতিক্রমে রাজা নির্বাচিত হয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মহারাজ ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ (১৭৬৫-১৭৭০)

১৭৬৫ খ্রিঃ সর্বসম্মতিক্রমে কুমার ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ রাজা হলেন। ছত্রনাজীর রুদ্রনারায়ণ রীতি অনুযায়ী রাজছত্র ধারণ করেন। রাজনামাঙ্কিত মুদ্রা প্রস্তুত হয়, এবং নতুন মুদ্রায় দেওয়ান, নাজীর প্রমুখ উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা নজর প্রদান করেন। গৌরীনন্দন মুস্তোফী খাসনবীশের উচ্চপদে আসীন হন। রাজকার্য আবার আগের গতিতে চলতে থাকে।

এদিকে ভূটান রাজার কাছে সংবাদ পৌঁছলে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং যথোচিত তদন্তের নির্দেশ দেন। অনুসন্ধানে জানা যায় রাজার হত্যাকারী রাজগুরুর স্বগ্রামবাসী। এমনকি হত্যার অস্ত্রটিও রাজগুরুর রামানন্দ গোস্বামীর। এইসব অকাট্য প্রমাণের জেরে রামানন্দ বন্দী হন, এবং তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। পুনাখা ছিল তৎকালীন ভূটানের রাজধানী। পুনাখাতেই তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। এরপর রামানন্দের পিতৃব্যপুত্র সর্বানন্দ গোস্বামী রাজাকে মন্ত্রদীক্ষা দেন এবং রাজগুরু রূপে পূজিত হন।

ভূটানের ক্রমবর্ধমান উপদ্রব এ রাজ্যের কাছে চিরায়ত প্রশ্নচিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই সময়ও তার ব্যতিক্রম নয়। সুযোগ পেলেই ভূটানের অধিপতি পাহাড় সংলগ্ন সমতলভূমি অংশে আধিপত্যের চেষ্টা করতে থাকেন। কালক্রমে দেখা গেল অনেক নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়েই তাঁদের মতামতও জড়িয়ে পড়ছে। সীমা উল্লঙ্ঘনপূর্বক কোচরাজ্যের নানা স্থানে ভূটানরাজ আক্রমণ করতে গেলে বৈকুণ্ঠপুরের রায়কতরাও তাদের সঙ্গে যোগ দেন। ক্রমে জল্পেশ, মন্দাস প্রভৃতি অঞ্চল ভূটানের অধিকারভুক্ত হয়ে পড়ে। ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে কামতেশ্বরী দেবীর সঙ্গে মহারাজের বিবাহ হয়, এবং একইসঙ্গে রাজা আরও পাঁচজন উচ্চবংশজাত কন্যাকে বিবাহ করেন। কালক্রমে ছত্রনাজীর রুদ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর নাজীরের ভ্রাতুষ্পুত্র কুমার খগেন্দ্রনারায়ণকে রাজা ছত্রনাজীরের পদ প্রদান করেন। তবে রাজকার্য্য বিষয়েও রাজা ক্রমে কোণঠাসা হয়ে পড়ছিলেন। দেওয়ান রামনারায়ণের উত্তরোত্তর ক্ষমতা বৃদ্ধি রাজাকে আশঙ্কিত করেছিল। এমনকি রাজার সম্পূর্ণ অমতে রাজভগিনীর সঙ্গে তিনি নিজের পছন্দ করা পাত্রের বিবাহ দিয়েছেন এ নজিরও আছে। ভূটিয়া সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিজয়পুরের বিরুদ্ধে তাঁরা যুদ্ধযাত্রা করেন। এই যুদ্ধে যে ধনরত্নাদি লাভ হয় তার প্রায় সবই তিনি ব্যক্তিগত ভাবে রেখে দেন। খুব কম অর্থই রাজকোষাগারে জমা পড়ে। এভাবেই ধীরে ধীরে রাজা ও দেওয়ান রামনারায়ণের মধ্যে বিরোধের প্রাচীর গড়ে উঠতে শুরু করে। অবশেষে রাজা প্রতিশোধার্থ দেওয়ানকে পদচ্যুত করে তাঁর ভাইকে দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু রামনারায়ণ ভূটানরাজের সাহায্যে আবার পূর্বপদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই অপমানও রাজাকে সহ্য করতে হয়। অবশেষে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য রাজা অন্যদের প্ররোচনায় দেওয়ানকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। রাজা এরপর নিজের অসুস্থতার সংবাদ প্রচার করেন। দেওয়ান প্রতারিত হন। রাজাকে অসুস্থ ভেবে তাঁর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত করতে এসে তিনি রাজার হাতে নিহত হন। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে রাজা তাঁরই সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। দেওয়ানের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবরে ভূটানরাজ ক্ষিপ্ত হন। কারণ রামনারায়ণ ভূটান রাজবংশের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন ছিলেন। ভূটানের রাজা এরপর কোচ রাজ্যের শাসনযন্ত্রের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় মহারাজ ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ এবং দেওয়ান বধের অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের কৌশলে বন্দী করে ভূটানের পুনাখায় নিয়ে আসে। তাদের কৌশলে রাজসৈন্যরাও বিভ্রান্ত হয়ে যায়। এরপর উপায়ান্তর না দেখে সেনারা রাজধানীতে ফিরে

আসে। ভূটিয়ারা এরপর নিজেদের উদ্যোগে কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণকে রাজা করেন এবং সেনানায়ক পেনশু তোমা কিছু সৈন্যসহ কোচরাজ্যে অবস্থান করতে থাকেন। রাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের আমলে সারা বাংলাব্যাপী এক দুর্ভিক্ষ দেখা যায়, এই মন্বন্তর ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে বিখ্যাত বা কুখ্যাত। কিন্তু কোচবিহারের সমকালীন রাজকীয় নথিপত্রে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও কোচবিহারের রাজাদের প্রতিকারার্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে কি কোচবিহারে এত বেশি উদ্বৃত ফসল ছিল যার ফলে দুর্ভিক্ষের থাবা মানুষকে গ্রাস করতে পারেনি? তা মনে হয় না। কারণ এই সময় কোচবিহারের দক্ষিণ সীমাস্থিত কুরশা নামক স্থানে আরমানী এবং ফরাসী বণিকেরা শস্য সংগ্রহের আড়ত বানিয়েছিল।[২৬] দুর্ভিক্ষের সময়ও ফসলের আমদানী যাতে যথাযথ থাকে সে দিকে দৃষ্টি রাখতে অনুরোধ করে রঙ্গপুরের তৎকালীন সুপারভাইজার মি গ্রস রাজার কাছে আবেদন জানান।[২৭] ফলে প্রচুর ফসল ফলেছিল—এমনটা মনে হয় না। বরং ফসলের জন্য ব্যগ্রতাই এখানে চোখে পড়ে। ১১৭৬ সনেই (১৭৬৯ খ্রিঃ) কোচবিহারে রাজ্যব্যাপী জরিপ হয় এবং কোম্পানীর রাজ্য ও কোচবিহার রাজ্যের মধ্যবর্তী সীমা নির্ধারিত হয়।[২৮]

মহারাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ (১৭৭০-১৭৭২)

মহারাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ ভূটানের অধিপতির সক্রিয় সহযোগিতায় রাজা হয়েছিলেন। সম্ভবত রাজার অভিষেক ক্রিয়া রাজবংশের নিয়মানুযায়ী হয়নি। পূর্ববর্তী রাজার মন্ত্রীরা কেউই এই রাজ অভিষেকে অংশ নিতে চাইলেন না। ফলে ছত্রনাজীরের রাজছত্র ধারণের রাজঅভিষেক ক্রিয়াও হল না। রাজা মৃত দেওয়ান রামনারায়ণের পুত্র কুমার বীজেন্দ্রনারায়ণকে দেওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত করেন। কিন্তু কার্যত ভূটিয়া প্রতিনিধি সেনানায়ক পেনশু তোমাই রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়ে পড়েন। রাজকর্মচারীরা প্রায় সকলেই তাঁর আজ্ঞাবহ হয়ে পড়ে। এভাবে ভূটীয়া প্রতিপত্তি বাড়তে থাকলে নাজীরের পক্ষে কোন কাজ চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। বাড়তে থাকে নাজীর ও পেনশুর দূরত্ব। এমনকি রাজপরিবারের রাজচিহ্ন সূচক যে দ্রব্যগুলি মদনমোহন মন্দিরে রাখা থাকত সেখানেও পেনশুর কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়, রাজা ও রাজপরিবারের ব্যয় নির্বাহ করাও কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় দুই বছর কাটাবার পর মহারাজ রাজেন্দ্রনারায়ণের বিবাহের অনুষ্ঠান হয়। নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণ বিবাহে যোগদান করেন। ভূটানরাজের তরফ থেকেও উপঢৌকন আসে। বিবাহের পাঁচদিন পরে মহারাজ জ্বরাক্রান্ত হন, এবং ঠিক সাত দিনের মাথায় তাঁর মৃত্যু ঘটে। রাজেন্দ্রনারায়ণ আজও কোচবিহারের লোকমুখে 'লখাই রাজা' নামে পরিচিত।

মহারাজ রাজেন্দ্রনারায়ণের অকালমৃত্যুর পর রাজ্যের উত্তরাধিকারী সংক্রান্ত বিবাদ শুরু হয়। সেই সময় পূর্ববর্তী মহারাজ ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের মহিষী কামতেশ্বরী দেবীর অনুজ্ঞা অনুসারে সর্বসম্মতিক্রমে ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ ও কামতেশ্বরী দেবীর পুত্র কুমার ধরেন্দ্রনারায়ণকে রাজা বলে স্বীকার করা হয়। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর আনুষ্ঠানিক রাজ্যাভিষেক হয়।

মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণ (১৭৭২-১৭৭৫)

রাজসিংহাসনে অভিষেককালে যেহেতু কুমার ধরেন্দ্রনারায়ণ প্রাপ্তবয়স্ক হননি, তাই ছত্রনাজীর খগেন্দ্রনারায়ণ তাঁকে কোলে করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। যথাবিধি নাজীর কর্তৃক ছত্রধারণ হয় এবং নতুন রাজার নামে মুদ্রা ও ছাপমোহর প্রস্তুত করা হয়। রাজার আদেশে পূর্ববর্তী গতপ্রাণ রাজার অন্তিম সৎকার করা হয়। বয়স কম থাকার জন্য এবং রাজ্যের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য রাজা ধরেন্দ্র নারায়ণ সর্বজনমান্য রাজা ছিলেন না। তাঁর সিংহাসনে আরোহণের ফলে অবশ্য রাজ্য ভূটানরাজের কবলে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়। মহারাণী

কামতেশ্বরী দেবী, খাসনবীশ কাশীনাথ লাহিড়ী এবং রাজগুরু সর্বানন্দ গোস্বামীর সঙ্গে আলোচনা করে সুষ্ঠুভাবে রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। ইতিমধ্যে ক্রমশ আত্মস্থ হতে থাকা কোচবিহার রাজপরিবার মাথা তুলে দাঁড়াতে থাকে। এরপর নাজীর ভূটানরাজের প্রভাবশালী প্রতিনিধি পেনশু তোমাকে বিতাড়িত করেন। ফলে ভূটানরাজার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। তিনি বহুসংখ্যক ভূটীয়া সৈন্য কোচবিহার আক্রমণের জন্য প্রস্তুত করেন। প্রথম পর্যায়ের যুদ্ধে ভূটানের সেনাদল পরাস্ত হয়। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে আবার প্রচুর সংখ্যক সৈন্য নিয়ে ভূটানের সেনাপতি আক্রমণ করেন, এবং এবার কোচবিহারের সেনাদল সম্পূর্ণ হেরে যায়। যুদ্ধের শুরুতে রাজা ও তাঁর পরিবারবর্গকে ছত্রনাজীর বলরামপুরের নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে আসেন। পরবর্তীকালে নিরাপত্তার খাতিরে তাঁদের সপরিবারের পাঙ্গায় পাঠানো হয়। ভূটিয়া সৈন্যরা জয়লাভের পর নিহত দেওয়ান রামনারায়ণের পুত্র বীরেন্দ্র নারায়ণকে কোচবিহারের রাজসিংহাসনে বসায়, এবং রাজার নিরাপত্তার খাতিরে তাঁকে চেকাখাতায় অবস্থান করতে অনুরোধ করেন। চেকাখাতায় রাজা বীরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হয় আকস্মিক ভাবে অসুস্থ হয়ে, কিন্তু তাতে ভূটানরাজের সেনাবাহিনীর দৌরাত্ম কিছুমাত্র কমে না। রায়কত দর্পদেব এবং ভূটান সেনাপতির মিলিত বাহিনীকে বাধা দিতে এরপর সর্বানন্দ গোস্বামী ও কাশীনাথ লাহিড়ী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দ্বারস্থ হন। ফলে কার্যত কোচবিহাররাজ্য মুঘল শাসন, ভূটীয়া শাসনের পরে এবার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনাধীন হয়ে পড়ল। এবারের বিবাদে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ নেন, এবং আধুনিক সমরাস্ত্রের ব্যবহার ভূটীয়াদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর কোচবিহার দুর্গ কোম্পানীর হস্তগত হয়, ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী নাজীর বালক রাজাকে সঙ্গে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে আসেন। ভূটিয়া সেনারা অবশ্য বিনা বাক্যব্যয়ে চলে যাওয়ার পক্ষপাতী ছিল না। তারা বক্সার পাহাড়ী অঞ্চলে আত্মগোপন করে থেকে ইংরেজ সৈন্যের উপর চোরা আক্রমণ চালাতে থাকে। অতঃপর ইংরেজরা নিঃশব্দে আত্মগোপন করে পাহাড় থেমে সমতলে নেমে আসেন। এরপর ইংরেজ সেনানায়ক পার্লিং ভূটানরাজের কাছে বন্দী কোচবিহাররাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণকে প্রত্যর্পণ করার আদেশ পাঠান। অন্যথায় ইংরাজপক্ষ ভূটান আক্রমণ করবে এমনটাই বলা হল। ভূটান রাজের কাছ থেকে সন্ধির প্রস্তাব বহন করে দূতও এল, কিন্তু হঠাৎই ভূটান সেনাপতি প্রায় চার হাজার সৈন্য নিয়ে মুষ্টিমেয় ইংরেজ সৈন্যকে আক্রমণ করলেন। অসম যুদ্ধে ইংরেজরা পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু পরে আবার রসদ জুটিয়ে ইংরেজ বাহিনী হানা দেয় আর ভূটীয়াদের হটিয়ে চেকাখাতা দখল করে। ভূটান সেনাপতি 'বহা দেবযধুর' এরপর কোচবিহার থেকে বিতাড়িত হন, এমনকি স্বদেশেও তাঁর লাঞ্ছনা হয়। নতুন রাজা তাঁকে পদচ্যুত ঘোষণা করেন। নবনির্বাচিত রাজা বা 'দেবরাজ' তিববতের তিশু লামার প্রভাবাধীন ছিলেন। রাজা সন্ধি স্থাপনের জন্য গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের কাছে দূত পাঠান। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল তারিখের দেবরাজের সঙ্গে কোম্পানীর সন্ধি স্থাপিত হয়। এরপর ভূটানের রাজা কোজরাজকে প্রচুর উপঢৌকন সহ রাজকীয় মর্যাদায় ফিরিয়ে দেন। যে চেকাখাতা থেকে রাজা বন্দী হয়েছিলেন, সেখানেই তাঁর রাজসভার প্রধান রাজপুরুষেরা প্রত্যুদগমন করতে এসে পৌঁছান। কিন্তু কোম্পানীর কাছে স্বাধীনতা বিকিয়ে ফেলার সংবাদ ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণকে এতটাই মর্মাহত করেছিল যে, মুক্তির আনন্দ তাঁকে ছুঁতে পারে নি। তিনি সবার সঙ্গে দেখা হলে প্রথমেই রাজ্য কোম্পানীর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য অনুযোগ করেন। রাজ্যে ফিরেও তিনি সিংহাসনে বসতে চাইলেন না। মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণ পূর্ববৎ রাজত্ব করতে থাকেন, এবং ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ নির্জনে ধর্মালোচনায় কাল কাটাতে থাকেন। এভাবে বেশ কিছুদিন চলার পর ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ সাত আটজন মাত্র সঙ্গী সহ তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়েন। গঙ্গাতীরে পিতৃপুরুষের পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন হলে সেখান থেকে তিনি গয়ায় আসেন। গয়াতীর্থে পিতৃপুরুষের তর্পণাদি সম্পন্ন করে তিনি কাশীতে পৌঁছান। কাশীতে নানা দানকার্য্য শেষ হলে তিনি প্রয়াগে আসেন, এবং প্রয়াগ থেকে স্বদেশে ফিরে আসেন। এই তীর্থযাত্রা তাঁর উৎপীড়িত অন্তঃকরণকে কিছুটা শান্তি দিয়েছিল। তাঁর তীর্থভ্রমণ সেরে ফেরবার এক

মাসের মধ্যেই মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণ জ্বরাক্রান্ত হয়ে মারা যান। স্বভাবতই রাজা আবার ভেঙে পড়েন। উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যুতে মহারাণী কামতেশ্বরী দেবীও মর্মান্তিক আঘাত পান। অবশেষে প্রধান রাজপুরুষদের একান্ত অনুরোধে ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ আবার সিংহাসনে বসেন।

মহারাজ ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ (১৭৭৫-১৭৮৩)

মহারাজ ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ দ্বিতীয়বার (১৭৭৫ খ্রিঃ) রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাঁর মন সাংসারিক সমস্ত ব্যাপারে বীতস্পৃহ হয়েছিল। ফলত রাজকার্য মহারাণীই চালাতে থাকেন। এমনও কথা কোথাও কোথাও পাওয়া যায় যে রাজার কাছে কদাচিৎ কোনও বিষয় বিবেচনার জন্য গেলে তখনি তিনি তা মহারাণীর কাছে পাঠিয়ে দিতেন। রাজগুরু সর্বানন্দ গোস্বামী বকলমে মুখ্য পরামর্শদাতার ভূমিকায় অনড় ছিলেন। এমনিতেই নানা বিশৃঙ্খলা মাথাচাড়া দিয়েছিল। রাজা ধরেন্দ্রনারায়ণ বা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের আমলে এমনকি দেওয়ানরাও রাজস্ব ফাঁকি দিতেন প্রচণ্ডভাবে। বিশেষত মহারাজ পুত্রহীন হয়ে পড়ায় সকলেই ভবিষ্যৎ নিয়ে একাধারে উৎকণ্ঠিত এবং স্বার্থান্বেষণে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে রাজগুরু তাঁকে পোষ্যপুত্র গ্রহণের পরামর্শও দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে রাজার এক পুত্রসন্তান জন্মায়, এবং তার নাম রাখা হয় হরেন্দ্রনারায়ণ। ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মহারাজ ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে তিনি বালক হরেন্দ্রনারায়ণকে পরবর্তী রাজারূপে ঘোষণা করে একখানি উইল করে যান। সেখানে বালক রাজার অভিভাবক স্থানীয়া হিসেবে বিমাতা কামতেশ্বরী দেবী রাজ্য পরিচালনা করবেন এমন নির্দেশ দেওয়া ছিল। যদিও পরবর্তীকালে কোচবিহার ইংরাজ শাসকের প্রতিনিধি কর্ণেল হটন বা মেজর জেনকিন্স প্রমুখরা এই উইলের বৃত্তান্তকে মিথ্যা এবং ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণকে বিকৃত মস্তিষ্ক বলে মতামত জ্ঞাপন করেন।[২৯] যদিও উইলের বাস্তাবয়নে কোন সমস্যা সেইকালে দেখা যায় নি।

রাজার মৃত্যুর পর নাজীর সসৈন্যে কোচবিহার এসে পৌঁছান। কিন্তু তাঁর প্রকৃত মনোভাব সকলের কাছেই সন্দেহজনক মনে হয়। অবশেষে নাজীর রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে বলরামপুরে ফিরে যান। এদিকে নাজীরের অনুপস্থিতিতে রাজার অভিষেক বন্ধ থাকে এবং সেই কারণে মৃত রাজার সৎকারও বন্ধ থাকে। অবশেষে মৃত রাজার মা সত্যভামা দেবীর অনুরোধ বহন করে নাজীরের কাছে দূত যায়, নাজীর ফিরে আসেন। এরপর শিশু হরেন্দ্রনারায়ণকে কোলে নিয়ে নাজীর অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করেন। রাজার নামে ছাপমোহর ও মুদ্রা প্রস্তুত হলে রাজাকে প্রথা অনুযায়ী নজর দেওয়া হয়। রাজার আদেশ অনুযায়ী এরপর মৃত রাজার সৎকারের ব্যবস্থা করা হয়। মহারাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে তাঁর এগারো জন রাণী সহমরণে যান। কিন্তু শিশু রাজার অভিষেকের সময় নাজীর একটি দুষ্কার্য করেছিলেন, তিনি নিজ সন্তানকেও একইসঙ্গে যুবরাজ হিসেবে অভিষিক্ত করেন। পরিস্থিতি অত্যন্ত প্রতিকুল থাকায় এই দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে সরব হওয়ার মত পরিস্থিতি রাজপরিবারের ছিল না। অভিষেক ক্রিয়া নিরূপদ্রবে শেষ হল। রাজার পিতামহী সত্যভামা দেবী নাজীরকে পারিতোষিক প্রদানপূর্বক তুষ্ট করলেন। পূর্ববর্তী রাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের ইচ্ছানুসারে কামতেশ্বরী দেবীই শিশুরাজা হরেন্দ্রনারায়ণকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন।

রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ (১৭৮৩-১৮৩৯)

ধরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু পর ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ পুনরায় রাজসিংহাসনে বসলেও রাজকার্যে তিনি মনোযোগী ছিলেন না। গোসাঞি এবং খাসনবীশের সহায়তায় মহারাণী রাজ্য চালাতেন। নাজির খগেন্দ্রনারায়ণ রাজার অবর্তমানে

রাজপদে অভিষিক্ত হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। তাছাড়া প্রভূত সম্পত্তি ও লোকবলের মালিক হওয়াতে তিনি রাজকীয় আদেশ অতিক্রম করতেন প্রায়ই। নাজির খগেন্দ্রনারায়ণের উদ্দেশ্য ছিল রাজপুরীতে ও রাজ্যশাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে রাণীকে ক্রমশ নিঃসঙ্গ করে দেওয়া যাতে রাজার মৃত্যুর পর বিনা বাধায় রাণী ও রাজকুমারকে সরিয়ে শাসনক্ষমতা দখল করা যায়। নাজিরের অত্যাচারে রাজকর্মচারীরা ভীত হয়ে পড়লে রাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে এক ইচ্ছাপত্র তৈরি করান, যাতে শিশু হরেন্দ্রনারায়ণকে "বেহার ও চাকলাজোতের" রাজা ঘোষণা করা হয়, এবং বালকরাজার সাবালকত্ব প্রাপ্তি পর্যন্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ কুঙরকে দেওয়ান এবং মহারাণী কামতেশ্বরী দেবীকে রাজার অভিভাবক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। মহারাজের মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই নাজির বহুসংখ্যক সৈন্য নিয়ে নিজের ছেলেকে রাজসিংহাসনে বসানোর দাবিতে রাজবাড়ি এসে পৌঁছলে মহারাণীর আজ্ঞায় কোম্পানীর সিপাইরা তাদের গতিরোধ করে। এরপর কুটিল খগেন্দ্রনারায়ণ প্রস্তাব করেন নতুন রাজার অভিষেককালে রাজছত্র ধরবার, কারণ বিশ্বসিংহের রাজত্বকাল থেকেই নব অভিষিক্ত রাজার অভিষেককালে রাজার মাথায় রাজছত্র ধরার অধিকার একমাত্র নাজিরের। কিন্তু তাঁর যুক্তি বা কুযুক্তি যাই থাকুক, রাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের মা সত্যভামা দেবী ও কোম্পানীর ফৌজের নেতা জিতন সিংহের দৃঢ়তায় নাজির ব্যতিরেকেই প্রথা ভেঙে রাজার অভিষেক হয়। একান্ত শিশু বয়সে রাজসিংহাসনে বসেন রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ। কিন্তু পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায় যখন খগেন্দ্রনারায়ণ কোম্পানীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তাদের ভুল সংবাদ দিয়ে জিতন সিংহকে শাস্তি দেওয়া ব্যবস্থা করেন। হরেন্দ্রনারায়ণের অভিষেকের বারো দিনের মাথায় রাজধানীতে পৌঁছে খগেন্দ্রনারায়ণ নিজের রাজ্যাভিষেক সেরে নেন এবং রাজবাড়ীর অন্দরমহল অবরোধ করে খাদ্যদ্রব্যও পর্যন্ত সেখানে ঢোকা নিষিদ্ধ করেন। পরে অবশ্য বিশ্বস্ত রাজকর্মচারীদের এবং হাওয়ালদারদের চিঠি থেকে সমস্ত তথ্য জেনে কোম্পানীর পক্ষ থেকে টমাস মুরকে পাঠানো হয় রংপুরের কালেক্টর হিসাবে বদলি করে। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে মুর কোচবিহারে আসেন এবং সমস্ত ঘটনার তদন্ত করে নাজিরকে কারাগারে বন্দী করা হয়। তাঁর অধিকৃত সমস্ত সম্পত্তি মহারাজের অধীনে আনা হয়। কোম্পানীর পক্ষ থেকে ক্যাপ্টেন ডানকান ও সুবেদার গোলাম সিং এর অধীনে একদল সৈন্য মোতায়েন করা হয়। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার এখানেই শেষ নয়। নাজির সুযোগ বুঝে পালান এবং কিছুদিনের মধ্যে বিক্ষুব্ধদের সঙ্গে মিলে সৈন্য সংগ্রহ করে নাবালক রাজা ও মহারাণীকে বলরামপুরে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখেন। রংপুরের তৎকালীন কালেক্টর ম্যাকডাওয়েল সাহেবের কাছে সমস্ত সংবাদ পৌঁছলে ভরা বর্ষায়, ১৭৮৬ সালে র‍্যাটন চার কোম্পানী সৈন্যসহ এসে পৌঁছান ও বালক রাজা এবং মহারাণীকে উদ্ধার করেন। পাশাপাশি কোম্পানীর সেনাদলের প্রশিক্ষণে আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত সেনাদল গঠনের কাজ শুরু হয়। কোম্পানীর তরফে নানা তদন্তের পর সিদ্ধান্ত হয় যে মহারাজই রাজ্যের একমাত্র অধিপতি, শরিকবিহীন রাজ্যে আদালত ও টাকশাল তাঁরই অধিকারভুক্ত থাকবে। নাজির কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য মাসিক পাঁচশত টাকা আর বলরামপুরের বসতবাটির স্বত্বভোগী হবেন। রাজ্যে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে লর্ড কর্ণওয়ালিশ হেনরী ডগলাসকে নিযুক্ত করেন। কিছুকাল মধ্যে চার্লস এন্ড্রুব্রুচ রাজ্যের কমিশনারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

কমিশনার যে কেবল শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা বা আর্থিক স্থিতির দিকেই লক্ষ্য রেখেছিলেন তা নয়, বালক রাজার শিক্ষার দিকটিও গুরুত্ব পেল। মাতৃভাষা, ফার্সী, সংস্কৃত ইত্যাদি শেখার পাশাপাশি ইংরাজি ভাষা শিক্ষাতেও মনোযোগী হয়েছিলেন। কৈশোরেই হরেন্দ্রনারায়ণ অনেকগুলি বিবাহ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর অধিকাংশ সময়েই তাঁর কাটত রাজঅন্তঃপুরে। ফ্রান্সিস জেনকিন্সের বিবরণী থেকে জানা যায় রাজকর্মচারীরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্য নিয়ে এলেও মহারাজের সন্ধান পাওয়া যেত না।[৩০] অতি প্রয়োজনীয় কাগজ মহিলা কর্মীদের হাতে রাজঅন্তঃপুরে পাঠানোর নজিরও বিরল নয়। কিন্তু মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের চরিত্রের অন্য একটি সুদৃঢ় বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি রাজকার্যের বিষয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে হস্তক্ষেপ করতে দিতেন না। তাঁর এই প্রচেষ্টা আজীবন

বজায় ছিল। এনিয়ে কোম্পানীর সঙ্গে নানা বিবাদের পর গভর্ণর জেনারেল বিবাদের মীমাংসা করে রায় দেন যে লালবন্দী (প্রদেয় রাজস্ব) ঠিকমত দেওয়া হচ্ছে কিনা এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা ছাড়া গভর্ণমেণ্ট অন্যকোনও বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না।[৩১] সুদীর্ঘ ৫৬ বছর রাজত্ব করেন মহারাজা। কোচবিহার শহরের বিখ্যাত সাগরদিঘি রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ কীর্তি সাক্ষ্য বহন করে। তিনবার রাজধানী বদল করেন তিনি। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে ভেটাগুড়ি, ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে ধলুয়াবাড়ী ও ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে কোচবিহার শহরে পুরনো রাজনিবাসের পাশে নতুন করে রাজগৃহ নির্মাণ করেন। মৃত্যুর আগে বেশিরভাগ সময়টাই মহারাজ কালী সাধনায় মত্ত ছিলেন। সুপণ্ডিত হরেন্দ্রনারায়ণ এই সময় প্রচুর শাক্তপদ লিখেছিলেন। এরপর কুমার শিবেন্দ্রনারায়ণকে রাজ্যভার অর্পণ করে কাশীবাসী হন এবং ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে কাশীতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণ (১৮৩৯—১৮৪৭)

কাশীতে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হলে ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ কোচবিহারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু এই রাজ্যলাভ সহজে হয়নি। হরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর কুমার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রাজ্যলাভের বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু অসাধারণ তীক্ষ্মধী শিবেন্দ্রনারায়ণ পিতৃরাজ্য লাভে সমর্থন হন। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ গভর্ণমেণ্টকে বহু বছর দেয় কর প্রদান করেন নি। শিবেন্দ্রনারায়ণ শাসনভার হাতে নিয়ে প্রথমে সমস্ত বকেয়া ঋণ শোধ করেন, পাশাপাশি রাজ্যে নানা বিষয়ে শাসনকেন্দ্রিক শৃঙ্খলা প্রবর্তন করেন। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ রাজসভা ও মহাবিচারালয় স্থাপন করেন। এই বিচারালয়ে রাজস্ব, দেওয়ানী ও ফৌজদারী সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে মীমাংসা হত। দেওয়ানবন্ধু কালীচন্দ্র লাহিড়ী এবং বাবু ঈশানচন্দ্র মুস্তাফী এই বিচারালয়ের বিচারক ছিলেন। মহারাজা প্রতিষ্ঠিত সভাটির নাম 'ধর্মসভা'। এই আলোচনা সভায় রাজ্য শাসনসংক্রান্ত নানা বিষয় আলোচিত হত। রাজবাড়ির বিভিন্ন অংশের সংস্কার সাধনের পাশাপাশি রাজকার্যের বিভিন্ন বিভাগেও সংস্কার সাধন করেন। সন্ন্যাসী, বৈরাগী, ঘর ছাড়াদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য সাগরদিঘির দক্ষিণ তীরে স্থাপিত হল 'ধর্মশালা'। মহারাজ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থাৎ ব্রজেন্দ্রনারায়ণের চতুর্থ পুত্রকে দত্তক নেন ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে এবং তাঁর নাম রাখেন নরেন্দ্রনারায়ণ। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের আমল থেকেই ইংরাজি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন হয় এবং রাজপরিবারে পাশ্চাত্যশিক্ষা সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে। শিবেন্দ্রনারায়ণ প্রবলভাবেই ইংরাজি শিক্ষা সংস্কৃতির পক্ষপাতী ছিলেন। বস্তুত মধ্যযুগীয় ভাবনা ও আধুনিক ধ্যানধারণা উন্মেষের যোগসূত্র ছিলেন তিনি। মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ তাঁর স্বল্পকালীন শাসনে রাজ্যের অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে উঠে কোচবিহার রাজ্যকে আপন গরিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। কোম্পানীর এজেণ্ট জেনকিন্সের মতে মহারাজা আরও কিছুকাল শাসন চালালে হয়ত আরও অনেক অব্যবস্থা দূর হতে পারত। এরপর দত্তক পুত্র নরেন্দ্রনাথ ও মহারাণী বৃন্দেশ্বরী দেবী সহ তিনি কাশী যাত্রা করেন এবং কিছুকাল বাদে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় কাশীতে তাঁর মৃত্যু হয়।

রাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের কথা বলতে গেলে মহারাণী বৃন্দেশ্বরী দেবীর কথা না বললে তা অসম্পূর্ণ থাকবে। শিবেন্দ্রনারায়ণের মহিষী বৃন্দেশ্বরী দেবীর জন্ম আনুমানিক ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে। প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও নানা বিষয়ে বিশেষত পুরাণাদি শাস্ত্রে তাঁর অধিকার ছিল। পাশাপাশি রাজ্য পরিচালনার বিষয়ে অভিজ্ঞতাজনিত জ্ঞানলাভ তাঁকে সমৃদ্ধ করেছিল। তিনি ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে 'বেহারোদন্ত' নামে একটি কাব্য রচনা করেন যা মূলত ইতিহাস। সহজ ভাষায় রচিত অন্ত্যমিল বিশিষ্ট এই কাব্যটি কোচবিহার রাজপরিবারের বৃত্তান্ত। যেখানে এই রাজবংশের আদি ইতিহাসের পাশাপাশি সমকালীন বৃত্তান্তও পাওয়া যায়। বস্তুত এই কাব্য এই রাজবংশের বংশচরিত তথা ইতিহাসও বটে। আবার স্থানে স্থানে রাণীর নিজের প্রসঙ্গ কথনক্রমে তা আংশিক আত্মজীবনীও বটে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে যখন নারী শিক্ষার আলো বিস্তার লাভ করেনি তখন মহারাণী বৃন্দেশ্বরী

কোচরাজ দরবারের সভাসাহিত্য আস্বাদন করতেন। বস্তুত হরেন্দ্রনারায়ণের সময় থেকেই সাহিত্যে স্বর্ণযুগের সূচনা। সেই গৌরবময় পরিবেশ তাঁকে সাহিত্য রচনায় অগ্রণী করে তোলে। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বামা লেখনীর পথ প্রদর্শক তিনিই। অনুরূপে রাসসুন্দরী দেবীর আগেই লেখা এই 'বেহারোদন্ত' তাকে প্রথম মহিলা আত্মজীবনী রচয়িতার সম্মান এনে দিতে পারে কারণ 'বেহারোদন্ত' গ্রন্থে আত্মজীবনীর আভাস চোখে পড়ে বংশপরিচয় বর্ণনাপ্রসঙ্গে। 'বেহারোদন্ত' কাব্যে কোচ রাজাদের ধারাবাহিক ইতিহাসের সূত্রটি এখানে গ্রথিত। পাশাপাশি নিজের জীবন, মহারাজের দিনযাপন, নরেন্দ্রনারায়ণের কথাও লিখেছেন কবি। ফলে তা হয়ে উঠেছে আস্বাদ্য এক ফেলে আসা দিনের খণ্ডছবি। 'বেহারোদন্ত' কাব্যে কোচ রাজাদের ক্রমপারম্পরিক বিবরণ পাওয়া যায়—

বেহার ঈশ্বরগণ জন্ম বিবরণ।
একমন চিত্তে সবে করুন শ্রবণ॥
হীরা দেবী গর্ভে জাম শিবের ওরসে।
শিষ্য সিংহের রায়কত হইল খেয়াতি।
বিশ্বসিংহ রাজা হয়ে পালিলেন ক্ষিতি॥
শিষ্য বংশ বলে আর নাহি প্রয়োজন।
বিশ্বদেব বংশাবলী করহ শ্রবণ॥
ভূপের মধ্যম পুত্র নরনারায়ণ।
রাজ্যপ্রাপ্তে বহু দেশ করেন শাসন॥
তস্য সুত লক্ষ্মীনারায়ণ ক্ষিতিপতি।
প্রজাবর্গে পালিতেন যেমন সন্ততি॥
বীরনারায়ণ নামে বীর অবতার।
পিতার বিয়োগে পান রাজ্যে অধিকার॥
প্রাণনারায়ণ নামে তাহার নন্দন।
কাল প্রায় শত্রুপক্ষ করেন শাসন॥
তদন্তরে মোদনারায়ণ নরপতি।
পিতৃ অন্তে বসুদেব পাইলেন ক্ষিতি॥
মহীন্দ্রনারায়ণ হয় সন্তান তাঁহার।
পিত্রভাবে করিলেন রাজ্যে অধিকার॥
লক্ষ্মীনারায়ণ সুত জগৎ কুঙর।
তদাঙ্গজ রূপনারায়ণ নরেশ্বর॥
উপেন্দ্রনারায়ণ রূপনারায়ণ তনয়।
বাল্যকালে রাজ্যেশ্বর হন মহাশয়॥
সরোবর তটে বসি ছিলেন রাজন।
শিরশ্ছেদ করে তাঁর দ্বিজ একজন॥
খগেন্দ্র দিওয়ান রূপনারায়ণের সুত।
পঞ্চ পুত্র ছিল সবে সর্ব্বগুণ যুত॥
তৃতীয় ধৈর্যেন্দ্র রায় হন ক্ষিতিশ্বর।
পরাভবে শত্রু সঙ্গে বন্দি নৃপবর॥

ভূপতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজেন্দ্রনারায়ণ।
রাজা হয়ে সপ্তাহেতে পাইল নিবর্ব্বান॥
ধরেন্দ্র কুঙর পেয়ে রাজ্য অধিকার।
ইংরেজ সহায়ে তাঁকে করেন উদ্ধার॥
রোগগ্রস্তে শেষে রায় মুদেন নয়ন।
পুনবর্ব্বার ধৈর্যেন্দ্র নারায়ণ রাজা হন।
রাজকার্য্যে রাজ্যেশের নাহি ছিল মন।
ছদ্মবেশে তীর্থে তীর্থে করেন ভ্রমণ॥
মহাকষ্টে ভূপেশ্বর প্রাপ্ত হনবর।
শিবসম পুত্র পান সবর্ব্বগুণধর॥
কতদিনে ভূপালের হৈল উর্দ্ধগতি।
ত্রিবর্ষের শিশু তাঁর হইল ভূপতি॥
হরেন্দ্রনারায়ণ নাম খ্যাত সবর্ব্বত্রেতে।
বাল্যকালে ঘটিল উৎপাত নানামতে॥
রাজ্য আশে শত্রু হয়ে খগেন্দ্রনারায়ণ।
দ্বিসহস্র সৈন্য সঙ্গে করেন পলায়ন॥
বাহু যুদ্ধে রাজসৈন্য পরাভব করি।
জননী সহিতে ভূপে নিল নিজ পুরী॥
যেন পাতালেতে মহী রাম লক্ষ্মেণেরে।
বন্দী করি রাখিলেক লয়ে কারাগারে॥
ব...ঈষৎ হাসি শ্রীমধুসূদন।
ইঙ্গিতে হনুর হস্তে করেন নিধন॥
কলিকালে সেই রূপ ইহাও হইল।
ফিরিঙ্গর তোপে সৈন্য ভস্ম হয়ে গেল।
কিন্তু দুরাচার পরে হল অদর্শন।
রহিলেক সেই হেতু জীবনে জীবন॥
গুপ্তভাবে রক্ষে প্রাণ পিক্ষ ঈশ্বর।
শেষে রোগগ্রস্তে যায় শমন নগর॥
কত দিনান্তরে ভূপ বরপ্রাপ্ত হয়।
আপনার বাহুবলে রাজত্ব করয়॥
ভূপালের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বামী যে আমার।
কহিতে লজ্জায় জিহ্বা হইতেছে আড়॥
গুরু পিতৃ মাতৃ আর স্বামী নাম আদি।
উচ্চারণ করিবারে নাহি কোন বিধি॥
সবর্ব দেবদেব পদে করি নমস্কার।—ইত্যাদি।[৩২]

প্রসঙ্গত একথা সহজেই অনুভূত হয় কত সাবলীল ভাষা ও ছন্দে রাজবংশচরিত রচনার প্রয়াসী ছিলেন বৃন্দেশ্বরী দেবী। রাজ পরিবারের ছেলেদের লেখাপড়া করার জন্য তিনি একটি স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে। এটিই সর্বপ্রথম কোচবিহারে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কেবল বাংলা বা সংস্কৃত নয়, এই স্কুলটিতে ইংরাজীও পড়ানো হত। বৃন্দেশ্বরী দেবী নিজে এই স্কুলের শিক্ষক নিয়োগ থেকে পড়াশুনার মান, সবকিছুর প্রতি দৃষ্টি রাখতেন। প্রকৃতপক্ষে বৃন্দেশ্বরী দেবী কোচবিহারের এক ক্রান্তি লগ্নের ধারাভাষ্যকার। তখন প্রাচীন শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটে ক্রমে ইংরেজ প্রশাসন চালু হয়েছে। মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর নাবালক রাজার আইনি উপদেষ্টা পদে বৃত কোম্পানির প্রতিনিধিরাই শাসনকর্তা। এই সময়ে বৃন্দেশ্বরী দেবীর দায়িত্বশীল কলমচালনা কোচবিহার ইতিহাসের ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণ (১৮৪৭-১৮৬৩)

মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণের রাজ্যাভিষেক হয় ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে। বারাণসীতে মহারাজা শিবেন্দ্র নারায়ণের লোকান্তর প্রাপ্তি ঘটলে মাত্র ৬ বছর বয়সে সেখানেই তাঁর রাজ্যাভিষেক হয়। এরপর বিমাতাদের সঙ্গে কোচবিহারে ফিরে আসার পর তদানীন্তন দেওয়ান বাবু কালীচন্দ্র লাহিড়ীর উদ্যোগে গভর্ণর জেনারেলের এজেণ্ট ফ্রান্সিস জেনকিন্সের অভিপ্রায় অনুযায়ী শিক্ষালাভের জন্য প্রেরিত হন। কিছুকাল কৃষ্ণনগরে শিক্ষালাভের পর তিনি কলকাতায় নীত হন। শিক্ষালাভের জন্য তিনি বেশ কয়েক বছর কলকাতায় থাকেন। মহারানী বৃন্দেশ্বরী দেবীর রচিত 'বেহারোদন্ত' কাব্যটি সেই সময়ের সাক্ষ্য প্রদান করে—

আজেণ্ট দেয়ানবর রাজমন্ত্রী তদন্তর
রাজায় তরিতে নিয়ে যায়।
রাজা বিনা রাজধানী হইল ক্রন্দন ধবনী
সব রানী উন্মাদিনী প্রায়॥
সঙ্গে গতি বহুজনে আমলা বৈদ্যকগণ
আশাসোটা সহ চোপদার।
যার যত রাজ সঙ্গে লিখনী ভঙ্গে
সিফাই সেবক পারচার॥
এই সবে সঙ্গে করি চলে রাজ্য অধিকারী
মহানন্দে দুর্গম এড়ায়।
স্থানে স্থানে কত শত দেখিলেন অদ্ভুত
শেষে তরী ঘাটেতে লাগায়॥
তদন্তরে নৃপবর উপনীত গভর্ণর
জেনেরেল সাহেব সমীপে।
গাত্র তুলি গভর্ণর করি অতি সমাদর
হস্তধরি বসাইল ভূপে॥
সাহেবের যাম্যে স্থিতি চেড়েতে ভূপতি।
প্রাক্ উপবিষ্ট মন্ত্রী পেয়ে অনুমতি॥
উভয়ে ভদ্র জিজ্ঞাসয়ে পরে।
উভয়ে হইল হৃষ্ট দৃষ্টে পরস্পরে॥

অমিয়া সমান ভাষা মৃদু হাসি তার।
সাহেব অধিক তুষ্ট রাজার ভাষায়॥
কমিটি হইল শেষে মিলি সভ্যজন।
কৃষ্ণনগরেতে যুক্তি বিদ্যা অধয়ন॥
তদন্তরে মন্ত্রী প্রতি করিল আদেশ।
কৃষ্ণনগরেতে যেতে কর তরি বেশ।
সুসজ্জিত তরি জলে হইলে মগন॥
রাজদ্রব্য কিছুমাত্র হানি নাহি হয়।
সুবেদার মাত্র যায় শমন আলয়॥
শেষে কৃষ্ণনগরেতে হয়ে উপনীত।
কলেজে অভ্যাসে বিদ্যা বালক সহিত॥[৩৩]

মহারাজের কলকাতায় অবস্থিতি কালে তাঁর পিতা কুমার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রাজার মুখপাত্র হিসাবে রাজকার্য্য পরিচালনা করতেন, কিন্তু কুমার ব্রজেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর মহারাণী বৃন্দেশ্বরী ও কামেশ্বরী দেবী রাজকার্য্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু ঘটে। তিনি বিদ্যোৎসাহী ও আধুনিক মনোভাবাপন্ন রাজা ছিলেন, যাঁর প্রমাণ পাওয়া যায় বৃন্দেশ্বরী দেবীর বেহারোদন্ত কাব্যে—

একদিন সিংহাসনে বসিয়া রাজন।
সভায় ডাকিয়া সভে করান জ্ঞাপন॥
মোর মন হয় কলিকাতা যাইবার।
তরণী আনহ ভাল অতি সুবিস্তার॥
গৃহ কর্ম্মে লিপ্ত হয়ে আছি সর্ব্বক্ষণ।
নাহিহয় কিছু মাত্র বিদ্যা অধ্যয়ন॥
তোরা সব রাজকার্য্য কর সাবধানে।
যে পর্যন্ত আসি ফিরে না আসি ভবনে॥"[৩৪]

বিদ্যাচর্চার জন্য এই আবেগ, রাজপরিবারের বিলাসবহুল জীবন ছেড়ে অধ্যয়নের জন্য সুদূর কলকাতা নৌকায় রওনা দেওয়ার প্রস্তুতি নিঃসন্দেহে তাঁর বিদ্যানুরাগী স্বভাবের প্রমাণ। কলকাতা যাত্রার প্রস্তুতি পর্বেই কাহিনী সমাপ্ত হয়েছে। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে ৬ই আগস্ট মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণ মাত্র ২২ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন।

মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ (১৮৬৩—১৯১৯)

১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ৭ আগস্ট মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ মাত্র দশ মাস বয়সে রাজ্যভিষিক্ত হন। নাবালক মহারাজার পিতামহী নিস্তারিণী দেবী রাজকার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। চিরপ্রচলিত প্রথা অনুসারে মহারাজের নামে টাকা ও মোহর মুদ্রিত হয়। কিন্তু কিছুকাল যেতে না যেতেই রাজ অন্তঃপুরের দ্বন্দ্বের সংবাদ পৌঁছয় ইংরেজ সরকারের কাছে। এবং নাবালক রাজার বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত শাসনকার্যের দায়িত্ব নিয়ে কোচবিহার রাজ্যে কমিশনার হয়ে আসেন কর্ণেল হটন। ভূমিদান, অবসরকালীন ভাতা প্রদান এবং প্রাণদণ্ড বিধানের ক্ষমতা ছাড়া আর সমস্ত রাজকীয় ক্ষমতাই তাঁকে দেওয়া হল। সরকারী অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনও আইন বা শাসনপ্রণালীর কোনরকম

পরিবর্তন করা তাঁর এক্তিয়ারে ছিল না। মহারাজের উপযুক্ত লালনপালন এবং শিক্ষার বিষয়ে যথাযথ দৃষ্টি রাখতে কমিশনার দায়িত্ববদ্ধ ছিলেন। এই সময়কাল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল দাস ব্যবসা তথা মানুষ কেনাবেচার আইন করে অবসান।[৩৫] কর্ণেল হটন আরও বহু বিষয়েই মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণার বাইরে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকসম্পাত করেন। যদিও অনেকখানি সময় তাঁকে ভূটান যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হয়। ফলে কোচবিহারের শাসনভার অনেকক্ষেত্রেই ডেপুটি কমিশনারের হাতে ন্যস্ত থাকত। অতি পিছিয়ে পড়া এই জনপদে না ছিল উপযুক্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা, না ছিল যথাযথ রাস্তাঘাট। এক অভিনব পরিকল্পনা করে ইংরেজ প্রশাসকরা কোচবিহারে সামগ্রিক চেহারাই বদলে দিলেন। প্রথমে একের পর এক দিঘি খনন করা হল, তারপর সেই মাটি দিয়ে উঁচু করে তৈরি হল রাস্তাঘাট। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে প্রাপ্তবয়স্ক মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ মহাসমারোহে রাজ্যাভিষিক্ত হন। উন্নয়নের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, তা মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে অব্যাহত রইল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর দুই দশকের মধ্যেই কোচবিহার শহরের আধুনিকীকরণের কাজ অনেকটাই হয়ে যায়। অতীতে মহারাজা রূপনারায়ণ যে রাজগৃহে রাজকার্য চালাতেন এবং বসবাস করতেন পরবর্তীকালে ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ সেখানে পুনরায় বসবাস শুরু করেন ও রাজ আবাসের নানা সংস্কার সাধন করান। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সরকারী অনুমোদনক্রমে মহারাণীদের সঙ্গে আলোচনার পর নতুন রাজপ্রাসাদ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে এর নির্মাণ কার্য শুরু হয়। ইটালিয়ান স্থাপত্য ভাবনা ও বাকিংহাম প্যালেসের রীতির মিশেলে তৈরি এই রাজপ্রাসাদ নির্মাণ শেষ হয় ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে। দুটি কোর্টইয়ার্ডসহ প্রাসাদটি দাঁড়িয়ে আছে ৫১,৩০৯ বর্গফুট জমিতে। প্রাসাদের দুটি তলা মিলিয়ে ছোটবড় ৬৪টি ঘর এবং ১৭টি স্নানাগার রয়েছে। প্রাসাদ চত্বরের অন্যান্য বাড়িগুলিতে শাসনকার্যের কোন না কোন বিষয়ে কাজ চলত। মেয়েদের শিক্ষার জন্য বিশেষ কোন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ছিল না। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে মহারাণী সুনীতি দেবীর উৎসাহে ও রাজআনুকূল্যে 'সুনীতি একাডেমী'র প্রতিষ্ঠা হয়, প্রথমে যা 'সুনীতি কলেজ' নামে যাত্রা শুরু করে। এই স্কুলের মূল ভবনটির দ্বারোঘাটন করেন মহারাণী সুনীতি দেবী ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে[৩৬]। স্কুলটিতে সূচনাপর্বে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি ছিল কৌতুহলোদ্দীপক। তখনকার দিনের শিক্ষিত দম্পতিদের এখানে যথাক্রমে শিক্ষক ও শিক্ষিকা পদে নিয়োগ করা হত। এমন কয়েকজন দম্পতির কথা উল্লেখ করি শ্রী নগেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী (প্রধান শিক্ষক) এবং শ্রীমতী মুক্তামালা চ্যাটার্জী (শিক্ষিকা), শ্রী এম. জে. পাল এবং শ্রীমতী পাল, শ্রী এক এম বড়ুয়া এবং শ্রীমতী বড়ুয়া প্রমুখ। হয়ত উপযুক্ত সংখ্যক এবং গুণমানের শিক্ষিকার অভাব এই ধরনের নিয়োগের জন্য দায়ী। মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের ৬ই মার্চ, ব্রহ্মবান্ধব কেশবচন্দ্র সেনের প্রথমা কন্যা সুনীতি দেবীর বিবাহ হয় এবং এই বিবাহ বন্ধনের ফলে রাজ্যে ব্রাহ্মধর্মের গোড়াপত্তন হয়। কিছুকাল পরে কেশবচন্দ্র নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করলে স্বভাবত এই রাজ্যে নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ধারাটি প্রচলিত হয়। মহারাজা নিজে কেশবচন্দ্রের কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন এবং পরবর্তীকালে রাজপরিবারের অন্য সদস্যরাও অনেকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন। মহারাজকুমার রাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ ও জিতেন্দ্রনারায়ণ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত ছিলেন। ১৮৮৭-৮৮ খ্রিস্টাব্দে রাজ আনুকূল্যে ও উৎসাহে কোচবিহারের ব্রাহ্মন্দিরটি নির্মিত হয়। কাঠের সুদৃশ্য গ্যালারী সহ এই হলঘরে বা প্রার্থনাসভায় দেড়শ লোকের বসার ব্যবস্থা ছিল। রবিবারের সাপ্তাহিক উপাসনার বাইরেও মাঘোৎসব, বাংলা নববর্ষ প্রভৃতি উৎসবের দিনগুলি উদ্‌যাপিত হত।

১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে ৮ই নভেম্বর মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ রাজ্যাভিষিক্ত হন আর পরদিন, ৯ই নভেম্বর রাজ্যের উন্নয়ন সম্পর্কিত ঘোষণায় তিনি রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করার কথা বলেন। কিন্তু পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে মূল সমস্যা ছিল অর্থাভাব। রাজপ্রাসাদ নির্মাণ, দীঘি খনন ও রাজপথ সম্প্রসারণে বহু অর্থব্যয়ে রাজকোষ তখন অর্থাভাবে ধুঁকছে। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে ধরলা নদীর উত্তরপাড় থেকে তোর্ষা নদীর দক্ষিণ পাড় পর্যন্ত রেললাইন

পাতার সিদ্ধান্ত হয়, কিন্তু কাজ শুরু হয় ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে সরকারের কাছ থেকে ঋণ পাওয়া পর। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মালবাহী ট্রেন এবং এর এক বছরের মধ্যেই যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল শুরু হয়। কোচবিহার শহরের বর্তমান রেলস্টেশনটির নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে এবং তোর্ষা নদীর উপর রেলব্রীজ প্রস্তুত হলে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই জুন কোচবিহার শহর রেললাইন দ্বারা নবনির্মিত স্টেশনের সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হয়। তাঁর জীবৎকাল ছিল বস্তুতপক্ষে শহর কোচবিহারের গড়ে ওঠার কাল। তাঁর পরবর্তী শাসকদের উপর স্বভাবতই এই নতুন কালকে চালনা করার দায়িত্ব পড়ে।

রাজপরিবারে বিংশ শতাব্দী

মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজরাজেন্দ্র নারায়ণ রাজ্যাভিষিক্ত হন ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে। ইউরোপীয় চিন্তাধারা তখন রাজপরিবারের ভাবনার মূলস্রোতকে প্রভাবিত করেছে। মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র জিতেন্দ্রনারায়ণ ইংলণ্ডে গিয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন বরোদার বিদূষী রাজকুমারী ইন্দিরাদেবীর সঙ্গে। এর মধ্যে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে রাজরাজেন্দ্র নারায়ণের মৃত্যু ঘটলে রাজসিংহাসনে আসীন হন মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ। রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ তাঁর রাজ্যাভিষেকের প্রথম দিনেই ঘোষণা করেছিলেন "মদীয় প্রজাবর্গের কল্যাণার্থে যদি কোন সময়োচিত পরিবর্তন আবশ্যক বলে বিবেচিত হয় তবে সে প্রকার ব্যবস্থা করা যাইবেক। কিন্তু তাঁর অকালমৃত্যুর পর সেই ঘোষণা বা রাজ অভিপ্রায় বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব পড়ল মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণের (১৯১৩-১৯২২) উপর। মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ তাঁর দুই পিতৃব্য মহারাজকুমার হিতেন্দ্রনারায়ণ ও ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণকে উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত করে তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতায় রাজকার্য চালাতেন। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মহারাজা দেবমন্দির বা উপাসনাগৃহের তুলনায় স্কুল, কলেজ, পাঠাগার নির্মাণে অনেক বেশি উদ্যাগী ছিলেন। এছাড়া ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণের উদ্যোগে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে মাথাভাঙ্গা, দিনহাটা ও মেখলিগঞ্জে স্বর্গীয় মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের নামে স্মৃতি ভবন ও পাঠাগার নির্মিত হয়। গ্রামে গ্রামে স্কুল স্থাপিত হয়। বলা যায় মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালেই শিক্ষার আলো জনসাধারণের কাছে গিয়ে পৌঁছায়। এতদিন তা ছিল রাজা ও রাজপরিবার তথা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের কুক্ষিগত অধিকার। মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ শিক্ষা প্রসারে স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পাঠাগার স্থাপনের পাশাপাশি পানীয় জলের সমস্যা সমাধানেও সচেষ্ট ছিলেন। সাহিত্যপ্রেমিক এই মহারাজা ইংরাজী ভাষায় দুটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণের লোকান্তর প্রাপ্তি ঘটলে অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের রাজ্যাভিষেক ঘটে।

মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের রাজ্যাভিষেক হলে রাজকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য মহারাণী ইন্দিরাদেবীর সভানেতৃত্বে রিজেন্সী কাউন্সিল রাজ্য পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের রাজ্য শাসনকালে শাসন ও বিচারবিভাগ আলাদা করে হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠা ঘটে। শাসনকার্যে আমূল পরিবর্তন ঘটে। গ্রামে গ্রামে ইঁটের তৈরি কুয়ো নির্মাণ করে পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে অগ্রণী হয়েছিলেন মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ। মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ সেই ধারাটি অনুসরণ করেন। রাজারহাটে যক্ষ্মা হাসপাতাল নির্মাণ তাঁর অন্যতম প্রধান কীর্তি। মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন দেশের অন্যতম বিখ্যাত ক্রীড়াবিদ। নিয়মিতভাবে ক্রিকেট, ফুটবল, ব্যাডমিণ্টন ও পোলো খেলতেন তিনি। অশ্বারোহণেও তিনি ছিলেন দক্ষ। বস্তুত মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের আমলেই রাজপ্রাসাদের কাছে ফুটবল খেলা বা অন্যান্য খেলাধূলার যোগ্য একটি খেলার মাঠ তৈরি করিয়েছিলেন যা পরবর্তীকালে স্টেডিয়ামে উন্নীত। তাঁর আমলেই সেনা ছাউনি ও পুলিশ ব্যারাকে ফুটবল চর্চার উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে ওঠে এবং ফুটবল চর্চা বাধ্যতামূলক করা হয়। মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ফুটবল খেলায়

কোচবিহার কাপ চালু করেন। এই পরম্পরাই আরও শক্তিশালী হয় মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ ও মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের হাত ধরে। মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ নিজে কোচবিহার ফুটবল দলের নেতৃত্ব দিতেন। তিনি রাজ্যে আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে "কোচবিহার রাষ্ট্রীয় পরিবহন" নামে একটি সংস্থা স্থাপন করেন যা কোচবিহার রাজ্যটি উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর "উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন" সংস্থা নামে পরিচিতি লাভ করে। মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ প্রসঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষদর্শীরা বিভিন্ন ভাবে বলেছেন তাঁর জীবনযাত্রার আড়ম্বরহীনতার কথা, দেশের প্রতি তার সত্যিকারের মায়ার কথা। অকারণ বিদেশভ্রমণে অর্থ অপব্যয় তিনি বিশেষ করতেন না। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত ইউনিয়নের সঙ্গে 'কোচবিহার' রাজ্যের সংযুক্তিকরণ ঘটে। মানবিকগুণসম্পন্ন মহারাজ জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ একবার পোলো খেলার মাঠে গুরুতর আঘাত পান এবং ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ১১ই এপ্রিল তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কোচবিহার রাজপরিবার সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে স্বাধীনতা উত্তরকালে কোচবিহারের অবস্থান সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংযোজনার প্রয়োজন আছে। ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে স্বাধীনতা এল ভারতবর্ষে। ঘরের পাশেই পূর্ব পাকিস্তানের সীমানা। দলে দলে উদ্বাস্তু এসে কোচবিহার ও সংলগ্ন অঞ্চলে আশ্রয় নিলেন। ফলে জনস্ফীতি ঘটল। অর্থনৈতিক, সামাজিক আর সংস্কৃতিক পরিবেশ বিপন্ন হয়ে উঠল। মানুষ এক অসহিষ্ণু পরিবেশের শিকার হয়ে পড়ল। সেই সঙ্গে এসে পড়ল কোচবিহার রাজ্যের অবস্থান বিষয়ে সমস্যা। ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে Eastern State এর রেসিডেন্ট H.J.Tab মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণকে স্বাধীন কোচবিহারের জন্য পৃথক প্রশাসনিক পরিকল্পনা দিতে বলেছিলেন। পক্ষান্তরে ১৯৪৭ সালের জুন মাসে বৃটিশ সরকার দ্বিজাতিতত্ত্বের মূল্যে ভারতের স্বাধীনতা ও পাকিস্তানের জন্ম সম্ভাবনা ঘোষণা করে দেশীয় রাজ্যগুলির কোন একটাতে যোগদান করার কথা ঘোষণা করেন। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এই পরিপ্রেক্ষিতে ঘোষণা করলেন দেশীয় রাজ্যগুলিকে পার্শ্ববর্তী বড় প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। এই সঙ্গে ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে জিন্না দেশীয় রাজ্যগুলিকে স্বাধীন সত্তা নিয়ে চুক্তি করার আহ্বান জানালেন এবং অন্যান্য নানা সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন। স্বভাবতই দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে দোলাচলমানতা দেখা দিল। এই পরিস্থিতিতে মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু স্বতন্ত্র রাজ্য পাওয়ার সম্ভাবনা না দেখে নীরব থাকা শ্রেয় মনে করলেন। কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট, কোচবিহার প্রজামণ্ডল ও কোচবিহার পিপল্‌স্ অ্যাসোসিয়েশন-এর নেতারা কোচবিহারকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করার পক্ষে আন্দোলন শুরু করেন। আবার আসামের মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলুই ভাষা সংস্কৃতির নৈকট্য থেকে আসামের সঙ্গে কোচবিহারের সংযুক্তি দাবী করেন। এদিকে হিতসাধনীর মুসলিম সদস্যরা পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্তির দাবি তোলেন। হিতসাধনী সভা আগে থেকেই পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সংযুক্তির বিরোধিতা করে আসছিল।

হিতসাধনীর সদস্যরা দিল্লি গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত না হওয়ার আবেদন জানান। এভাবে পরিস্থিতি ক্রমেই আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। অবশেষে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, বল্লভভাই প্যাটেলের কাছে আবার হস্তক্ষেপের আবেদন জানান। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের রিপোর্ট ছিল পশ্চিমবঙ্গে সংযুক্তির অনুকূলে। এর মধ্যে মহারাজা নিজেই ২৮শে আগস্ট ১৯৪৯ সালে নিঃশর্তভাবে রাজ্যের শাসনভার ভারত সরকারকে তুলে দিলেন। ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা রূপে স্বীকৃতি পেল।

কথাশেষে বলা যায় খুব বেশিদিনের জন্য না হলেও কোচরাজ বিশ্বসিংহ থেকে নরনারায়ণের সময়কাল পর্যন্ত এই রাজবংশ এক বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। পরবর্তীকালে এই বিস্তৃতি হয়ত কমে, কিন্তু ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে অন্যান্য সম্পদ ও সাহিত্যানুরাগের নিদর্শন। বিশেষত নরনারায়ণের সময় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার ছিল শিক্ষা ও সাহিত্য প্রসারেরই সমার্থক। পরবর্তীকালে যুক্ত হয়েছে সঙ্গীত নৃত্য বিদ্যাদিতে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষণা। নাট্যাভিনয়ও

মহারাজ নরনারায়ণের রাজত্বকাল থেকেই ছিল জনপ্রিয়। শঙ্করদেব এবং তাঁর সুযোগ্য শিষ্য মাধবদেব ও দামোদর দেবের হাত ধরে এক নতুন আলো এই রাজ্যের সাহিত্য ও জীবনচর্যাকে আলোকিত করেছিল তা বলাই বাহুল্য। বস্তুত বৈষ্ণব ধর্মের রাজধর্মে স্বীকৃতি এবং শঙ্করদেবের এ রাজ্যে অবস্থান কোচবিহার রাজপরিবারের ইতিহাসে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অদ্বৈতবাদী এই বৈষ্ণব সাধক কামতা-কামরূপের ইতিহাসে এক অনন্য মাত্রা যোগ করেন, যার দিব্যপ্রভাব আজও এখানকার জনজীবনে অনুভূত হয়। এককথায় ঐতিহ্যে, আধুনিকতায়, ধর্মে, দর্শনে, সাহিত্যানুরাগে কোচবিহারের অনন্যতা প্রমাণিত।

উল্লেখপঞ্জি ঃ

১। আহমদ, খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা, কোচবিহারের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ-২০০৮, পৃষ্ঠা ৪-৫।

২। তদেব, পৃষ্ঠা-৮।

৩। তদেব, পৃষ্ঠা-১৭,১৮।

৪। রায়, স্বপনকুমার প্রাচীন কোচবিহারের আর্থ সামাজিক ইতিহাস, কলকাতা, বইওয়ালা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃষ্ঠা-১৯।

৫। তদেব, পৃষ্ঠা-২১।

৬। পীতাম্বর রচিত 'মার্কন্ডেয় পুরাণ' পুথি নং-৮, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, কোচবিহার। মার্কন্ডেয় পুরাণের ভণিতায় আছে—

"কামতা নগরে বিশ্বসিংহ নরেশ্বর।
প্রচন্ড প্রতাপ রাজা ভোগে পুরন্দর।
মহাপুণ্য কথা তাঁর আজ্ঞা পরমানে।
পয়ার প্রবন্ধ পিতাম্বর ভণে।"

৭। আহমদ, খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা, কোচবিহারের ইতিহাস, প্রথম খন্ড, কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রন-২০০৮, পৃষ্ঠা-৩।

৮। দাস, বিশ্বনাথ, (সম্পা) সটীক রাজোপাখ্যান, কোচবিহারের প্রাচীন ইতিহাস, কলকাতা, দি সী বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ -২০১৪, পৃষ্ঠা-৫৩।

৯। আহমদ, খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা, কোচবিহারের ইতিহাস, প্রথম খন্ড, কলকাতা, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ-২০০৮, পৃষ্ঠা-২৬। রচয়িতা উল্লেখ করেছেন—"কথিতআছে যে, আসামের বৈদ্যের গড়, এবং 'প্রতাপগড়' আরিমত্ত কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। খড়্গনরায়ণের বংশাবলী, ১-২ পত্র।

১০। পাল, নৃপেন্দ্রনাথ (সম্পা) বৈরাগী, রাধানাথ দাস বিরচিত 'গোসানীমঙ্গল' কলকাতা, অণিমা, প্রকাশণী, ২য় সংস্করণ-১৯৯২, পৃষ্ঠা-১১২-১১৩।

"দ্বাপরেতে কুরু পান্ডবের যুদ্ধ হৈল।
দুর্য্যোধন ভগদত্ত রাজারে বরিল।।
কৃষ্ণের মন্ত্রণা বলে পার্থ মহাবীর।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে কাটে ভগদত্ত শির।।

চন্ডীর কবচ এক তার হাতে ছিল।
সকবচ বাহু পার্থ কাটিয়া ফেলিল।।"

১১। আহমদ, খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা, কোচবিহারের সতিহাস, কলকাতা, মডান বুক এজেজন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ-২০০৮, পৃষ্ঠা-৪৬।

১২। তদেব, পৃষ্ঠা-৮২।

১৩। তদেব, পৃষ্ঠা-৮৫।

১৪। তদেব, পৃষ্ঠা-৯০।

১৫। পীতাম্বর রচিত মার্কন্ডেয় পুরাণ' পুথি নং ৮। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, কোচবিহার।

১৬। আহমদ, খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা, কোচবিহারের ইতিহাস, কলকাতা, মডার্ন, বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড,। পুনর্মুদ্রণ—২০০৮। পৃষ্ঠা-৯৩।

১৭। আহমদ, খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা, কোচবিহারের ইতিহাস, কলকাতা, মডার্ন, বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড,। পুনর্মুদ্রণ—২০০৮। পৃষ্ঠা-১০০।

১৮। আহমদ, খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা, কোচবিহারের ইতিহাস, কলকাতা, মডার্ন, বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড,। পুনর্মুদ্রণ—২০০৮। পৃষ্ঠা- ১০২।

১৯। আহমদ, খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা, কোচবিহারের ইতিহাস, কলকাতা, মডার্ন, বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড,। পুনর্মুদ্রণ—২০০৮। পৃষ্ঠা-১০৮।

২০। আহমদ, খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা, কোচবিহারের ইতিহাস, কলকাতা, মডার্ন, বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড,। পুনর্মুদ্রণ—২০০৮। পৃষ্ঠা-১১৪।

২১। তদেব, পৃষ্ঠা-১১৫।

২২। তদেব, পৃষ্ঠা-১১৯।

২৩। তদেব, পৃষ্ঠা-১৪৬।

২৪। দাস, বিশ্বনাথ, (মম্পা) সটীক রাজোপাখ্যান, কোচবিহারের প্রাচীন ইতিহাস, কলকাতা, দি সী বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ -২০১৪, পৃষ্ঠা-৯৭।

২৫। আহমদ, খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা, কোচবিহারের ইতিহাস, প্রথম খন্ড, কলকাতা, মডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ-২০০৮, পৃষ্ঠা-১৫৫।

২৬। রায়, স্বপনকুমার প্রাচীন কোচবিহারের আর্থ সামাজিক ইতিহাস, কলকাতা, বইওয়ালা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃষ্ঠা-৪৭।

২৭। তদেব, পৃষ্ঠা-৪৭, ৪৮।

২৮। আহমদ, খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা, কোচবিহারের ইতিহাস, প্রথম খন্ড, কলকাতা, মডান বুক এজেজন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ-২০০৮, পৃষ্ঠা-১৬৭, ১৬৮।

২৯। তদেব, পৃষ্ঠা-২২১।

৩০। দাস, বিশ্বনাথ, (সম্পা) সটীক রাজোপাখ্যান, কোচবিহারের প্রাচীন ইতিহাস, কলকাতা, দি সী বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ -২০১৪, পৃষ্ঠা-২১৯।

৩১। াস, বিশ্বনাথ, (সম্পা) সটীক রাজোপাখ্যান, কোচবিহারের প্রাচীন ইতিহাস, কলকাতা, দি সী বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ -২০১৪, পৃষ্ঠা-২১৩।

৩২। শীলশর্মা, অরুণকুমার, কোচবিহার রাজবাড়ির অন্দরমহল, কলকাতা, অণিমা প্রকাশণী, প্রথম সংস্করণ—১৪১৮। পৃষ্ঠা—৩০-৩২।

৩৩। শীলশর্মা, অরুণকুমার, কোচবিহার রাজবাড়ির অন্দরমহল, কলকাতা, অণিমা প্রকাশণী, প্রথম সংস্করণ—১৪১৮। পৃষ্ঠা—৫৭, ৫৮।

৩৪। শীলশর্মা, অরুণকুমার, কোচবিহার রাজবাড়ির অন্দরমহল, কলকাতা, অণিমা প্রকাশণী, প্রথম সংস্করণ—১৪১৮। পৃষ্ঠা—৭৩।

৩৫। রায়, স্বপনকুমার প্রাচীন কোচবিহারের আর্থ সামাজিক ইতিহাস, কলকাতা, বইওয়ালা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃষ্ঠা-১০৬।

৩৬। রায়, স্বপনকুমার, কোচবিহার রাজদরবারের সাহিত্যচর্চা; কলকাতা, বুকস্ ওয়ে, প্রথম প্রকাশ-২০১১, পৃষ্ঠা-১৮০।

কোচ রাজসভা ও বৈষ্ণব ধর্ম

মধ্যযুগীয় ভারতীয় সভ্যতায় ভক্তিধর্মের অভ্যুদয় ও তার বিপুল প্রসার ছিল ভারতের নানা প্রান্তের এক সাধারণ ও স্বতঃস্ফূর্ত সত্য। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যায় ভক্তিধর্মের নূতনতর এই প্রকাশ যার মূল কথা হল আরাধ্য পরম বস্তু শ্রীভগবান লীলাময়, প্রেমময় ও কৃপাময়। তাঁর কৃপার অধিকারী জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষ মাত্রেই। কেবল ব্রাহ্মণত্বে ভর করে উদাও মন্ত্রোচ্চারণের অধিকার নয়, ভক্তি ও প্রেমের উপচার নিয়ে যে কোন মানুষই তাঁর কাছে প্রার্থনার অধিকারী। এই উদার, মানবতাবাদী চিন্তাধারা অচিরেই সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। আধ্যাত্মিক উজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে মানবতার বীজমন্ত্রও মন্দ্রিত হয়। উত্তর ভারতে রামানন্দ ও তাঁর শিষ্য কবীর, পাঞ্জাব অঞ্চলে গুরু নানক, মহারাষ্ট্রে নামদেব, দক্ষিণ ভারতে বল্লভাচার্য গৌড় বঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেব এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে ধর্মাত্মা শঙকরদেব এই সময়ের উদ্বেলিত ভারতবঙ্গের এক একটি অভিঘাত।

মধ্যযুগের কামরূপ কামতা অঞ্চলের অনগ্রসর বহুবিচ্ছিন্ন সমাজ জীবনে ধর্মাত্মা শঙ্করদেবের প্রভাব অপরিসীম। সর্বভারতীয় ভক্তি আন্দোলনের মূল স্রোতের সঙ্গে প্রান্তীয় রাজ্য কামরূপের আত্মিক যোগবন্ধনটি গড়ে ওঠে শঙ্করদেবের সাধনা ও অধ্যাত্ম সাহিত্যের মধ্য দিয়ে। ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যামূর্তি ছিল শঙ্করদেবের উপাস্য। শ্রদ্ধাভক্তি, শরণাগতি ও নামধর্মের মহিমা প্রচারই তাঁর সাধন পূত জীবনের লক্ষ্য ছিল। তৎকালীন কামরূপ কামতা অঞ্চলে ভক্তিধর্ম প্রচার ও প্রসারের পাশাপাশি উন্নততর জীবনবোধ ও মানবধর্ম প্রসারেও তিনি মনোযোগী ছিলেন। ধর্মাত্মা শঙ্করদেবের অবদান সম্যক বুঝতে হলে ধর্মপ্রচারক রূপটির পাশাপাশি সমাজ সংগঠক হিসাবে তাঁর ভূমিকাটিরও সম্যক আলোচনা প্রয়োজন।

আসামের নওগাঁ থেকে ষোল মাইল দূরে অবস্থিত 'আলিপুখুরি' গ্রাম। এখানেই ১৪৬৩ খ্রিস্টাব্দে প্রসিদ্ধ ভুঁইয়া বংশে শঙ্করদেবের জন্ম। পিতার নাম কুসুমবর, মাতা সত্যসন্ধ্যা।'[১] দেবাদিদেবের ভক্ত ছিলেন বলে সত্যসন্ধ্যা সদ্যোজাত পুত্রের নাম রাখেন শঙ্কর। জন্মের কিছু দিনের মধ্যেই মাতার মৃত্যু হলে মাতৃহীন শঙ্করের লালন পালনের ভার নেন বৃদ্ধা পিতামহী। শংকরদেবের পূর্বপুরুষরা ছিলেন ধনী, সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী। তাঁরা মুখ্যত ছিলেন শিরোমণি ভুঁইয়া। ত্রয়োদশ শতকে মহারাজ বল্লালসেন কান্যকুব্জ থেকে যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের গৌড় দেশে নিয়ে আসেন তাঁদেরই কোনো উত্তরপুরুষ পরবর্তীকালে আসামে বসবাস করতে থাকেন। সেকালের ইতিহাসে এ ঘটনা বিরল নয়। যদিও যাঁদের পিতৃপুরুষের বাস উঠিয়ে রাজাজ্ঞায় অন্যত্র স্থিতিলাভ করতে হয় তাঁদের মনোভাব সম্পর্কে ইতিহাস নীরব।

মহামতি শঙ্করের পিতৃপুরুষের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর ভাগবত অনুবাদে—

"বরদয়া নামে গ্রাম শস্যে মৎস্যে অনুপাম
লোহিত্যের অতি অনুকূল।
সেই মহাগ্রামেশ্বর আছিলন্ত রাজধর
কায়স্থ কুল পদ্মফুল॥
তানে পুত্র সূর্য্যবর মহা বড় দেশধর
দানী মানী পরম বিশিষ্ট।

যার যশ এভো জলৈ জয়ন্ত মাধবদলৈ
দুই ভাই যাহার কনিষ্ঠ॥
তানে পুত্র কুলোদ্ধার ভৌমিক মধ্যত সার
প্রসিদ্ধ কুসুম নাম যার।
তানে সূত শিশুমতি কৃষ্ণপায়ে করি নতি
বিরচিল শঙ্করে পয়ার॥"[২]

বাল্যে পণ্ডিত মহেন্দ্র কন্দলীর চতুষ্পাঠীতে তাঁর বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ। ভক্তি প্রাণ মহেন্দ্র কন্দলী সংস্কৃত সাহিত্য ও ধর্মশাস্ত্রে পারঙ্গম ছিলেন। প্রিয় শিষ্য শঙ্করও সেই ভক্তিপ্রাণতার উত্তরাধীকার পেয়েছিলেন। কয়েক বছর পর চতুষ্পাধির পাঠ সমাপ্ত করে তিনি হিন্দুধর্মের উচ্চতর দর্শন ও তত্ত্বের আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসার প্রাবল্য হেতু তিনি নানা সাধক ও যোগীর সংস্পর্শে আসেন, কিছুকাল কঠোর যোগসাধনও করেন। কিন্তু একসময় তিনি উপলব্ধি করেন ভক্তিপ্রেম সাধনার দিকেই তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতা। অতঃপর কয়েকটি বছর চলল পুরাণ ভাগবতের নিবিড় পঠন। ভক্তিধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব ও তথ্য উদ্‌ঘাটনে তিনি হলেন যত্নবান।

শঙ্করদেব যখন বাইশ বছরের পূর্ণ যুবক তখন তিনি তীর্থে যাওয়ার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু পিতা কুসুমবরের তীব্র আপত্তিতে তাঁকে সেই পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হয় এবং বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়ে সংসার জীবনে প্রবেশ করতে হয়। পত্নী সূর্য্যবতী ছিলেন শঙ্করদেবের আদর্শপূত জীবনের যোগ্য সহায়িকা, কিন্তু মাত্র চার বছর পরেই শিশুকন্যা মনুকে রেখে তিনি পরলোক গমন করেন। কিছুকাল পরে পিতা কুসুমবরও পরলোক গমন করেন। উপর্যুপরি দুটি আঘাতে শঙ্করদেবের জীবনে বৈরাগ্য ও নির্বেদ জেগে ওঠে। কিন্তু নাবালিকা কন্যার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি গৃহীজীবনে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য হন। পরবর্তীকালে হরি নামে এক কায়স্থ যুবকের সঙ্গে মনুর বিবাহ হয়। এবং জয়ন্ত ও মাধব দলৈ নামে দুই বিশ্বস্ত সহচরের হাতে পরিবার ও বিষয় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়ে কিছু বিশ্বস্ত অনুগত সঙ্গী ও গুরু মাধব কন্দলীকে নিয়ে তিনি তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন।[৩] জগন্নাথ দর্শন ও নীলাচলে কিছুকাল অবস্থিতির পরে সঙ্গীরা ঘরে ফিরে যান শঙ্করদেবের ইচ্ছানুসারে, তিনি পরিভ্রমণে রত থাকেন বারো বছর। এই সময় তিনি যে সব তীর্থগুলি পরিভ্রমণ করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অযোধ্যা গয়া, কাশী, সীতাকুণ্ড, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরা, বদরিকাশ্রম প্রভৃতি। তিনি কেবল মন্দির বা বিগ্রহ দর্শন করেই কাটান নি, সেখানেই গিয়েছেন, দেবদর্শনের পাশাপাশি সেখানকার সাধক ও শাস্ত্রবিদ্‌দের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। বিশেষ করে প্রেমভক্তি আন্দোলনের কেন্দ্রগুলিতে গিয়ে সিদ্ধ মহাত্মাদের সান্নিধ্যে দীর্ঘকাল বাস করেছেন, তাঁর অনুসন্ধিৎসু ও তত্ত্বান্বেষী মন তৃপ্তিলাভ করেছে। এই সময়েই তিনি দীক্ষাগ্রহণ করেন। যদিও তিনি সন্ন্যাস গ্রহণেই সমুৎসুক ছিলেন, কিন্তু গুরুর নিষেধ অমান্য করে তিনি সন্ন্যাসী হতে পারলেন না। গৃহী জীবন যাপন করে মানুষের কল্যাণ সাধনার জন্য তিনি আদিষ্ট হলেন। দীর্ঘ বারো বছরের তীর্থ পরিব্রাজন সেরে তিনি যখন স্বগ্রামে ফিরে আসেন তখন তিনি এক উদীয়মান ধর্মনেতা। বৈষ্ণবীয় শাস্ত্রসমূহ, তত্ত্ব ও সাধনার দৃঢ়ভূমিতে আত্মপ্রতিষ্ঠ এক নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব সাধক।[৪]

প্রত্যাবর্তনের পর গুরুর আদেশ অনুযায়ী গৃহীধর্ম পালনের জন্য তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন। আলিপুখুরির বসবাস তুলে দিয়ে বরদোয়া গ্রামে নতুন ভবন স্থাপন করলেন এবং নামদীক্ষা দান শুরু করলেন ব্যাপক ভাবে। নবদীক্ষিত শিষ্যদের সহায়তায় বরদোয়াতে একটি "সত্র" বা মঠ নির্মিত হল। প্রতিষ্ঠিত হল একটি নামঘর, সেখানে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে ভক্তমাত্রেই সমবেত হয়ে নাম সংকীর্তন, ধর্ম মাহাত্ম্য শ্রবণে নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হতে পারত। বস্তুত আচার্য জীবনের এই প্রথম পর্যায় থেকেই শঙ্করের নতুন পরিচিতি ঘটে শঙ্করদেব নামে। তাঁর প্রচারিত ভক্তিধর্ম অভিহিত হয় "একশরণ নামধর্ম" হিসাবে। "একশরণ নামধর্ম" অনুযায়ী এক ও অদ্বিতীয় পরম পুরুষ

বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণই আরাধ্য দেবতা। বিষ্ণুর ঐশ্বর্য ভাবই তাঁদের আরাধ্য। নিজেদের শুদ্ধাভক্তি ও শরণাগতিকে বিশুদ্ধ রাখার জন্য বা বলা ভাল এককেন্দ্রিক রাখার জন্য ভক্তেরা কখনো অপর ইষ্ট বিগ্রহ বা দেবদেবীর উপাসনা করবেন না। এ কথা সহজেই অনুমেয় যে মধুর রসের উপাসনা বা রাধামাধব অর্চনার প্রচলন "একশরণ নামধর্ম" অনুমোদন করে না। ভক্ত সাধক ধৈর্য্য, নিষ্ঠা ও ত্যাগতিতিক্ষার মাধ্যমে ধীরে ধীরে অধ্যাত্ম উজ্জীবনের পথে অগ্রসর হবেন এবং সাধনমার্গের যাত্রী হবেন কৃষ্ণের ঐশ্বর্য মূর্তিকে সামনে রেখে এই হল একশরণ নাম ধর্মের" মূল লক্ষ্য।[৫]

ধীরে ধীরে শঙ্করদেব প্রবর্তিত ধর্মমত আকর্ষণ করতে থাকে ভক্তদের। একসময় তা সমকালীন পূর্ব এবং উত্তরপূর্ব ভারতের প্রধান ধর্ম আন্দোলনের রূপ নেয়। কিন্তু শঙ্করদেব চিন্তিত ছিলেন এই আন্দোলনের ভবিষ্যৎ রূপরেখা নিয়ে। তাঁর মনে হয়েছিল এই বিপুল জনজোয়ারকে সঠিক তত্ত্ব ও দর্শনের দিশা না দেখাতে পারলে এই উৎসাহ ও উদ্দীপনা কিছুদিনের মধ্যেই অল্পস্থায়ী ভাবালুতার মত মিলিয়ে যাবে। তাছাড়া এই নূতন ধর্মের বিরোধী শক্তিগুলিও ছিল সদাসক্রিয়, কারণ এই ধর্মমতে জাতিধর্ম নির্বিশেষে মানুষ মাত্রকেই গুরুত্ব দেওয়ায় তা ব্রাহ্মণ্য ধর্মাশ্রিত জাতিভেদ প্রথা ও আচারসর্বস্ব ধর্মানুষ্ঠান তথা ব্রাহ্মণ্যপ্রাধান্যকে খর্ব করে। এছাড়াও ছিল সমকালীন তন্ত্রসাধনার ধারক ও বাহকদের থেকে প্রবল প্রত্যাঘাতের সম্ভাবনা। একদিকে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র অশিক্ষিত মানুষের তন্ত্র-মন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, বৃক্ষ উপাসনা অন্যদিকে রাজা, রাজপুরুষ, পুরোহিত ও অন্যান্য উচ্চবর্ণ মানুষের তন্ত্রোপাসনা—এই দুয়ের মাঝে "একশরণ নামধর্ম" প্রকৃতপক্ষে সঙ্কটাপন্নই ছিল। প্রসঙ্গত, তৎকালীন আসামের তন্ত্রপীঠ ও তন্ত্রসাধনার পটভূমিকাটি একটু বিশদে আলোচনা করা যেতে পারে। বর্তমানে আসাম, যা সেকালে পরিচিত ছিল কামরূপ নামে, তার রাজধানী ছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর।[৬] প্রাচীনকাল থেকেই এখানে তন্ত্রধর্মের প্রচলন ছিল। রাজা ও রাজপুরুষেরা বা অন্যান্য উচ্চবর্ণের মানুষরা ছিলেন তন্ত্রমতের ধারক ও বাহক। নীলাচল বা কামগিরিতে স্থাপিত ছিল দেবী কামাখ্যার পীঠস্থান। এই শক্তিপীঠের তান্ত্রিক সাধনা ও আচার অনুষ্ঠানই উদ্বুদ্ধ করত তৎকালীন রাজশক্তিকে। আর এই তান্ত্রিক ধর্মাচরণের অন্যতম অঙ্গ ছিল জীবহত্যার বিভীষিকা, যাকে 'বলিদান' নামক ধর্মীয় আখ্যায় বৈধতা দেওয়া হত। কথিত আছে জগদীশ মিশ্র নামক এক ধর্মপ্রাণ বৈষ্ণবের কাছে তিনি পূর্ণাঙ্গ ভাগবত এবং তার ভাষ্য শ্রবণ করেন এবং ভাগবত সুধা আপামর আসামবাসীর জন্য অনুবাদে উদ্যোগী হন। বহুশাস্ত্রবিদ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভাষ্যসহ ভাগবত পাঠ করে অনুবাদ কার্য আরম্ভ করেন। বস্তুত তাঁর এই মহান অনুবাদকার্য একদিকে যেমন অসমীয়া ভক্তের কাছে ভক্তিধর্ম্মের দিগন্তের হাতছানি, তেমনই মধ্যযুগীয় অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূত্রপাতও ঘটে। নব্য বৈষ্ণবধর্মের প্রচার ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সূচনা হল বৈষ্ণবীয় শাস্ত্রসাধনার ও উন্মোচিত হল সুবিপুল অনুবাদ সাহিত্য ও বরগীত, অংকিয়া নাট প্রভৃতি সাহিত্য রচনার সম্ভাবনার সিংহ দুয়ার। বস্তুত এর পরে রচিত সুবিপুল অসমীয়া সাহিত্য ঋণী শঙ্করদেব ও তাঁর সুযোগ্য শিষ্য মাধবদেবের কাছে।

১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে শঙ্করদেব রাজনৈতিক গোলযোগের কারণে বরদোয়ার বাস্তুভিটা ত্যাগ করে প্রথমে গংমৌ, পরে স্থায়ীভাবে প্রায় চোদ্দ বছর ব্রহ্মপুত্র উপত্যাকার মাজুলি দ্বীপের ধূয়াহাটাতে বসবাস করতে থাকেন। এই সময় জাতিধর্ম নির্বিশেষে নিজের উদার ভক্তিধর্ম প্রচার করতে থাকেন।[৭] ধূয়াহাটা পর্বের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের সঙ্গে শাক্ত পণ্ডিত মাধবদেবের সাক্ষাৎ ও তর্কযুদ্ধের ঘটনা। সমগ্র অসমীয়া বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে এই সাক্ষাৎ ও তার ফলাফলের প্রভাব সুদূর প্রসারী, ফলে এই অংশটি বিশদ আলোচনার দাবি রাখে। লখিমপুর জেলার লেতেপুখুরি গ্রামে শাক্ত পণ্ডিত মাধবদেবের বসতবাড়ি। তন্ত্রশক্তির স্বাভাবিক ভাবেই একাধিপত্য ছিল কামাখ্যা পীঠের কারণে, মাধবদেবও ছিলেন গোঁড়া শাক্ত, তার উপর শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল দেশজোড়া। আপান মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমানে তিনি শঙ্করদেবের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ

হন। বলা বাহুল্য এই তর্কযুদ্ধ ঘিরে অসাধারণ উন্মাদনা তৈরি হয় কারণ নব্য বৈষ্ণব ধর্ম তখনও সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেনি। অন্যদিকে শাক্তধর্মমতের অনুগামী স্বয়ং রাজা ও ব্রাহ্মণ্য পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত সমাজপতিরা। শক্তিপূজা এবং বলিদান প্রথার স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন মাধবদেব—

"শংকরে বোলন্ত জানিলো তোমার
নাহি শাস্ত্র পরিচয়।
মহামূর্খ লোকে শাস্ত্রক নাজানি
অন্য দেব উপাসয়॥
শাস্ত্র জ্ঞান ভৈলে কিয় নজানিবা
কোন দেব শ্রেষ্ঠতর।
রামদাসে বোলে এহন্তে পণ্ডিত
শাস্ত্রক জানে বিস্তর॥
শুনিয়া মাধবে শ্লোকক পরিলা
করি আতি খরতর।
মহামায়া দেবী পরম ঈশ্বরী
পূজে তাংক চরাচর॥
ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্র চন্দ্রে ও অর্চ্চিছে
আনো দেব নিরন্তরে।
শত পদ্ম দিয়া বিস্তার অর্চ্চিছে
অন্ড স্রজিবাক তরে॥
প্রকৃতির অংশ দুর্গা গোসানীর
পূজা করি সর্বজন।
গৃহস্থ ধর্মত থাকি বলি দিলে
দোষ বোলা কি কারণ॥
শংকরে বোলন্ত শুনিয়ো মাধব
কথা কহো পূর্বাপর।
প্রকৃতি ও জানা ঈশ্বর-স্রজনা
ইটো কথা সারোত্তর॥
অনাদি অনন্ত দেব নিরঞ্জন
সনাতন দেব হরি।
হেন প্রকৃতিক কোটি কোটি শত
স্রজন্ত উপসংহরি॥

হেন শুনি হাসি শংকরে বোলন্ত
শুনিয়ো মাধব কথা।
কর্ম যোগ ভক্তি যিটো জনে করে
তাহার হেন অবস্থা॥

ভাগবতী ভক্তি যে জনে করায়
শুনিয়ো তার নির্ণয়।”
একে কৃষ্ণকে সে করে মাত্র পূজা
করিয়া দৃঢ় নিশ্চয়॥
হরিক পূজিলে দেবতা সবর
পরম সন্তোষ হয়।
এহি কথা জানি মহন্ত সকলে
কৃষ্ণক মাত্র পূজয়॥
কৃষ্ণক পূজিলে দেবতা সবর
পরম সন্তোষ হয়।
এহি কথা জানি মহন্ত সকলে
কৃষক মাত্র পূজয়॥
কৃষ্ণক পূজিলে যতেক দেবর
তৃপিতি হন্ত মনত।
বৃক্ষ মূলে যেন জল দান দিলে
তুষ্ট হয় শাখা যত॥
ভাল পুষ্প পত্রে পানি দিলে যেন
সন্তোষ নাহি বৃক্ষর।
তেন মতে জানা পৃথকে পূজিলে
সন্তোষ নাহি দেবর॥

মাধব শংকরে করিলা বিনোদ
জীব রাখিবার তরে॥
মাধবে রাখন্ত প্রবৃত্তি-মার্গক
শংকরে করে খণ্ডনে।
শ্লোকে শ্লোকে কন্ত দুহানে বুজন্ত
চাহি আছে সর্বজনে॥
ছয় সাত শ্লোক মাধবে পড়ন্ত
আতি খরতর করি।
এক শ্লোক পড়ি শ্রীমন্ত শংকরে
সভাকো নেন্ত সংহরি॥
এহিমতে দুয়ো জনে শ্লোকে বাদ
করিয়া এক প্রহর।
বাদে নোবারিলা মাধব রহিলা
নিদিয়া একো উত্তর॥

শংকরে সম্বোধি দুনাই বুলিলন্ত
শুনা কথা সারোত্তর।
দৈবকী-নন্দন বিনে আন দেব
নাহি নাহি শ্রেষ্ঠতর॥
নাম বিনে একো ধর্ম নাহি কয়
কহিলো করি নিশ্চয়।
শুনি মাধবর পুলকিত তনু
দ্রবিত ভৈলা হৃদয়॥
সিদ্ধান্ত লভিয়া আনন্দ মাধবে
সন্তোষ লভি মানত।
হুয়া অবনত পরি প্রণমিলা
শংকরর চরণত॥
শংকরে বোলন্ত কেনে প্রণামিলা
কহিয়ো আর কারণ।
মাধবে দুনাই গদ গদ বাক্যে
বুলিবে লৈলা বচন॥
ঝাত ঝাত করি শরীর শিহরে
সন্তোষ আতি মানত।
কৃতাঞ্জলি কার বুলিবে লাগিলা
হুয়া আতি অবনত॥
অসম্ভাবনাক আদি করি আনো
যতেক অজ্ঞানচয়।
অনেক জন্মর যত দুর্বাসনা
আনো গ্রন্থি সমস্তয়।
তোমার চরণে পশিলো শরণে
আজি ধরি কৃপাময়।
তবু বাক্যে মোর সমস্তে গুছিলা
ভৈলো আতি নিঃসংশয়॥
মাধবর ভাব দেখি আনন্দিত
মন ভৈলা শংকরর।
অনেক শাস্ত্রর যুক্তি আনি আরো
কহিলা কথা বিস্তর॥
অনন্তরে পাচে মাধবে উঠিয়া
প্রণামিয়া শংকরক।
রামদাস সমে আনন্দিত মনে
চলিয়া গৈল গৃহক॥

শংকর মাধবে করিলা বিনোদ
জীব তারিবাক প্রতি।
জানি বা না জানি পদে নিবন্ধিলো
রামানন্দ হীন মতি॥"[৮]

প্রাজ্ঞ পণ্ডিত মাধবদেব এরপর শঙ্করদেবের "একশরণ নামধর্ম" গ্রহণ করেন এবং মণ্ডলীভুক্ত হন। এরপর বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ও বৈষ্ণব সাহিত্য রচনার তিনি আত্মনিয়োগ করেন। গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ না করে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে তিনি নিরলস ধর্মপ্রচারে ব্রতী হন। উত্তরকালে বহু বৈষ্ণব সাধক মাধবদেবের এই বৈরাগ্যপূত জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্রহ্মচারী জীবন যাপন করে সত্রগুলির পরিচালক হিসাবে জীবনযাপন করেন। এঁরা "কেওয়ালিয়া" (চিরকুমার) বৈষ্ণব সাধক হিসাবে পরিচিত ছিলেন সমাজে। বলা বাহুল্য মাধবদেবের আগমনে এই নব্য বৈষ্ণবদের সাংগঠনিক শক্তি অনেক বৃদ্ধি পায়।

শঙ্করদেবের সঙ্গে বিরুদ্ধ শক্তির সংঘর্ষ ছিল অব্যাহত। রাজশক্তিও ক্রমাগত হয়ে পড়ছিল বিদ্বিষ্ট। ফলে ভক্তদের আবেদন ক্রমে শঙ্করদেব কোচরাজা নরনারায়ণের অধিকারাধীন কামরূপ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। কিন্তু তিনি অনুগামী সহ নিরাপদে ধুয়াহাটা পরিত্যাগ করলেও মাধবদেব ও শঙ্করদেবের জামাতা হরিকে সেনাদল বন্দী করে। সন্ন্যাসী বলে মাধবদেবকে মুক্তি দেওয়া হয়, কিন্তু হরি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।[৯] এরপর কামরূপ জেলার বরপেটা অঞ্চলে পটবৌসী গ্রামে শঙ্করদেব তাঁর নূতন নিবাস স্থাপন করেন। বহুতর ভক্ত বৈষ্ণবের সমাগম হওয়ায় একটি সত্র ও নামঘরও প্রতিষ্ঠিত হয় এখানে। কালক্রমে এই কেন্দ্র নব্য বৈষ্ণবধর্মের সাধনপীঠ ও প্রধান প্রচারকেন্দ্র হয়ে পড়ে।[১০] এই সময়ই একে একে দামোদর দেব, মাধবদেব, অনন্ত কন্দলী প্রমুখরা এই ধর্ম আন্দোলনে যোগ দেন। পরবর্তীকালে এঁরা এই ধর্ম আন্দোলনের অন্যতম শক্তি হিসাবে পরিচিত হন। বস্তুত, এই তিনজন ভক্ত সাধকই ব্রাহ্মণ ছিলেন। বরপেটা অঞ্চলে থাকাকালীন প্রবীণ আচার্য্য শঙ্করদেব আবার তীর্থদর্শনে যান শতাধিক ভক্তশিষ্য সহ।[১১] সমকালীন ভারতের বহু সাধন পীঠে বহু ধর্ম প্রচারকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তাঁর, এবং এভাবেই প্রান্ত ভারতের নবোদ্দীপিত ভক্তিচেতনার এই উদ্ভাস উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ধর্মীয় মানসলোকের সঙ্গে পরিচিত হয়। গড়ে ওঠে ঐক্যবন্ধন। ফিরে আসার পর শঙ্করদেব তাঁর মণ্ডলীতে সঞ্চারিত করেন নতুন উদ্দীপনা।

কামরূপ—অঞ্চলে প্রসার ঘটতে থাকা নব্য বৈষ্ণবধর্ম আবার সমস্যা ঘনিয়ে আনে। তৎকালীন কামতাপুর রাজসভার রাজন্য এবং পুরোহিত তন্ত্রের ধারক ও বাহকরা রাজার কাছে অভিযোগ জানালে রাজা নরনারায়ণের শঙ্করদেবকে রাজসভায় ডেকে পাঠান। কোচরাজের দরবারে শঙ্করদেব সমবেত শাক্ত পণ্ডিতদের তর্কে পরাস্ত করেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হন রাজা নরনারায়ণ। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করা এই নবপ্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায়ের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ হয়ে দেখা দিল। তন্ত্র ও শাক্ত মতবাদ অধ্যুষিত কামতাপুর রাজ্যেও বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার দেখা যায়। নরনারায়ণের রাজত্বকালেই রাজার ইচ্ছায় কোচবিহার নগরীর অনতি দূরে ভেলাডাঙায় একটি সত্র নির্মাণ করে দেওয়া হয় যাতে মহারাজা এবং তাঁর পরিবারবর্গ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের সান্নিধ্য পেতে পারেন, এবং রাজধানীতে ধর্মপ্রচার সহজসাধ্য হয়।[১২]

শঙ্করদেবের ভক্তি আন্দোলন ক্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় উত্তর পূর্ব ভারতের মাটিতে। শঙ্করদেব বিরচিত ভাগবত এই অঞ্চলের মানুষের জীবনে একাত্ম হয়ে পড়েছিল। এছাড়াও শঙ্করদেব রচনা করেন প্রচুর বরগীত, অঙ্কিরা নাট প্রভৃতি। তাঁর সুযোগ্য শিষ্য মাধবদেবও প্রচুর সাহিত্যকীর্তির রচয়িতা। এভাবেই গড়ে ওঠে মধ্যযুগের অসমীয়া সাহিত্য ভাণ্ডার। উঁচু তলার মানুষেরা নয়, সমাজের অন্ত্যজ, শূদ্র, অর্ধসভ্য পার্বত্য জনগোষ্ঠীর মানুষেরাই

ছিল নব্য বৈষ্ণবধর্মের মূল লক্ষ্য। কেবল আধ্যাত্মিক উন্নয়ন নয়, এই বঞ্চিত মানুষগুলির জন্য উন্নত সমাজজীবনই তাঁদের লক্ষ্য ছিল—"Sankaradeva and Madhavadeva did not work only for the spiritual uplift of the people, but they also fully appreciated and contributed amply towards growth and development of the socio-cuttural life of the Assamese people and the huamanity at large. The Assamese Vaishnavite literature, rich and varied, unique in style and language, is made up of the comprehensive literary and artistie genions of the authors. The literary heritage of this age comprises ptose, poctry, drama, songs, etc, with distinctive characters of their own. The holy songs traditionally said to be twelve seore in mumber, called the Bargits (great songs or noble mumbers)–indeed great works of art conspicuous by their composition, rhyme and melody with vishnu-krishna as their main there–Continue to attraet all and are sung by the cowherds in the field, the boatmen in the river, and the young and old alike in the houscholds. The bhaonas, sutradhari dances, Satriya danes, etc. are types by themcelues and are indecd symbolic im theis own way. amply clowuent of the creative gcnius and spiritual wisedom of Sankaradeva and his host of worthy devotees."[১৩]

ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ অনুসরণে তত্ত্ব, আখ্যান ও উপকথা অবলম্বন করে শঙ্করদেব ছোট বড় বহুতর কাব্য রচনা করেন, রচনা করেন বরগীত, ভাটিমা প্রভৃতি। এ প্রসঙ্গে শিষ্যপ্রধান মাধবদেবের নামও স্মরণীয়। বৈষ্ণব ধর্মের দুরূহ তত্ত্ব ব্যাখ্যার কাজটিও তিনি স্বাভাবিক ও সাবলীল ভাবে করেছিলেন। বস্তুত, একাধারে ধর্ম্মপ্রচারক, নাট্যকার, গায়ক, কবি এবং শিল্পী হিসাবে তিনি উত্তর-পূর্ব ভারতে আজও বন্দিত। ভাগবত অনুবাদ তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে ভাগবতের প্রথম, অষ্টম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ, ছাড়াও 'কীর্ত্তন ঘোষা', 'ভক্তি প্রদীপ', 'ভক্তিরত্নাকর', 'অজামিল উপাখ্যান', 'লীলামালা', 'নামমালিকা', 'চিহ্নযাত্রা', প্রভৃতি সন্ধান পাওয়া গেছে। ধর্মীয় উপাখ্যানকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য একদা শঙ্করদেব তাকে সহজবোধ্য নাটপালার রূপ দিয়েছিলেন তা সমকালীন পদকর্তা বা গ্রন্থকর্তাদের ভাষায় "অঙ্কিয়া নাট" বলে অভিহিত হত।[১৪] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়—"Ankia Nat is generic term im Assamese and means dramatic compositions in a single act depicting the artieles of Vaisnava faith It should be borne in mind thal Sankardeva himself called these dramatic compositions nat and nataka after the Sanskrit Teraninology. other tiltes used by the Vaishnava poets for this type of plays are yatra. nritya and anka.

Srimanta Sankardev originally wrote these dramas for the illiterate masses of Assan and the tribal population of Bengal and Bihar-and they were peformed in Satras (Socio Cullural and religions ceutnes) and Namghars (hall for congregational prayer) Sankardera's approach was all encompassing and his contribution in building a unifield social order was stupendous. He aimed to spread the message of Nco-Vaishavison to the masses through the medium of drama. What we call to day, Assamese Culture actnally standus on the foundation of Vaishnavite Culture of which "Ankia-Nat" is a colossns."[১৫]

কোচবিহারে অবস্থানকালীন তিনি "রামবিজয়" অঙ্কিয়া নাট রচনা করেন রাজভ্রাতা ও সেনাপতি শুক্লধবজের অনুরোধে। নাটকের নানা স্থানে তিনি এ কথা লিখেওছেন। যেমন—

"শ্রী শুক্লধবজ নৃপতি প্রধান॥
রামক বিজয় যে করাবত নাট।
মিলহু তাহেক বৈকুণ্ঠক বাট॥"[১৬] প্রভৃতি।

তাঁর রচিত অন্যান্য অঙ্কিয়া নাটগুলির মধ্যে কালীয় দমন নাট, কেলিগোপাল নাট, পত্নীপ্রসাদ নাট, পারিজাতহরণ নাট এবং রুক্মিণীকুমার নাট-এর সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে সেগুলি কোচবিহার রাজদরবারে বসে রচিত এমন তথ্যাদি পাওয়া যায় না। নাটগুলি মূলত ব্রজবুলি ভাষায় রচিত। স্বল্পদৈর্ঘ্যের একাঙ্ক নাটক হলেও সেগুলি সংস্কৃত নাট্যলক্ষণ বর্জিত নয়। তবে লক্ষ্যণীয় কিছু কিছু পার্থক্যও আছে। সংস্কৃত নাটকের মত সূত্রধার এখানে নাটক শুরু করিয়ে মঞ্চ থেকে সরে যান না, নাটকের শেষ পর্যন্ত তাঁর উপস্থিতি দেখা যায়। এই নাটগুলির ভাষা প্রাঞ্জল এবং একান্তই সহজ, যা সাধারণ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে। নাটগুলির ক্ষেত্রে ভাষা কাব্যের সালঙ্কারা রূপ থেকে নেমে এসেছে বাস্তব গদ্যের ভূমিতে। ফলে একাধারে বিষয়বস্তু সাধারণের বোধগম্য হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে মধ্যযুগীয় গদ্য ভাষার সাহিত্যিক নিদর্শন হয়ে উঠেছে সমৃদ্ধ তর। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় কিছু অংশ—

"সূত্র....আহে সভাসদ লোক, যে জগতক পরম পুরুষ পুরুষোত্তম সনাতন ব্রহ্মামহেশসেবিত চরণ পঙ্কজ নারায়ণ শ্রী শ্রীকৃষ্ণ উহি সভামধ্যে কালীয়দমন নাটলীলা যাত্রা কৌতুক করব, তাহে সাবধানে দেখহ, শুনহ, নিরন্তরে হরি বোল, হরি বোল।" —কালীয় দমন নাট

"হে কৃষ্ণ ওহি পারিজাতক গন্ধ তিনি পহরক পথ যাই। ওহি পারিজাত যাহেক গৃহে রহে ধন, জন, বিভব তাহেক ছাড়ায়ে নাহি। ওহি দেবদুর্লভ পারিজাত যে নারী ধারণ করে সে পুষ্পক মহিমায়ে পরম সৌভাগিনী হয়। ওঃ ওহি কুসুমক মহিমা কি কহব?"—পারিজাত হরণ নাট।

"মদনমঞ্জরী, আহে প্রাণসখি, তোহো রাজনন্দিনী। কি নিমিত্ত তোহো বারম্বার বিলাপ করহ প্রাণসখি। হামার শপথ তোমার পায়রে লাগোঁ। হামাক সত্বরে কথা কহ।" —রামবিজয় নাট।

যে সময় সাহিত্য মানেই পদ্যের আশ্রয় সেই যুগে লোকবোধ্য গদ্যরচিত এই সাহিত্য সম্ভার অনন্য উচ্চাতায় প্রতিষ্ঠাযোগ্য তা বলা বাহুল্য। শঙ্করদেবের অনুসরণে মাধবদেবও কিছু অঙ্কিয়ানাট রচনা করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য নাটগুলি হল 'চোরধরা নাট', 'অর্জ্জুন ভঞ্জন নাট', 'ভূমিলুটুয়া নাট', 'ভোজনব্যবহার নাট', 'কোত্রাখোলা নাট', 'পিপিড়াগুছুয়া নাট' ও 'রাসঝুমুর'। তবে এই রচনাসমূহের মধ্যে কোনগুলি কোচ রাজসভায় রচিত সে বিষয়ে নির্দিষ্ট ধারণা অসম্ভব। নাটগুলি ছাড়াও শঙ্করদেবের অন্যতম উল্লেখ্য সাহিত্যকীর্তি হল বরগীত ও ভটিমা। বরগীত বলতে বোঝায় কৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী আর ভটিমা হল ধরনের প্রশস্তিপদ। বরগীত প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য মন্তব্য হল—''Literally meaning 'great songs' the Bargeets are composed in a pleasantly artificial language called Brajavali or Brajabuli. They are truely great not only for the lofty heights of the contents centering on devotion to krishna and the exquisit literary crafts-manship of the linls but also for the excellence of the musical moulds in which they are cast In feel the Bargeets represent a distinelive school of musid which boasts of its own system of ragas and talas and a dtyle of presentalion peeuliar to itself so much so that many knowbgabk Bargeet enthusiasto see in them an independent system of Indian raga music which they would like is call the Kamrupi system as distinet from both the Hindustani and karnataka systems.''[১৭]

প্রাজ্ঞ পণ্ডিত শঙ্করদেবের রচনায় তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের ছাপ স্পষ্ট, কিন্তু কোথাও তা উচ্চকিত হয়ে নিজেকে প্রকাশ করে না। অতি সাবলীলভাবে তা ধর্মকথার মর্মার্থ প্রকাশ করত যা তৎকালীন কামরূপ ও কামতাপুরের পার্বত্য উপজাতি ও সাধারণ অশিক্ষিত জনসাধারণের কাছে পৌঁছাত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 'গুণমালা' কাব্যের দশাবতার বর্ণনা প্রসঙ্গ—

তুমি সুবৎসল পুরুষ নিশ্চল।
নাহি কিছু চল ভকত বৎসল॥ ২৩॥

তুমি অবতরি অসুর সংহরি।
সৃষ্টি আছা ধরি দেব শ্রীহরি॥ ২৪॥
অঘাসুর খালি মহা বলশালী।
দমিলাহা কালী তুমি বনমালী॥ ২৫॥
করি পরাভব খেদাইলা দানব।
ভকত বান্ধব তুমি সি মাধব॥ ২৬॥
করি অরিচ্ছেদ দৈত্য করি ভেদ।
খণ্ডিলাহা খেদ উদ্ধারিলা বেদ॥ ২৭॥
জগতক বশ্য করিলা অবশ্য।
ভৈলা মহামৎস্য ব্রহ্মার নমস্য॥ ২৮॥
তুমি মহাহংস আসি নিজ অংশ।
হুয়া যদুবংশ বধিলাহা কংস॥ ২৯॥
জগত নিঃশেষ সরাতো প্রবেশ।
ভৈলা হৃষিকেশ নজানি উদ্দেশ॥ ৩০॥
তুমি পীতাম্বর করি আড়ম্বর।
বধিলা সম্ভর প্রভু বিশ্বম্ভর॥ ৩১॥
তুমিসে অচ্যুত আনন্দে আপ্লুত।
উকত বহুত করিলা মুকুত॥ ৩২॥
ধরি মৎস্য কায় সত্যব্রত রায়।
প্রলয় অপার তারিলা লীলায়॥ ৩৩॥
কূর্ম কলেবর ধরিলা মন্দর।
মথিলা সাগর নভৈলা ভাগর॥ ৩৪॥
বরাহ শরীরি পৃথিবী উদ্ধারি।
হিরণ্যাক্ষ বীরি মারিলাহা ছিরি॥ ৩৫॥
নরসিংহ রূপু ভৈলা দিব্যবপু।
বধিলাহা রিপু হিরণ্যক শিপু॥ ৩৬॥
ভৈলা অদিতিত বামন উদিত।
মুরুতি ললিত বলিক ছলিত॥ ৩৭॥
জামদগ্নি রাম কাটি চামে চাম।
ক্ষত্রিয়র নাম নথৈলা সংগ্রাম॥ ৩৮॥
ভৈলা কৌশল্যাত শ্রীরাম জাত।
রাবণ বিদ্যাত করিল লঙ্কাত॥ ৩৯॥
রাম হলধর রোহিণী কুমার।
মারিলা ইতর দ্বিবিদ বানর॥ ৪০॥
বুদ্ধ রূপে ছন্ন করি বেদগণ।
মুহিলাহা মন তেজিয়া সজ্জন॥ ৪১॥

হুয়া কল্কী চণ্ড যতেক পাষণ্ড।
করি খণ্ড খণ্ড বিহিলাহা দণ্ড॥ ৪২॥
ধরি বারম্বার দল অবতার।
পৃথিবীর ভার খণ্ডিলা অপার॥ ৪৩॥
কৃষ্ণর কিঙ্করে রচিলা শঙ্করে।
হরি হরি নরে বোলা নিরন্তরে॥ ৪৪॥[১৮]

ঠিক কোন কোন কাব্য বা নাট শঙ্করদেব কোচরাজা নরনারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় রচনা করেন তা যথাযথ ভাবে নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু একথা ঠিক যে জীবনের শেষ পর্যায়ে অধিকাংশ সময়ই তিনি কামতাপুর ভেলাডাঙা সত্রে কাটান এবং পরবর্তী সময়ে মাধবদেব বা দামোদরদেবের মত কবি ও ধর্মপ্রচারকরা কোচরাজদরবারের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ছিলেন। ফলে বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্য প্রচার ও প্রসারে কোচ রাজসভার অবদান অনস্বীকার্য। মাধবদেবের রামায়ণ অনুবাদে কোচরাজ নরনারায়ণের পৃষ্ঠপোষণার কথা পাই—

"জয় জয় লক্ষ্মীনারায়ণ মহানৃপতির অগ্রগনি।
যাহার নির্ম্মল যশস্যাসকল ঢাকিল ইতো ধরণী॥
সর্বগুণাকর যাহার সোদর শুক্লধবজ মহামতি।
পৃথিবীত যেন রাম লখখন প্রক্ষাত দুয়ো সম্প্রতি॥"[১৯]

কামতাপুর অনতি দূরবর্তী ভেলাডাঙা সত্রেই ১৫৬৯ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের জীবনাবসান হয়।[২০] কিন্তু ভক্তি আন্দোলনের পুণ্যধারা আজও অব্যাহত। বস্তুত তাঁর হাত ধরেই তৎকালীন অহোম কামরূপ কামতাপুরে ঘটেছিল সামাজিক আন্দোলন যা মানুষকে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের অধিকার দিয়েছিল। ধর্মাদর্শগত ভাবে শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের "একশরণ-নামধর্ম" গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের পরিপন্থী, কারণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবের মত তাঁরা মধুর রসের সাধক নন, বরং তাঁরা দাস্যভাবের উপাসক। তাঁর রচনাতেও নানা স্থানে শঙ্করদেব নিজেকে "কিঙ্কর শঙ্কর" বলে অভিহিত করেছেন। যে সময় শঙ্করদেব তাঁর নামধর্মকে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন সেই সময় অহোম এবং কামতাপুর ছিল তান্ত্রিক ধর্মমতে আচ্ছন্ন এবং পুরোহিততন্ত্রের যাঁতাকলে পিষ্ট। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তথা শ্রী চৈতন্যের মতই তাঁকে বিরোধিতা সহ্য করতে হয়েছিল স্মার্ত পণ্ডিত তথা ব্রাহ্মণ সমাজপতিদের। তবুও জনজাগরণ ঠেকানো যায় নি। গৌড়বঙ্গের মতই সুদূর উত্তর পূর্ব ভারতেও বৈষ্ণব ধর্মের হাত ধরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জাতিভেদ নির্বিশেষ এক সমাজ যার চূড়ান্ত সাফল্য নিঃসন্দেহে শঙ্করদেবের শিষ্য দামোদরদেবের কাছে কোচ নৃপতি লক্ষ্মীনারায়ণের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষাগ্রহণ। রাজকীয় ধর্মবিষয়ক পৃষ্ঠপোষণার পাশাপাশি চলতে লাগল বৈষ্ণব সাহিত্য রচনার ধারা। আর এই নবজাগ্রত সাহিত্যধারার কেন্দ্রস্থিত শক্তি হয়ে উঠল তৎকালীন কামতাপুর রাজসভা। রচিত হল রামানন্দ দ্বিজ প্রণীত 'শ্রীগুরুচরিত', রামচরণ ঠাকুরের 'শঙ্করচরিত'। দামোদর দেব রচিত বরগীত, মাধবদেবের শিষ্য গোপাল আতা-রচিত 'শঙ্খচূড় বধ', 'মহিষাসুর বধ' প্রভৃতি। অনুদিত হতে লাগল রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ। স্মৃতি ও তন্ত্রের অন্ধকার অনুবর্তন ছেড়ে সমাজ নতুন চিন্তার অনুবর্তী হল। ফলতঃ নিঃসংশয়ে বলা যায় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে তৎকালীন কামতাপুর রাজসভার পৃষ্ঠপোষণা এবং শঙ্করদেব, মাধবদেব, দামোদরদেব প্রমুখ সন্তদের পরিচালনায় সত্রগুলি সমকালীন সাহিত্য, শিল্প, কৃষ্টি নির্ণয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল।

উল্লেখপঞ্জি ঃ

১। Barakakoti Dr Sanjib kr, Mahapurusha Srinanta Sankaradeva, Guwahati, BaniMandir, 2005, Pa-7.

২। শ্রমন্ত শঙ্করদের রচিত ভাগবত, প্রথম স্কমধ পুথি নং-১৩, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, কোচবিহার।

৩। রায়, শঙ্করনাথ ভারতের সাধক (১০ম খন্ড) কলকাতা, করুণা প্রকাশণী প্রথম প্রকাশ -১৩৭৭। পৃষ্ঠা-৭৯।

৪। তদের পৃষ্ঠা-৮১।

৫। Panikkar, K. Ayyappa, Medieval Indian Literature, An Anthology Surveys and Selections (Assamese, Bangali, Dogri) New Delhi, Sahitya A kademi, Reprinted 2115, Pg-10.

৬। আহমদ, খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা, কোচবিহারের ইতিহাস, প্রথম খন্ড, কলকাতা, মডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ-২০০৮, পৃষ্ঠা-১০।

৭। Barakakoti Dr Sanjib kr, Mahapurusha Srinanta Sankaradeva, Guwahati, BaniMandir, 2005, Pa-54, 56, 58-59.

৮। রামানন্দ দ্বিজ রচিত 'শ্রীগুরু চরিত', atributetsankaradeva.org manikanchan. pdf.

৯। Barakakoti Dr Sanjib kr, Mahapurusha Srinanta Sankaradeva, Guwahati, BaniMandir, 2005, Pa-74-75.

১০। Neog, Maheswar, Early History of the vaisnave Faith and Movement in Assam : Sankaradeva and His Times, Guwahati, LBS Publications. Reprint 2008, Pg 113-114.

১১। রায়, শঙ্করনাথ ভারতের সাধক (১০ম খন্ড) কলকাতা, করুণা প্রকাশণী প্রথম প্রকাশ -১৩৭৭। পৃষ্ঠা-১০২।

১২। আহমদ, খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা, কোচবিহারের ইতিহাস, প্রথম খন্ড, কলকাতা, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ-২০০৮, পৃষ্ঠা-৬৩।

১৩। Das, Kali Charan, An Approach to Assam Vaishnanism in the light of the upanishads, atributetsankaradeva.org approach. pdf.

১৪। কুন্ডু ড. মণীন্দ্রলাল, বাঙালির নাট্যচেতনার ক্রমবিকাশ, কলকাতা, সাহিত্যলোক, প্রথম প্রকাশ -২০০০, পৃষ্ঠা-১১৩-১১৪।

১৫। Bhattcharjee, Archana, Srimaanta Sankardevas Ankia-Nat : A new Dramatic Genre in Assamese Literatire, The cretarion : An International Journal in English, ISSN (0976–8165) Vol–II, Issue–III, Sept, 2011.

১৬। রায়, স্বপনকুমার, কোচবিহার রাজদরবারের সাহিত্য চর্চা, কলকাতা, বুকস্ওয়ে, প্রথম প্রকাশ-২০১১, পৃ. ১৮।

১৭। Dutta Birendranath Bargeet, Songs of Devotions, atributetosankaradeva.org Bargeet_songs_devotion.pdf

১৮। গুণমালা, atributetosankaradeva.org junamala pdf.

১৯। রায়, স্বপনকুমার প্রাচীন কোচবিহারের আর্থ সামাজিক ইতিহাস, কলকাতা, বইওয়ালা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃষ্ঠা-২৩।

২০। আহমদ, খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা, কোচবিহারের ইতিহাস, প্রথম খন্ড, কলকাতা, মডান বুক এজেজন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ-২০০৮, পৃষ্ঠা-৬৩। তিনি ঠাকুর আতা বিরচিত 'শ্রী শ্রী দেব দামোদর চরিত্র' থেকে উল্লেখ করেছেন—

"মধুপুরে সত্র পাতি তথাতে থাকিয়া।
বৈকুণ্ঠক গেলা নরদেহক রাখিয়া।"

কোচ রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় দরবারী সাহিত্য

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় কামতা—কোচবিহারে রাজসভাশ্রিত সাহিত্য এক স্বর্ণময় অধ্যায়। কিন্তু একথাও সত্য যে এই অধ্যায় এখনও পর্যন্ত তেমনভাবে আলোকিত হয় নি। এমনকি মধ্যযুগের সন্ধিক্ষণে জন্ম নেওয়া এই সাহিত্য সম্ভারের উজ্জ্বল এবং প্রাচীনতম অংশটি অসমীয়া সাহিত্যের আদিরূপ এবং অংশবিশেষ হিসাবে পরিগনিত হয়েছে। অসমীয়া সাহিত্যকাবন্দবা কামতা বা কোচ রাজদরবারের কবিদের, যেমন পীতাম্বর, অনন্তকন্দলী, মাধবকন্দলী, মানকর, দুর্গাবর বা শঙ্করদেব, মাধবদেবকে বেশ স্বাধীনভাবেই অসমীয়া সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেছেন। ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে অহোমরাজ স্বর্গনারায়ণের কাছে লেখা কামতা—কোচবিহারের মহারাজা নর নারায়ণের লেখা পত্রটি বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বলে পরিগণিত হলেও পরবর্তীকালে একই ভাষায় রচিত একই রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত সাহিত্যসাধনার যে ফল তা বাংলা সাহিত্য সম্ভারকে সমৃদ্ধ করার বদলে অসমীয়া সাহিত্যের গৌরব ও সমৃদ্ধির পরিচয় বহন করেছে। অধ্যাপক ডঃ শশীভূষন দাশগুপ্ত তাঁর "কুচবিহার রাজকীয় গ্রন্থাগারে বাঙলা পুথি "শীর্ষক প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন— উত্তর পূর্ব প্রত্যন্ত দেশে ষোড়শ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙলাভাষার যে প্রাদেশিক রূপ প্রচলিত ছিল সেই ভাষাই পাওয়া যাইবে এই গ্রন্থগুলিতে। সুতরাং বাঙলা ভাষার ইতিহাসেও এই পুথিগুলির ভাষা বিচারের প্রয়োজন রহিয়াছে।...আসলে আজকের দিনে আসামী ভাষা যেমন করিয়া বাঙলা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি স্বতন্ত্র ভাষার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত আসামী ঠিক তেমন করিয়া বাঙলার সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করে নাই। তাই অনেক সময়ে আসামের পশ্চিম দক্ষিণ প্রত্যন্তদেশের কবির ভাষায় এবং উপরিক্ত কবিগনের ভাষায় একটা স্পষ্ট পার্থক্যের ভেদরেখা টানা খুব সহজতর নহে।"[১] এই একই প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক আরও মন্তব্য করেছেন "উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে বাংলার সভ্যতা, শিক্ষা এবং সংস্কৃতি অনেকখানি কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠিয়াছে মহানগরী কলিকাতাকে অবলম্বন করিয়া, সাহিত্য সাধনাও তাই অনেকখানি কেন্দ্রীভূত। কিন্তু তিন শতক পূর্বের সাহিত্য সাধনা এরূপ কেন্দ্রীভূত ছিল না, বাঙলাদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় এবং সংস্কৃতিক কেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন স্থানে এই সাহিত্য সাধনা ভিন্ন রূপ লাভ করিয়াছে। বিভিন্ন কেন্দ্রের এই সাহিত্য সাধনার পরিচয় ভাল করিয়া না জানিলে সাহিত্যের সমগ্র রূপটির পরিচয়ও আমরা জানতে পারি না।"[২] ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে কোচবিহার রাজসরকারের আহ্বানে রাজকীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত বাংলা পুথির তালিকা প্রস্তুত করতে গিয়ে তিনি যে মন্তব্য করেন তা প্রনিধান যোগ্য "সেখানকার পুথিপত্র ঘাঁটিয়া যে কথাটা বিশেষ করিয়া মনে হইতেছিল তাহা এই যে, বাঙলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিবার বহু মালমসলাই এখন পর্যন্ত আমাদের হস্তগত হয় নাই, তাহা এখনও ছড়াইয়া রহিয়াছে বাঙলাদেশ আনাচে কানাচে। কিন্তু একথাও সত্যি যে তাঁর মূল্যবান মন্তব্যের পর বহু বছর পেরিয়ে এসে আজও কামতা—কোচবিহার রাজদরবারে সাহিত্যসাধনার স্বরূপ বা বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে আজও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পরাঙ্মুখ।

কামতা রাজ্যে কোচশাসন শুরু হয় ষোড়শ শতাব্দীতে। কিন্তু এই ভূ-খণ্ডে খেন রাজবংশের রাজত্বকালে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই উন্নততর সাংস্কৃতিক তথা সাহিত্যিক পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে। চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে কবি হেম সরস্বতী, হরিহর বিপ্র ও কবিরত্ন সরস্বতী নামে তিনজন কবির সংবাদ জানা যায়। এঁরা সলেই কামতারাজ দুর্লভ নারায়ণের সভাকবি ছিলেন। কবি হেমসরস্বতী তাঁর পৃষ্ঠপোষক ও প্রতিপালক রাজা

দুর্লভ নারায়ণের প্রশস্তি গেয়ে বামনপুরাণ অবলম্বনে 'প্রহলাদচরিত' কাব্য রচনা করেন।[৩] নরসিংহ পুরাণের হরগৌরী সংবাদ অংশটিও তিনি অনুবাদ করেন। এই কাব্যে আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে কবি বলেছেন রাজা দুর্লভনারায়ণের পাত্র পশুপতির চার পুত্র। তিনি সবার বড়। তাঁর নাম ছিল ধ্রুব, পরে হেমন্ত কবি নামে খ্যাত হন। হরগৌরীর পদসেবা করে হেমসরস্বতী নামে পরবর্তীকালে তিনি পরিচিত হন। তার জন্ম ব্রাহ্মণ পরিবারে। ধরলা তীরে একটি কালীমন্দির ছিল, সেখানে তিনি নিত্যপূজা করতেন।

"জাতে বৈসে কালী দেবী তাহান চরন সেবি
কহি হরগৌরী সম্বাদ"[৪]

কবি হরিহর বিপ্র এবং কবিরত্ন সরস্বতী একই সময়ে মহাভারতের বিভিন্ন অংশের অনুবাদ করেছিলেন। হরিহর বিপ্রের অশ্বমেধ পর্বের ভনিতা থেকে কবির আত্মপরিচয় পাওয়া যায় নিম্নলিখিতভাবে ঃ

জয় জয় নৃপতি দুর্লভ নারায়ণ রাজা
কামতাপুর ভৈলা বীরবর।
সপুত্র বান্ধবে জেবে সুখে রাজ্য করন্তক
জীবন্তক সহস্র বৎসর॥
তাহান রাজ্যত যত সাধুজন জনমত
অশ্বমেধ পদমধ্যে সার।
বিপ্র হরিহর কবি হরির চরণ সেবি
পদবন্ধে করিলা প্রচার॥[৫]

জৈমিনি ভারত অবলম্বনে রচিত হরিহর বিপ্রের 'লব কুশের যুদ্ধ' 'বভ্রুবাহনের যুদ্ধ' ও 'তাম্রধবজের যুদ্ধ' নামে তিনটি কাব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। কবিরত্ন সরস্বতী অনুবাদ করেছিলেন মহাভারতের 'দ্রোণপর্ব'। দ্রোণ পর্বে জয়দ্রথ বধের বর্ণনা অংশের ভণিতায় জানিয়েছেন ছোটশিলা গ্রামের ধর্ম চক্রপাণি শিকদারের পুত্র তিনি। দুর্লভনারায়ণের পুত্র ইন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে তিনি সভাকবি ছিলেন অনুমিত হয়। রাজা দুর্লভনারায়ণ এবং ইন্দ্রনারায়ণ 'পঞ্চ গৌড়েশ্বর' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন, দিনাজপুর থেকে দরং পর্যন্ত সুবিশাল ভূখণ্ড ছিল তাঁদের অধিকৃত। কামতা রাজদরবারে রুদ্রকন্দলী নামে আর একজন কবির সন্ধান পাওয়া যায়। ইনি মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচনা করেছিলেন "সাত্যকি প্রবেশ" কাব্য। সমকালে সর্বাধিক খ্যাতমান কবি হলেন মাধবকন্দলী। তিনি রামায়ণ রচনা করেছিলেন, যদিও সাতকাণ্ড রামায়ণ তিনি রচনা করেছিলেন কিনা তা নিয়ে মতভেদ আছে। তবে মাধবকন্দলীর রচনার ভণিতা অংশ থেকে জানা যায়—"সাতকাণ্ড রামায়ণ পদবন্ধে নিবন্ধিলোঁ' অথবা 'সাতকাণ্ড রামায়ণ বাল্মীকির কৃত, তার সার উদ্ধারিয়া বিচারি সম্মত'—তবে অরণ্যকাণ্ড থেকে লঙ্কাকাণ্ড, এই পাঁচটিরই সন্ধান পাওয়া যায়। কথিত আছে শঙ্করদেব 'উত্তরকাণ্ড' এবং মাধবদেব 'আদিকাণ্ড' রচনা করে মাধবকন্দলীর রচনাকে সম্পূর্ণতা দান করেন। মাধব কন্দলীর রচনায় কোন পৃষ্ঠপোষক রাজার উল্লেখ পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে কোচরাজা বিশ্বসিংহের সভাকবি দুর্গাবর তাঁর 'গীতিরামায়ণ' রচনাকালে মাধবকন্দলীর রচনা দ্বারা প্রভাবিত হন, মহারাজা নরনারায়ণের সভাকবি শঙ্করদের তাঁর রচনায় পূর্বসূরী কবি মাধবকন্দলীর সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন—

"পূর্ব কবি অপ্রমাদী মাধবকন্দলী আদি
বিরচিল পদে রামকথা।"[৬]

অথবা মাধবদেবের রচনায়—

"রামের চরিত্র বিরছি আছন্ত মহা মহা কবিজনে।
তা সম্বাক দেখি পদ করিবার স্বাদ হৈল মনে।"[৭]

মাধব কন্দলীর রচনার বারবার উল্লেখ বা অন্য কবিদের সঙ্গে তাঁর কবিস্তুতি প্রমাণ করে মাধব কন্দলীর জনপ্রিয়তার কথা। কবি মাধবকন্দলী তাঁর রচনায় বাল্মীকি রচিত মূল রামায়ণ অনুসরণ করেছিলেন, এবং আদি কবির রচনাকে লোক সাধারণের উপযুক্ত ভাষায় প্রকাশ করাই যে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তা তিনি রচনায় বারবার উল্লেখ করেছেন—

বাল্মীকি যে মহাঋষি রামায়ণ প্রকাশিল
সংসারত স্রজিল অমৃত।
তাক শুনি নরলোক কলিত সদগতি হোক
তাক শুনি হোবে কৃত্যকৃত॥
মাধব কন্দলী বিপ্রে তাহার চরণ স্মরি
করিলন্ত শ্লোকক উদ্ধার।[৮]

মূলে বাল্মীকি রামায়ণের কাহিনী আশ্রয় করলেও মাধবকন্দলী তাঁর রচনায় লৌকিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান জুড়ে দিয়েছেন। তাঁর কবিত্ব শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বসন্ত বর্ণনায়—

দেখা দেখা জানকি হরিষ করি মন।
ফলাফুল যুকুত বিবিধ তরুবন॥
জাইযুতি বকুল বন্দুলি কর্ণিকার।
কাঞ্চন তগর কন্দ শেফালি মন্দার॥
অশোক পলাশ ফুলি গৈল হিসাসিসি।
নাগেশ্বর চম্পক ফুলিল অহর্নিশি॥[৯]

মাধবকন্দলীকে রাজা দুর্লভনারায়ণের সভাকবি ধরে নিলে চতুর্দশ শতাব্দীতে এই রাজার রাজত্বকালে পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ—অনুবাদের এই ত্রিধারার অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।

এই খেন রাজবংশের শেষ রাজা নীলাম্বর ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে গৌড়েশ্বর হোসেন শাহের আক্রমণের কাছে নতি স্বীকার করেন। গৌড়েশ্বরের আক্রমণে কামতাপুর ধবংস হয়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই খেন রাও কোচদের একটি শাখা ছিল। হোসেন শাহ বিধবস্ত কামতায় কিছু সেনা রেখে গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করলে কামতার ভুইঞারা ধীরে ধীরে আবার মাথা তুলতে থাকেন। একসময় তাঁদের মিলিত আক্রমণে দানিয়েলের বাহিনী বিধবস্ত হয় এবং কামতায় মুসলিম শাসন স্থায়ী হওয়ার প্রবণতা তিরোহিত হয়। কিন্তু এরপর সেই ভুইঞাদের মধ্যে অন্তর্কলহ দেখা দেয়। সেই সুযোগে চিক্‌নার (বর্তমান গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত) জনৈক হরিয়া বা হরিদাস মণ্ডলের পুত্র বিশু বা বিশা শক্তিশালী কোচজাতির সহায়তায় অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে আত্মকলহে লিপ্ত ভুইঞাদের পরাস্ত করেন এবং একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বসিংহ নাম ধারণ করে সিংহাসনে বসেন। বিশ্বসিংহের রাজ্যভিষেকের কাল সম্বন্ধে নানা মতভেদ থাকলেও পঞ্চদশ শতকের শেষলগ্নে অথবা ষোড়শ শতাব্দীর সূচনায় কোচ[১০] রাজশক্তির উত্থান পূর্ব ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কারণ পরবর্তী প্রায় চার শতাধিক বছর ধরে গৌড়ের সেনাদলের আক্রমণ, আগ্রাসী মুঘল সাম্রাজ্য এবং প্রতিবেশী অহোম ভোট প্রভৃতি জনজাতির

আক্রমণের মুখোমুখি হলেও কোচ রাজশক্তি তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল—স্বাধীনভাবেই হোক বা করদমিত্র রাজ্য রূপেই হোক। কোচ নরপতিদের সুদীর্ঘ শাসনকালে রাজ্যটির নাম বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। বিশ্বসিংহের পূর্ববর্তীকাল থেকে তাঁর সময়কাল পর্যন্ত রাজ্যটি কামতা নামে পরিচিত ছিল। পরে কোচরাজ নরনারায়ণের আমল থেকে কামতা বিহার, বেহার, নিজবেহার ইত্যাদি নামে অভিহিত হতে থাকে। পাশাপাশি কামতা নামটিও টিকে ছিল, পর্যটক রাল্‌ফ ফিচ, স্টিফেন ক্যামিলা প্রমুখ বিদেশী পর্যটকদের রচনায় এই রাজ্যের নাম 'কোচ'। তারিখ-ই ফেরেস্তা, গ্রন্থে এই অঞ্চল কোচ বা কোচ হাজো বলে চিহ্নিত। অবশেষে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের এক ঘোষণাপত্রে রাজ্যের নাম 'কোচবিহার' বলে চিহ্নিত হওয়ায় যাবতীয় বিভ্রান্তির অবসান ঘটে।[১১] কোচবিহারের স্থানিক ইতিহাস বা রাজবংশের ইতিহাস কোনটাই পূর্ণতা পায় নি। কারণ নানা তথ্যসূত্রে নানা অসঙ্গতি দেখা যায়। কিন্তু তবুও এই রাজবংশের কিছু বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা যায়।

(ক) এই রাজবংশ নিতান্ত অনভিজাত 'জন' থেকে উদ্ভূত। মহারাজ বিশ্বসিংহ কোন গৌরবময় অতীতের কীর্তিপতাকা বহন করে সিংহাসনে বসেন নি। কিন্তু কৌমজীবন থেকে আগত এই রাজারা প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ্য সংস্কার মেনে চলেছেন। তীর্থকৃত্য, ভূমিদান, শিল্প-সাহিত্যচর্চা এসবও রাজবংশের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই চলে আসছে।

(খ) অনভিজাত গোষ্ঠীসম্ভূত হলেও এই রাজবংশ শৌর্যে, রাজনৈতিক চেতনায়, আভিজাত্যবোধে নিজেদের স্বাতন্ত্র ধরে রেখেছিল। মুঘল সম্রাট আকবর মহারাজ নরনারায়ণকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। অম্বররাজ মানসিংহ এই রাজপরিবারে সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। নেপাল রাজমহিষী রূপমতী ছিলেন এই রাজপরিবারের কন্যা, মহারাজ প্রাণনারায়ণের ভগ্নী। পরবর্তীকালে, বরোদা এবং জয়পুরের রাজপরিবারের সঙ্গেও বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারকও সমাজসংস্কারক ব্রহ্মানন্দের দুই কন্যার সঙ্গে কোচবিহার রাজপরিবারের বৈবাহিক সম্পর্ক এই রাজপরিবারের ধর্মীয় উদারতার ইঙ্গিত দেয়। ইউরোপীয় শিক্ষা সংস্কৃতির সঙ্গেও এই রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

(গ) সমকালীন ভারতের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিচার করলে কোচ রাজবংশের সামরিক কুশলতা ও রাজনৈতিক দক্ষতার কথা স্বীকার করতে হয়। মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তারের যুগে এবং গৌড়কেন্দ্রিক বাংলার সুলতানীর প্রতিষ্ঠার সময়েও কোচরাজা বিশ্বসিংহ ও পরবর্তীকালে নরনারায়ণ তাঁদের কুশলী সেনা পরিচালনায় গৌড়রাজের অধিকৃত বহু অঞ্চল দখল করেন এবং বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডের অধিকারী হন। পরবর্তীকালে জ্ঞাতিবিরোধ প্রায় মহামারীর আকার নেওয়ায় এই রাজবংশ আভ্যন্তরীণ গোলযোগে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে অধিকৃত ভূ-খণ্ডও অধিকারচ্যুত হয়ে যায়। কিন্তু সুদীর্ঘকাল মুসলিম শাসনের বাইরে থেকে রাজ্যটি স্বাধীন হিন্দু রাজ্য হিসাবে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। পরবর্তীকালে রাজবংশে একাধিক অকালমৃত্যু, রাজবংশের প্রতিনিধিদের রাজত্ব চালানো, উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদের বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি কারণে রাজ্যটি অস্তিত্বরক্ষার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ছত্রছায়ায় যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু করদ মিত্র রাজ্য হিসাবেও রাজ্যটি যথাসাধ্য স্বকীয়তা বজায় রেখেছিল।

কোচ রাজারা তাঁদের শাসনকালের সূচনালগ্নেই শিল্প-সাহিত্য চর্চায় জোর দিয়েছিলেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষণার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ভোগবতী ধারাকে অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত প্রজাপুঞ্জের গ্রহণোপযোগী ভাষায় ও ছন্দে অনুবাদ করে তাদের মধ্যে প্রবাহিত করা। তাই নানা পুরাণ, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি অনুবাদের প্রয়াস মহারাজা বিশ্বসিংহের রাজত্বকাল থেকেই লক্ষণীয়। পরবর্তীকালের শাসকবর্গও এই নীতির অনুসরণ থেকে সরে আসেন নি। বস্তুত রাজসভায় কবি ও সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতার রীতিটি আবহমান কাল ধরে বিরাজমান। রাজপ্রশস্তি বা "শাসন"গুলি রচনার জন্য এবং অবশ্যই রাজবংশের গৌরব কীর্তনের অভিপ্রায়েও

কবিদের পৃষ্ঠপোষণা করতেন। তবে কবিত্ব রস আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষাটিও বলবতী ছিল। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশই রচিত হয়েছে রাজ পৃষ্ঠপোষণায়। কোচ রাজসভাশ্রিত বাংলা সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। উদ্ধৃত করি আলোচকের স্মরণীয় উক্তি "রাজসভার অনেক কাব্যই রাজমনোরঞ্জন করতে গিয়ে কাল মনোরঞ্জন করতে পারে নি। রাজার ফরমায়েসে যে কাব্যের জন্ম, রাজসভার মনস্তুষ্টি যে কাব্যের ধর্ম, সেই কাব্যে অনেক ক্ষেত্রেই শিল্পীর স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ। কবির কল্পনা, রুচিবোধ যদি রাজরুচির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে তা অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর হতে বাধ্য। কিন্তু সুফল যে হয়নি তা নয়, রাজপৃষ্ঠপোষকতার নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে কাব্য ও সাহিত্যচর্চার অবকাশ ও অবসর সভাকবির রচনাকে অনেক ক্ষেত্রে সুফল প্রসূত করেছে।"[১২]

কামতা কোচবিহারের রাজদরবারে প্রধানত চর্চা হত ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, এবং রামায়ণ মহাভারত অনুবাদের। অন্যান্য রাজসভার মত এখানে রোমান্স ধর্মী রচনার পৃষ্ঠপোষণ দেখা যায় না। সচরাচর প্রেম বিরহ, যুদ্ধ বিগ্রহ নির্ভর রচনার প্রতি রাজন্যের পৃষ্ঠপোষকতার যে ঝোঁক দেখা যায় তা এখানে অনুপস্থিত। কোচ রাজদরবারে বিদ্যাপতি বা ভারতচন্দ্রের মত কোন কবি কাব্যসুরা পরিবেশনের সুযোগ পাননি। কবি পীতাম্বর কোচ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা বিশ্বসিংহের সভায় কাব্যরচনা করতেন। পীতাম্বরের মার্কণ্ডেয় পুরানের শুরুর দিকে গ্রন্থরচনার কারণ বর্ননাপ্রসঙ্গে কবি বলেছেন—

"একদিন সভামাঝে বসি যুবরাজ
মনে আলোচিয়া হেন কহিলন্ত কাজ॥
শুন সভাসদ জন আমার মনত।
আকুত হৈছে উপস্থিত জেন মত॥
সে কথা তোমাত আমি করি উদিরন।
না করিবা হেলা কথা শুন একমন॥
পুরানাদি শাস্ত্রে জেহি রহস্য আছয়।
পণ্ডিতে বুঝয় মাত্র অন্যে না বুঝয়॥
একারনে শ্লোক ভাঙ্গি সবে বুঝিবার।
নিজদেস ভাসাবন্দে রচিয়ো পয়ার॥"[১৩]

বলাহুল্য এটি কেবলমাত্র ভনিতা নয়। এখানে প্রকাশিত হয়েছে কোচ রাজপরিবারের সারস্বত সাধনা ও পৃষ্ঠপোষণার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। পুরাণাদি শাস্ত্রের যে অমৃতময় বানী ভাষার অলঙ্ঘ্য ব্যবধানহেতু সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছয় না, তা যাতে সবার বোধগম্য হয় তাই ছিল এই রাজকুলের ব্যাকুলতা। সাহিত্য সাধনায় পৃষ্ঠপোষকতা করার ক্ষেত্রে রাজার প্রশস্তি শোনার চেয়ে জনকল্যানমুখিনতাই এই রাজসভার দিক নির্দেশকের ভূমিকা পালন করেছিল। রাজবংশের প্রতিষ্ঠতা রাজা বিশ্বসিংহের মনোগত অভিপ্রায় কোচরাজাদের সুদীর্ঘ রাজত্বকালের প্রায় সব রাজার শাসনকালেই অনুসৃত হয়েছিল। কেবল পুরান, মহাভারত, রামায়ণের অনুবাদকর্মেই যাতে সীমাবদ্ধ না থাকে রাজসভার সাহিত্যভাণ্ডার, সেদিকে লক্ষ্য রেখে মহারাজা বিশ্বসিংহের পুত্র পরবর্তী মহারাজা নরনারায়ণ আজ্ঞা দিয়েছিলেন—

"শুনিয়ো পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য দ্বিজ।
করিয়োক রত্নমালা ব্যাকর্নর বীজ॥
শুনিয়ো শ্রীধর তুমি মোর বাক্য ধরা।
জৌতিষক ভঙ্গি তুমি সাধ্যখণ্ড করা॥

বকুল কায়স্থ তুমি ভাঙ্গা লীলাবতী।
অল্পতে বুজয় যেন কায়স্থ সম্প্রতি॥"[১৪]

কেবল রাজাদেশ দানের শুষ্কতার মধ্যেই নয়, রাজপণ্ডিতদের সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও তাঁরা ছিলেন অগ্রণী—

"পণ্ডিত সবক পাছে করিলা সম্মান।
ধনরত্ন বস্ত্র অলংকার দিলা দান॥[১৫]

মহারাজা নরনারায়নের রাজসভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রাম সরস্বতী তাঁর বনপর্বের ভনিতায় বলেছেন—

"আমাক করিলা আজ্ঞা পরম সাদরে।
ভারতর পদ তুমি করিয়োক সারে॥
আমাক ঘরত আছে ভাষ্যটীকা কত।
নিয়োক আপোন গৃহে দিলোহো সমস্ত॥
এই বুলি রাজা সবে বলধি যোরাই
পাঠাইলো পুস্তক সবে আমাসার ঠাঁই॥"[১৬]

রাজাপণ্ডিতদের সম্মান প্রদর্শনের বা ধন-বস্ত্র দানের পরিচয় রাজা বা ভূস্বামী সমাজে কোন অশ্রুতপূর্ব ঘটনা নয়। কিন্তু রাজগৃহের ভাষ্যটীকা কবির প্রয়োজনে কবিগৃহে পাঠানোর উদাহরণ নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। কোচ রাজ পরিবারের যে ঐকান্তিক আকুলতা বিশাল ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের সম্ভারকে "নিজদেস ভাসাবন্দে" প্রতিবিম্বিত করার, তা এই উদাহরণ গুলি বর্তমান যুগের কাছে তুলে ধরে। উত্তরসূরীরাও এই পথেই হেঁটেছেন, তাঁর পরিচয় পাওয়া যায় কবিদের রচিত নানা রাজা প্রশস্তি ও ভনিতায়। মহারাজ প্রাণনারায়ণের সভাকবি শ্রীনাথ পণ্ডিত রাজার উদারতা দৃষ্টে কাব্যমধ্যে উল্লেখ করেছেন।

"দরিদ্র জনার জেঞি বাঞ্ছা কল্পতরু।"[১৭]

রানী বা রাজমাতার প্রশস্তি দৃষ্টে মনে হয় রাজ অন্তঃপুরিকাদেরও বিশেষ ভূমিকা ছিল। মহারাজা শিবেন্দ্র নারায়নের মহিষী স্বয়ং কবি ছিলেন, তাঁর রচিত "বেহারোদন্ত" নারীদের সাহিত্য সাধনার ইতিহাসে প্রথম সারিতে। অন্যান্য রাজাদের মহিষীদেরও সাহিত্যসাধনার প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষণায় অবতীর্ণ হতে হতে দেখা যায়। রাজমহিষী কামেশ্বরী দেবীর উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হয়েছিল "রাজোপাখ্যান"—যা গদ্যে লেখা কোচবিহার রাজবংশের ইতিহাস। ফলে যুগে যুগে কবিদের লেখনীতে রাজদরবারের সহৃদয় পৃষ্ঠপোষণার ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। নরনারায়ণের সভাকবি শঙ্করদেব মহারাজ নরনারায়ণ বিষয়ে লিখেছেন—

"আপন নৃপবর ধর্ম্মযুধিষ্ঠির
বিচারত আপন সুজান।
কাব্য কবিত্ব শশধর পণ্ডিত
ধনুর্দ্ধর অর্জুন সমান॥
মানে দুর্য্যোধন আপন পুন্যজন
দানে কর্ম সমান।"[১৮]

মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকাল সভাসাহিত্যের ক্ষেত্রে এক সুবর্ণযুগ। কেবল নূতন রচনাই নয়, প্রাচীন সাহিত্যসম্ভারের উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণও এই সময় শুরু হয়। মহারাজ স্বয়ং সাহিত্যসাধনায় অগ্রণী ছিলেন। তাঁর

রচিত নানা কবিতা ও গান সাহিত্যরচিয়তা হিসাবে তাঁকে পরিচিতি ও খ্যাতি দিয়েছে। মহারাজা শিবেন্দ্র নারায়ণের রচিত কিছু দেবস্তুতি 'বেহারোদন্ত' কাব্যে উল্লিখিত। আধুনিকতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন আসে রাজপরিবারেও। এমনিতেই ইংরাজ সরকারের করদ মিত্র রাজ্য হিসাবে ব্রিটিশশাসনের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাজপরিবারে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসার ঘটিয়েছিল। পরবর্তীকালে ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের কন্যা সুনীতি দেবীর হাত ধরে নারীশিক্ষা ও স্বাতন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটে, যদিও মহারানী বৃন্দেশ্বরী দেবী ও মহারানী কামেশ্বরী দেবীর আমলেই মেয়েদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ দেখা যায়। আধুনিকতার আলোকপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রণ যন্ত্রের ব্যবহারের সুবিধালাভের ফলে কোচবিহার ও সন্নিহিত অঞ্চলে সাহিত্যভাবনার প্রসার ঘটে। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে কমিশনার কর্নেল হট্‌ন্ কোচবিহার রাজ্যে মুদ্রণ যন্ত্রের স্থাপন অনুমোদন করেন। কলকাতার মেসার্স ওয়াইম্যান ব্রাদার্স এর কাছ থেকে—একটি মুদ্রণযন্ত্র এবং কিছু টাইপ ২৫০০ টাকা ব্যয়ে কেনা হয়।[১৯] এছাড়া ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণ কর্তৃক ক্রীত একটি মুদ্রণযন্ত্র ব্যবহারের অভাবে প্রায় অকেজো অবস্থায় ছিল। পরবর্তীকালে দুটি মুদ্রণ যন্ত্রই ব্যবহার হতে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে কাকিনার রাজা শম্ভুচন্দ্র রায়চৌধুরীর মুদ্রণযন্ত্র থেকে ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয় রাজমাতা[২০] বৃন্দেশ্বরী দেবী রচিত 'বেহারোদন্ত'। ফলে মুদ্রনযন্ত্র স্থাপনের উৎসাহ সুশিক্ষিত রানীদেরও যে যথেষ্ট পরিমানে ছিল তা সহজেই বোঝা যায়। পরবর্তীকালে মহারানী সুনীতিদেবীর হাত ধরে নারীশিক্ষা ও সাহিত্যসংস্কৃতির জগতে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। রাজকীয় নানা নথিপত্রের মুদ্রণের পাশাপাশি মুদ্রিত হতে থাকে রাজসভার পুস্তকালয়ের পুস্তক তালিকা, কুলশাস্ত্রদীপিকা' 'সুকথা', 'পল্লীপ্রকাশ' প্রভৃতি নামের সাময়িক পত্র পত্রিকা, আইন সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী এবং অবশ্যই রাজঅন্তঃপুর ও রাজপৃষ্ঠপোষণায় রচিত সাহিত্যকর্ম। রাজপৃষ্ঠপোষণায় কবিদের সাহিত্যকীর্তি ছাড়াও রাজঅন্তঃপুরের সাহিত্যচর্চার ঈর্ষনীয় অগ্রগতি ঘটে মহারাজা ভিক্টর নিত্যেন্দ্র নারায়ণের পত্নী নিরুপমা দেবীর আগমনে। 'পরিচারিকা' পত্রিকাটির নবপর্যায়ে প্রকাশের ভার নেন তিনি;এবং পত্রিকাটি বিষয়গৌরবে খুব দ্রুত কলকাতাকেন্দ্রিক সাহিত্যপত্রিকা বিশেষত 'সাধনা' বা 'ভারতী'র সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পা মেলাতে থাকে। নিরুপমা দেবী ঠাকুর পরিবারের এবং বিশেষভাবে বলা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্নেহধন্য সাহিত্যিক সমাজের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁরই অনুরোধে বহু যশস্বরি সাহিত্যিক 'পরিচারিকা' পত্রিকায় লিখতেন। এভাবেই ধীরে ধীরে রাজপৃষ্ঠপোষণায় সাহিত্যচর্চা পরিবর্তন করতে থাকে তার অভিমুখ। মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ মূলত ইংরাজী ভাষাতে সাহিত্যরচনা করেছিলেন। রচনা সৌকর্যে এবং ভাষার ব্যবহারে তিনি রোমাণ্টিক ইংরাজী সাহিত্যধারার পক্ষপাতী। মহারাণী ইন্দিরা দেবীকে লেখা কবিতায় বা অন্যত্রও তাঁর এই রচনাশৈলী চোখে পড়ে।[২১] তবে কোচ রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষণার প্রসঙ্গটি উঠলে বা সাহিত্য-সংস্কৃতির চূড়ান্ত বিকাশের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলে মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকাল সুবর্ণযুগ বলে মনে হয়;কারণ নতুন মৌলিক রচনা, প্রাচীন রচনাসমূহের সংগ্রহকরণ এবং প্রাপ্ত প্রাচীন পুথির সংরক্ষণ—এই ত্রিবেণী সঙ্গমে দাঁড়িয়ে এই সময়কে কোচরাজবংশের শাসনাধীন উজ্জ্বলতম অধ্যায় বলা যায়।[২২] কোচ নরপতিদের প্রত্যেকের রাজত্বকাল সম্পর্কে আলাদাভাবে আলোচনা করলে এবিষয়ে ধারণা স্পষ্ট হতে পারে।

প্রসঙ্গত কোচরাজবংশ-পূর্ববর্তী সাহিত্য সাধনার ধারা

কামতা রাজ্যে কোচশাসন শুরু হয় ষোড়শ শতাব্দীতে। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ বা চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকেই এই অঞ্চলের শাসনকর্তা খেন রাজবংশের শাসনকালেই সাহিত্যসাধনার পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে। চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে হেম সরস্বতী, হরিহর বিপ্র ও কবিরত্ন সরস্বতীর কবিখ্যাতি এই অঞ্চ লের সাহিত্য সাধনার ইতিহাসকে প্রমাণ করে। পরবর্তীকালে সুদীর্ঘস্থায়ী কোচরাজবংশ এই ঐতিহ্যকে কেবল বহমান রাখেন

তাই নয়, তাকে নানা পত্রপুষ্পপল্লবে শোভমান করে তোলেন। কামতারাজ দুর্লভনারায়ণের সভায় কবি খ্যাতি ছিল হেম সরস্বতী, হরিহর বিপ্র ও কবিরত্ন সরস্বতীর। হেম সরস্বতী তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজা দুর্লভনারায়ণের প্রশস্তি করেন তাঁর 'প্রহলাদচরিত' কাব্যে। কবিরত্ন সরস্বতীও খ্যাতিমান কবি ছিলেন।[২৩] মহাভারতের বিভিন্ন অংশের অনুবাদ তাঁর কীর্তি। হরিহর বিপ্র রচিত 'লব কুশের যুদ্ধ', 'বভ্রুবাহনের যুদ্ধ' ও 'তাম্রধবজের যুদ্ধ' নামে তিনটি কাব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। কবিরত্ন সরস্বতীর ভনিতায় সন্ধান পাওয়া যায় মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বের অনুবাদের।[২৪] এঁদের সম্বন্ধে যতটুকু বিশদভাবে জানা গেছে তার সম্যক পরিচয় অধ্যায়ের শুরুতেই আছে। কোচ রাজবংশের বহুমুখী সাহিত্যসমৃদ্ধির পৃষ্ঠপোষণার নান্দীমুখ হিসাবে তথ্যগুলির পুনরুল্লেখ ঘটল।

কোচ রাজসভার পৃষ্ঠপোষণায় সাহিত্যচর্চার বিবরণ

কোচ রাজবংশের শাসনের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সাহিত্য সাধনার ইতিহাসটিও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কারণ শাসনের উষালগ্ন থেকেই যাবতীয় রাজনৈতিক অস্থিরতা বা স্বাভাবিক দোদুল্যমানতা সত্ত্বেও কোচ রাজারা ছিলেন সাহিত্য পৃষ্ঠপোষণায় উন্মুখ। এ কথা দুর্ভাগ্যজনকভাবে সত্য যে রাজঅনুগ্রহ পুষ্ট সাহিত্য সম্ভারের অধিকাংশ যথাযথ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের অভাবে হারিয়ে গেছে। আবার নির্দ্দিষ্ট এই ভৌগোলিক সীমায় রচিত বেশ কিছু সাহিত্য সম্ভার যথাযথ পর্যালোচনার অভাবে বাংলা সাহিত্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে নি। বরং তারা মধ্যযুগীয় অসমীয়া সাহিত্যের সংখ্যাগত এবং বৈচিত্র্যগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করছে। এ কথা সত্যি মধ্যযুগীয় বাংলা ও অসমীয়া ভাষার প্রভেদ প্রায় নেই, আর সীমান্তবর্তী এই ভূখণ্ডে আসাম ও বাংলার দুই অঞ্চলের ভাষাই নদীর একূল ওকূলের মত সমভাবে অবস্থিত। কিন্তু এটাও ঠিক যে সুবিপুল মধ্যযুগীয় সাহিত্য সাধনার এক বিশাল অংশ আজও লাল শালুতে বন্দী। বিশেষজ্ঞদের সুচিন্তিত মতামতের অপেক্ষায় যে অপেক্ষমান মধ্যযুগীয় অনুবাদ সাহিত্যের এক অনালোকিত অধ্যায়, তা বলা বাহুল্য।

কোচ শাসনাধীন কামতা সাহিত্যের প্রধান ধারাটি হল অনুবাদ সাহিত্য। সংস্কৃত রস সাহিত্যের অনুশীলন এবং পুরাণাদির অনুবাদই হচ্ছে এখনকার মুখ্য সাহিত্য কর্ম। মঙ্গলকাব্য রচনার ধারা এখানে প্রায় দেখাই যায় না। কোচ রাজসভার প্রথম পর্বে মনকর এবং দুর্গাবর নামে দুজন কবি মনসামঙ্গল রচনা করেন। কিন্তু কোচ রাজসভার সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলকাব্য রচনার ধারাও বিলুপ্ত হয়ে যায়। সম্ভবত তুর্কী আক্রমনের পরবর্তী অন্ধকার সময় সুদূর কামতায় তেমন করে জাঁকিয়ে বসতে পারে নি। ফলে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে যে মিলন আকুতি, (যা কিনা উচ্চবর্ণের আত্মরক্ষার তাগিদও বটে) যার হাত ধরে অনার্য দেবদেবীরা আর্য উপাসনার মূল ধারার সঙ্গে সম্পর্কিত হন-তেমন কোন অনুরূপ পরিস্থিতির সঙ্গে কামতা কামরূপ রাজত্বের পরিচয় ঘটে নি। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের যে চারটি মুখ্য ধারার সঙ্গে সাহিত্যের ইতিহাসের পাতায় আমাদের পরিচয়, সেগুলি মূলত অনুবাদ সাহিত্যের ধারা, মঙ্গলকাব্যের ধারা, বৈষ্ণব পদ সাহিত্য রচনার ধারা, সাধন সঙ্গীতের (চর্যাপদ, বৈষ্ণব সহজিয়া পদ, বাউল গান, শাক্ত গীতি প্রভৃতি) ধারা। কোচ শাসনাধীন কামতা সাহিত্যধারার প্রথম ও প্রধান মনোযোগ ছিল অনুবাদ সাহিত্যের প্রতি। আশ্চর্যজনক ভাবে মঙ্গলকাব্য রচনার এই উর্বর ক্ষেত্র কামতা বা পশ্চিম কামরূপ, সেখানে বিভিন্ন আদিম কৌম মানুষের বসবাস, যারা আর্যপ্রভাবাধীনে আসার পরেও নিজ ধর্মের উপাস্য দেব-দেবী, আচার অনুষ্ঠান পুরোপুরি বর্জন করে নি। পূর্বোত্তর ভারতে সুপ্রসিদ্ধ কামাখ্যা দেবীর উপাসনা এই অঞ্চলে শাক্ত উপাসনার প্রতিষ্ঠাকেই বলবতী করে। অরণ্য সঙ্কুল, হিংস্র পশু ও বিষাক্ত সরীসৃপ অধ্যুষিত এই অংশে নানা অরণ্যচারী কোমগুলির মধ্যে কোচরাজ্যে শিবের মহাত্ম্য ছিল সমধিক, আবার দেবী বিষহরিও ছিলেন গৃহদেবী রূপে পুজিতা। কিরাত, কোচ, রাভা, গারো, মেচ প্রভৃতি কোমগুলি আবার মাতৃতান্ত্রিক। তাঁদের আদিম রীতিনীতি,

আচার-বিশ্বাস, ভয়-সন্দেহ প্রভৃতি ধারনার উপর ভিত্তি করে মঙ্গল কাব্যধারার সম্ভার গড়ে ওঠার কথা। কিন্তু কোচ রাজসভাশ্রিত সাহিত্য ধারায় এই ধারাটি অনুর্বর থেকে গেছে। পাশাপাশি উল্লেখ করার মত বিষয় হল বৈষ্ণব পদাবলী বা শাক্ত পদাবলী ধরনের রচনাধারার অনস্তিত্ব। যেখানে মহামতি শঙ্করদেবের অনুপ্রেরণার বৈষ্ণব ধর্ম রাজধর্ম হিসাবে স্বীকৃত, সেখানে বৈষ্ণব, সাহিত্যধারা মূলত থেমে গেছে ভাগবত অনুবাদ ও বিষ্ণু বিষয়ক পুরাণ অনুবাদের সীমাতেই। বিক্ষিপ্তভাবে গীতগোবিন্দ বা চৈতন্য ভাগবত অনুলেখনের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে মৌলিক বৈশিষ্ট্যের তুলনায় অনুবাদ সাহিত্যের প্রাধান্যই এই রাজসভাশ্রিত সাহিত্যের অন্যতম বিশেষত্ব। তবে এই বিশেষত্বের কিছু কারণ অনুমান করা যেতেই পারে। অনুমিত কারণের প্রথম এবং প্রধান হিসাবে প্রথমেই যে কথা বলা যায়, তা হল—প্রধানত রাজসভাকে কেন্দ্র করে এখনকার সাহিত্য বিকাশ লাভ করেছিল। রাজরুচি ও রাজঅনুগ্রহই এখানকার সাহিত্যরুচির নিয়ামক। কোচ রাজারা কৌম রাজবংশ, কিন্তু ব্রাহ্মণ্য আচার অনুষ্ঠান, স্মৃতি শাস্ত্রাদির প্রতি তাঁদের আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত। ফলে নিজস্ব কৌম সংস্কৃতির পরিবর্তে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করতেন তাঁরা। তাছাড়া এই ভূমিখণ্ডে প্রচুর জনজাতির বাস ছিল। তাদের আচার আচরণ কৃষ্টিগত বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য সাধন করতে এই আর্যায়ন খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। আর এই ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি-শাস্ত্র অনুশীলনের মধ্যে নিয়েই সম্ভবত এই রাজবংশ নিজেদের স্বাতন্ত্রবিধান করতে চেয়েছিলেন। এছাড়া যেহেতু তুর্কী আক্রমণের অভিঘাত তেমন করে ছাপ ফেলতে পারে নি এখনকার জনজীবনে তাই ব্রাহ্মণ্য ও অব্রাহ্মণ্য সংস্কারের মধ্যকার সেতুবন্ধন (যার লিখিত রূপ হল মঙ্গলকাব্য) তেমনভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠেনি। এখনকার আদি দেবদেবীরাপুরাণের দেবদেবীর পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেন নি এই একই কারণে। জল্পেশ্বর এবং বানেশ্বর শিব, দেবী গোসানী, জয়ন্তীর মহাকাল সব বর্ণের মানুষের পুজো পেলেও মৌলিক ও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সংশ্লেষ ঘটেনি। তাছাড়া যেহেতু কোচ রাজবংশ সুদীর্ঘকাল নিরবিচ্ছিন্নভাবে শাসন করছে, তাই রাষ্ট্রশক্তির পোষণে পিষ্ট বা নৈরাজ্য মথিত হতাশা, উপপ্লব ইত্যাদির মুখোমুখী এই অঞ্চলের মানুষ প্রায় কখনোই হয় নি। রাজশক্তির অন্তর্নিহিত কলহ, গুপ্তহত্যা রাজ্যের সাধারন মানুষকে কদাচিৎ বিক্ষুব্ধ করেছে। মূলত যে ধরনের বিক্ষোভ থেকে মঙ্গলকাব্য রচনার পটভূমি তৈরি হতে পারে, তা এক্ষেত্রে অনুপস্থিত ছিল। আর দ্বিতীয়ত, সুকবিবল্লভ নারায়দেবের মনসামঙ্গল কাব্য বা পদ্মাপুরান কামরূপ-কামতায় অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করে। ফলে মঙ্গলকাব্যের যে ধারাটির সর্বাপেক্ষা বিকাশের সম্ভবনা ছিল, সেই মনসামঙ্গল নতুন করে রচনার আর প্রয়োজন বা উৎসাহ দেখা যায় না।

বৈষ্ণব পদাবলী প্রসঙ্গেও একই কথা বক্তব্য। প্রত্যন্ত বাংলার এই রাজসভায় ভাগবতের অনুবাদ এবং চর্চা অনেক বেশিদিন ধরে চলেছে। ষোড়শ শতকে শঙ্করদেব স্বয়ং ভাগবত ধর্ম প্রচারে, ভাগবত অনুবাদে, ভাগবতাশ্রয়ী বিভিন্ন সাহিত্যকীর্তি রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি এবং তার শিষ্যরা এই অঞ্চলে ভাগবতের ভাবধারা সিঞ্চনে ব্রতী হয়েছিলেন। গৌড় বাংলার বৈষ্ণব আখড়ার মত এই অঞ্চলেও বৈষ্ণবদের নানা সত্র গড়ে ওঠে। অনেক ভাগবতাশ্রিত রচনার কেন্দ্র এগুলি। সঙ্গীতের রাগ-রাগিণী-তাল-লয় এবং 'মৈথিলী' ও অবহট্‌ঠের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় থাকলেও এখানে পদাবলী সাহিত্যের ধারা সৃষ্টি হয় নি। কবিরা অনেকেই প্রশংসনীয় কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন শঙ্করদেব ও মাধবদেব কিছু পদ লিখলেও পরবর্তী কবিরা উত্তরকালে এবিষয়ে আর কিছু বিশেষ লেখেন নি। বৈষ্ণব পদাবলীর এই ক্ষীণতার মূল কারণ হয়তো শঙ্করদেবের ধর্মাদর্শে কৃষ্ণ 'গোপিশতকেলিকার' রাধা প্রিয় নন। তিনি ভাগবতাশ্রিত ঐশ্বর্যমূর্তি। ফলে তাঁর ধর্মভাবনা আত্মনিবেদনমূলক হলেও তা গোপবধুদের আত্মনিবেদনের মত মধুর নয়। প্রেম ও ভক্তি এখানে একে অপরের কণ্ঠলগ্ন। কিন্তু শঙ্করদেব আরাধিত কৃষ্ণকে তো শুধু ভালোবাসলে হবে না, তাঁর ঐশ্বর্যময় রূপটি সম্পর্কে সঠিক অবহিত হতে হবে। তবে যথাযথ ভক্তি জাগবে। এই জ্ঞানমার্গে বিচরণ ব্যক্তিগত ঈশ্বরভাবনার বিষয় হতে পারে, ভক্তের আধ্যাত্মিক অনুবিক্ষণকে তৃপ্ত

করতে পারে, কিন্তু কাব্যের অবুঝ রসপিপাসা মেটাবে কি করে? দ্বিতীয়ত, এ ধারণাও সত্য হতে পারে যে শঙ্করদেব ও এক-দুজন অনুরাগী কবিকে বাদ দিলে ভক্তি ও জ্ঞানযোগের এই মিশ্র অনুভূতিকে স্বাদু মৈথিলীতে পরিবেশন করার দক্ষতার অভাব ছিল। তুঙ্গ কবিত্বশক্তির দীনতাই হয়তো এই সাহিত্যধারার ক্ষীণতার অন্যতম কারণ। তবে একথা সত্য ধীরে ধীরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রেমময় আগ্রাসনে বর্তমানে এই অঞ্চলের কীর্তন দলগুলি পালকারেরা নির্বিচারে পরিবেশন করেন বাসুদেব ঘোষ বা নরহরি সরকারের পদ। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি তাঁরা বৈষ্ণব ধর্ম বলতে রাধা-মাধব উপাসনাকেই বোঝেন। শঙ্করদেব রচিত পদগুলির অধিকাংশই আত্মনিবেদনমূলক। কিন্তু কোন কোন পদে বিরহার্তি গোপীভাবকে স্মরণ করায়। তাঁর রচনা প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে এ কথা পরে আলোচ্য। কিন্তু বর্তমান আলোচ্য বিষয় প্রসঙ্গে এটুকু বলা চলে যে ভাগবতের ঐশ্বর্যমিশ্রা রূপে শ্রীকৃষ্ণকে দেখানোর চেষ্টা রাজসভাশ্রিত কবিদের ছিল, কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে ধীরে ধীরে শঙ্করদেব উত্তর কালে শ্রীরাধার প্রেমময় ভাবমহিমা আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

কোচবিহার রাজসভাশ্রিত সাহিত্য সাধনার একটি নির্দ্দিষ্ট অভিমুখ আছে এ কথা বলা বাহুল্য। আগেই উদ্ধৃত করেছি কোচনৃপতির মনোগত অভিপ্রায়—

"একদিন সভামাঝে বসি যুবরাজ।
মনে আলোচিয়া হেন কহিলন্ত কাজ॥

পরাণাদি শাস্ত্রে যেহি রহস্য আছয়।
পণ্ডিত বুঝয় মাত্র অন্যে না বুঝয়॥
একারণে শ্লোক ভাঙ্গি সবে বুঝিবার।
নিজেদেস ভাষা বন্দে রচিয়ো পয়ার॥
(পীতাম্বর রচিত মার্কণ্ডেয় পুরাণ, পুথি নং-৮, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার)

এই রাজ অনুজ্ঞা প্রমাণ করে ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের প্রতি কোচরাজাদের উৎসাহী অনুসৃতির প্রচেষ্টা। ষোড়শ শতকে গৌড়ে পাঠান শক্তির অবক্ষয়, পূর্বে অহোম রাজাদের প্রতিষ্ঠালাভ ও রাজ্য বিস্তারের প্রয়াস, দক্ষিণে মুঘলদের আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াস, আর উত্তরে আগ্রাসী 'ভোট' শক্তি। এই চৌহদ্দির কেন্দ্রে কামতায় কৌম জীবন থেকে উদ্ভুত এক রাজবংশ আত্মপ্রতিষ্ঠায় উন্মুখ। স্বভাবতই রাজশক্তির স্বাতন্ত্র বিধানের জন্যও বটে, এবং প্রজাদের মধ্যে এক উন্নত বোধের বিকাশলাভের জন্যও বটে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রসারে পৃষ্ঠপোষকতার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত দূরদর্শী সিদ্ধান্ত ছিল। পরবর্তী চারশতাধিক বছরে রাজরুচির অতন্দ্র প্রহরায় কোচ সভা সাহিত্যের বিশাল ধারাটি মূলত তিনটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়—

(ক) ভাগবত সহ পুরাণাদি অনুবাদের ধারা।

(খ) রামায়ণ অনুবাদের ধারা।

(গ) মহাভারত অনুবাদের ধারা।[২৫]

তবে এই অনুবাদ ধারার বাইরে সংস্কৃত ভাষায় তন্ত্র-স্মৃতি-উপনিষদ চর্চার ধারা অব্যাহত ছিল। তবে এ প্রসঙ্গে এ কথাও স্মরণীয় যে সংস্কৃত রচনাধারাটি সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার মধ্যে ছিল না। দক্ষিণ দেশীয় কিছু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং কিছু সংস্কৃতজ্ঞ স্থানীয় বা উপনিবিষ্ট ব্রাহ্মণ ও রাজশক্তির মধ্যেই এই ধারার মানসিক আদানপ্রদান চলত।

মহারাজা বিশ্বসিংহ ও কোচ দরবারী সাহিত্যের সূচনা

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বলতে প্রথমেই মনে পড়ে মঙ্গলকাব্যের কথা। কারণ মঙ্গলকাব্যগুলি এই সময় রচনা শুরু হয় বললে ভুল হয়, মঙ্গলকাব্যগুলি এই সময়ের সামাজিক ফসল। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের একটি বড় অংশ মঙ্গলকাব্য অধিকৃত। স্বভাবতই উদ্ভবের আদিলগ্নে কোচ রাজসভাশ্রিত সাহিত্য প্রচলিত রীতিকেই অনুবর্তন করবে। বাংলার উত্তর পূর্বাঞ্চলের এই ভূখণ্ডে এই সময়ে আবির্ভূত দুজন কবি হলেন মনকর ও দুর্গাবর। এঁদের রচনায় মহারাজা বিশ্বসিংহের নামোল্লেখ থাকায় ঐতিহাসিকেরা মনে করেন এঁরা মহারাজা বিশ্বসিংহের রাজসভায় বিদ্যমান ছিলেন। (সম্প্রতি ড. বিরিঞ্চি কুমার বড়ুয়া ও ড. সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা এই দুই কবির মনসামঙ্গল ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করেছেন।)

মনকরের কাব্যের নাম "পোএগার পাঁচালী"। খণ্ডিত এই পুথিতে সৃষ্টি খণ্ড থেকে পদ্মার জন্ম খণ্ড পর্যন্ত বর্ণিত। পরবর্তী অংশ পাওয়া যায় না। আবার দুর্গাবরের "পোএগা বেহুলী মঙ্গল" কাব্যে দেবখণ্ডের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। দুর্গাবর প্রথামাফিক দেবদেবী বন্দনা করে সরাসরি চাঁদ সদাগরের আখ্যান, অর্থাৎ চাঁদসদাগর ও দেবী মনসার বিরোধ এবং বেহুলা লখীন্দর আখ্যানে মনোনিবেশ করেছেন। বেহুলা-কাণ্ডের দিকেই তাঁর মনোযোগ ছিল বলে সম্ভবত তিনি এই কাব্যের নামকরণ করেন "পোএগা বোহলী মঙ্গল"। মানকর বা মনকর রচিত "পোএগার পাঁচালী" কাব্যে প্রথমে বর্ণিত "সৃষ্টি খণ্ড" সরস্বতী বন্দনা, গুরু বন্দনা, জাগরণের গীত, সৃষ্টি পত্তন, সৃষ্টির উৎপত্তি, কার্য কারণরূপী ব্রহ্মের বর্ণনা, অনাদিব্রহ্ম কর্তৃক ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের পরীক্ষা, হেমন্ত ঋষির তপস্যা এবং দুর্গার উৎপত্তি বৃত্তান্ত, পদ্মাপূজার মণ্ডপ বর্ণনা—ইত্যাদি অভিনব বিষয় বৈচিত্রে ভরপুর। তাঁর রচনা অসম্পূর্ণ হলেও কিছু মৌলিক বিশিষ্টতায় এটি অভিনব। তাঁর কাব্যে বন্দনা অংশে দেবদেবী বন্দনার সঙ্গে সঙ্গে পিতা-গুরু এবং রাজার বন্দনা আছে। এই কাব্যে একটি অভিনব "জাগরণের গীত" গ্রথিত যা আঞ্চলিক রীতির প্রভাবের নিদর্শন। এই ভূখণ্ডের রাজবংশী সমাজে মনসা পূজায় বা বিষহরি পূজায় পূজক সম্প্রদায় বা "মাড়েয়া—মাড়েয়ানি" প্রধান ভূমিকা নিয়ে থাকেন। মানকরের কাব্যে এদের 'মাড়েয়া-মাড়লি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দেব আখ্যান বর্ণনাতেও কিন্তু অপরিচিত বিষয় বর্ণনা আছে। যেমন পক্ষি ও পক্ষিণীর ডিম থেকে জীব জগতের উৎপত্তি, ধর্ম্ম এবং হরের মিলন—"অর্দ্ধ অঙ্গ মহাদেব, অর্দ্ধ অঙ্গ ধর্ম্ম", গঙ্গা ও দুর্গার উৎপত্তি, গঙ্গাকে জটায় রেখে দুর্গাকে লোহার মঞ্জুষায় ভরে সাগরে নিক্ষেপ ইত্যাদি কাহিনী মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে পরিচিত বা প্রচলিত নয়। "হর পার্বতীরবিবাহ" খণ্ডে হরের আজ্ঞায় বিশ্বকর্মা কর্তৃক বলদকে প্রাণদান এবং সেই বলদের সাহায্যে শিবের ফুলচাষ নিঃসন্দেহে অভিনব। একাধিক কবির চণ্ডীমঙ্গল এবং শিবায়নে শিবের হালচাষের বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে শিব মালাকর, আর শিবের উদ্যানে "ব্যল্লিশ ফুলের বীজ" এনে দিয়েছেন তাঁর প্রথমা পত্নী গঙ্গা। হর পার্বতীর বিবাহের পূর্ববর্তী ঘটনাও কম বিচিত্র নয়। প্রাকবিবাহ কালীন হর-পার্বতীর প্রণয় ও মিলনচিত্র বর্নিত হয়েছে। দুর্গার প্রতি ঈর্ষায় গঙ্গার দুর্গাকে বধ করতে চাওয়া বা দুর্গার সতীত্ব পরীক্ষা এগুলি সম্ভবত মনকরের কল্পনাজাত। অন্যান্য মনসামঙ্গলের মত মনকরের "পোএগার পাঁচালী" তেও কন্যা মনসাকে দেখে শিব কামার্ত বৃদ্ধের মত আচরণ করেন। পরে অবশ্য মনকরের কাব্যে অনুতপ্ত শিব মনসাকে সূক্ষ্ম দেহে ঘরে নিয়ে আসেন। তবে তার পর কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাওয়ায় দুর্গা বা গঙ্গার প্রতিক্রিয়া জানা যায় না। মনকরের কাব্যে আদিরসের আভাস আছে, যা মধ্যযুগীয় সাহিত্য প্রতিবেশে একান্ত স্বাভাবিক। মনকরের রচনায় চরিত্রগুলি একান্তই ভূমিচারী সাধারণ মানুষের মতই খাওয়া পরার চিন্তায় কাতর। পরিবারে স্বামী যখন দ্বিতীয়বার বিবাহে উন্মুখ, তখন নিম্ন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরনীর মতই গঙ্গা শিবকে বলেন—

"লাঙ্গটা ভাঙ্গরা বুড়া হয়া ভিক্ষাচারী।
ঘরে ভাত নাই ভৈলা দুই তিনি নারি॥
বয়সত লম্বিত রতিত ভৈলো হিনি।
বৃদ্ধকালে দিলা গোসাই দারুন সতিনি॥[২৬]

মনকরের কাব্যে শিবের কোচরমণীর প্রতি আসক্তি স্মরণ করায় 'শিবায়ণ'কে। হরপার্বতীর বিবাহ অংশে কবি মহারাজা বিশ্বসিংহকে রাজা জল্পেশ্বর বলে বন্দনা করেছেন—

"কামতাইর রাজা বন্দো রাজা জল্পেশ্বর।
একশত মহিষি বন্দো আঠার কুমার॥"[২৭]

কবি দুর্গাবরের মনসামঙ্গল কাব্যের নাম "পোএগ বেহালী মঙ্গল"। কাব্যে কবির আত্মপরিচয় যেটুকু পাওয়া যায়—

"শ্রী কায়স্থ চন্দ্রধর তান পুত্র দুর্গাবর
বিরচিত গীত বিতপোন"॥[২৮]

কবি দুর্গাবরের রচনা অনেকখানিই পাওয়া গেছে, পুথিটিকে প্রায় সম্পূর্ণ বলা যায়। তাঁর রচনা দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে দেবদেবী বন্দনা, সনকার পুত্রার্থে গঙ্গা আরাধনা, 'চম্পাআলি' বা 'চাঁপালি' নগর বর্ণনা, সনকার ছয়পুত্রের জন্ম, পুত্রদের বিবাহ, চাঁদের বানিজ্য যাত্রার উদ্যোগ, সনকার মনসাপুজোয় চাঁদের ক্রোধোদ্রেক, ছয় পুত্রের মৃত্যু, চাঁদ সদাগরের দুর্গতি, লখীন্দরের জন্ম বৃত্তান্ত ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে বেহুলা লখীন্দরের বিবাহ, বাসরে দংশনে লখীন্দরের মৃত্যু (এই অজগর আবার মনসার স্বামী), মনসার চক্রান্তে শঙ্খ ওঝার মৃত্যু, পতিসহ বেহুলার যাত্রা, পথে নানা বিপত্তি, ভ্রাতা শঙ্খধরের সঙ্গে সাক্ষাৎ, নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং নেতা এবং নেতার সহায়তায় মনসার কাছে পৌঁছায় বেহুলা। পরে পদ্মা-বেহুলা দ্বৈরথে বেহুলার জয়, লখীন্দর সহ চাঁদের অন্যান্য পুত্রদের নবজীবন লাভ, ডোমনীর বেশে বেহুলার সনকার গৃহে আগমন এই পর্যন্ত বর্ননার পর পুঁথি খণ্ডিত। দুর্গাবরের "পোএগ বেহুলী মঙ্গল" কিন্তু প্রচলিত পথেই হেঁটেছে। কোথাও কোথাও কবিকল্পনার স্বাতন্ত্র বা লোকপরিবেশের প্রভাব চোখে পড়লেও কাহিনী কাঠামোটি প্রচলিত মনসামঙ্গল কাহিনির সঙ্গে সাদৃশ্য যুক্ত। সনকার পুত্রলাভার্থ গঙ্গাদেবীর আরাধনা এবং বিফল হলে আত্মহত্যা করে গঙ্গাকেই স্ত্রীবধের অভিশাপ দেওয়ার উপক্রম নতুন সংযোজন। আবার মনসার স্বামীর অজগর রূপে (বা অজগরই মনসার স্বামী) আবির্ভাবের পর মনসার কথায় লখীন্দরকে দংশন প্রসঙ্গটিও অভিনব। মনসা স্বামীকে বলেছেন—

"যদি মোর বিবাহিতা স্বামী হোয়া যদি তুমি জে
তেবে বাদ করো প্রতিপাল।"

আবার অজগররূপী স্বামী বলেছেন—

"ক্ষমা কর ভার্য্যা যে শুন দেবী বিষহরী।
তোমাত আগল আছে বেহুলাই সুন্দরী॥"

এভাবে অজগরের চরিত্রে মনুষ্যত্বের আরোপ দুর্গাবরের স্বাতন্ত্রের পরিচয়। অন্যান্য নানা মনসামঙ্গল কাব্যে দেখা যায় বেহুলাকে নৃত্যগীতে অন্যান্য দেবতা এবং বিশেষত শিবকে তুষ্ট করে স্বামীর জীবনদান প্রার্থনা করতে। কিন্তু দুর্গাবরের মনসামঙ্গল কাব্যে বেহুলা এবং পদ্মা প্রতিদ্বন্দ্বিনী। কাতর অনুনয় বিনয়ের পথে বেহুলা হাঁটেই

নি। কলার মান্দাসে মৃত স্বামীর কয়েকটি হাড়ের দেহাবিশিষ্ট নিয়ে যে বেহুলা দীর্ঘপথ পাড়ি দেয়, সেই বীর্যবতী নারী এই কাব্যে অতুল মহিমায় ভাস্বর। মনসার কাছে লখীন্দরের জীবনদানের আশ্বাস না পেয়ে স্বামীর হাড়গুলি নিয়ে চিতায় ওঠে বেহুলা আর অগ্নিসংযোগের আগে নেউলি এবং ময়ূরকে হাঁক দিয়ে বলেন—

"আইস আইস পুতাদুই নেউল ময়ূরী হে
সর্প্পক কাটি দেও ভূঞাপেটভরি।
বেহুলাইর বাক্যে শুনি নেউলি ময়ুরী
নিকট চাপিলা রঙ্গ করি॥"

এখানে "সর্প্প" অর্থে লখীন্দরকে যে অজগর দংশন করে সে, অর্থাৎ "পদুমার পতি"। বলা বাহুল্য পদ্মা শঠে শাঠ্যাং রীতিতে একেবারে বিপর্যস্ত—

"বেউলাই সতী সর্প্প কাটিবাক চাই
দেখি পদুমার কম্পমান কাই।
মোর স্বামী কাটে বেটী বানিয়া টেণ্টনী
শীঘ্রে রক্ষা কর ধুবুনী নেতাই।
বোলে নাকাটিবা কন্যা সর্প্প অজগর
জীয়াই দিব তোর বালা লখিন্দর॥"

বেহুলা চরিত্রে এই চমৎকার উদ্ভাস বাংলা সাহিত্য অভিনব তো বটেই, একবিংশ শতকের আধুনিক মনা পাঠকের কাছে বেহুলার এই রূপটি অধিকতর আদৃত হবে বলাই বাহুল্য। দুর্গাবর এবং মনকর দুজনের কাব্যেই রামগিরি, ভাটিয়ালী, সুহাই, পটমঞ্জরী প্রভৃতি রাগের উল্লেখ আছে। তবে দুর্গাবর বা মনকরের পর অন্যান্য রাজাদের রাজত্বকালে মঙ্গলকাব্যধারার আর বিশেষ পুষ্টি হয় নি। কারণ কামতা রাজসভার রাজারা ব্রাহ্মাণ্য সাহিত্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং কৌম সমাজে ব্রাহ্মাণ্য সংস্কার প্রবর্তনে অধিকতর আগ্রহী ছিলেন, ফলে স্বাভাবিক ভাবেই নরনারীর অদিম জীবনাচরণে যে দেবদেবীদের অবস্থিতি তাঁদের মাহাত্ম্যকথা বর্ননায় কোচ রাজসভাশ্রিত কবিরা উৎসাহ দেখান নি। বরং পুরাণ, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি অনুবাদে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ করেছিল তাঁদের।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য রাজসভাকবি দুর্গাবরের অপর সাহিত্যকীর্তি রামায়ণের কথা। সাম্প্রতিক কালে কোচবিহার জেলার এক কৃষকের বাড়ির মাচার উপর থেকে ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিলিপিকৃত একটি পুথির সন্ধান পাওয়া গেছে। লিপিকরের নাম পিতালু দাস, নিবাস কোনামালি গ্রাম।[২৯] এটি দুর্গাবর রচিত রামায়ণের প্রতিলিপি। ১৯৫৮ সালে আসামের গোলাঘাট থেকে শ্রীপুর্ণচন্দ্র গোস্বামী এই গ্রন্থের মুদ্রিত রূপ প্রকাশ করেন। গ্রন্থের সম্পাদনায় ডঃ মহেশ্বর নেওগ জানান "হাজো নিবাসী বিষয়চন্দ্র বিশ্বাসী" নামক জনৈক ব্যক্তি প্রথম এই রামায়ণ মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করেন, এবং তিনিই এর নাম দেন "দুর্গাবরী গীতিরামায়ণ"। সম্ভবত পদের শীর্ষে রাগ রাগিনীর উল্লেখ দেখেই তিনি 'গীতি' বিশেষনটি ব্যবহার করেন। ডঃ মহেশ্বর নেওগ সম্পাদিত গ্রন্থে অরণ্যকাণ্ড থেকে অযোধ্যা কাণ্ড পর্যন্ত চারটি খণ্ড মুদ্রিত। অরণ্য কাণ্ডের আগেও যে কিছু লেখা ছিল সে প্রসঙ্গে জানা যায় অরণ্যকাণ্ডের একটি শ্লোক থেকে—

"অযোধ্যাকাণ্ডের কথা ভেলা সমাপিত।
অরণ্যকাণ্ডের কথা শুনিয়ো সম্প্রতি॥"[৩০]

সাম্প্রতিক কালে দুর্গাবরী রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের একটি ৩২ পৃষ্ঠা সংবলিত পুথি পাওয়া গিয়েছে কোচবিহার জেলার এক কৃষকের বাড়ির মাচায়, যেটি ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের একটি প্রতিলিপি সাকিন কোনামাল্যি নিবাসী শ্রীপিতালু দাস কর্তৃক নকল করা। অধ্যাপক তরনীকান্ত ভট্টাচার্য অরণ্যকাণ্ডের পুথিটি নিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা 'সুবর্ণলেখা'য় তাঁর প্রবন্ধে কৃত্তিবাসী অরণ্যকাণ্ড ও দুর্গাবরী অরণ্যকাণ্ডের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। দুর্গাবরী অরণ্যকাণ্ডে রাম-লক্ষ্মণ দশরথের মৃত্যুর পর গয়ায় যান পিণ্ড দিতে। সেখানে রাম লক্ষ্মণের অনুপস্থিতি কালে রাজা দশরথ স্বর্গ থেকে এসে সীতার হাত থেকে বালির পিণ্ড গ্রহণ করেন। এরপর যথাবিধি পিণ্ডদান পর্ব সেরে রাম লক্ষ্মণ এবং সীতাকে নিয়ে বিশ্বকর্মা নির্মিত মঠে কালাতিপাত করতে থাকেন। পরে রামচন্দ্রের মনে অযোধ্যার স্মৃতিজাগলে সীতা মায়া অযোধ্যা সৃষ্টি করে রামকে প্রবোধ দিলেন। পরবর্তী কালে শূর্পনার প্রেমনিবেদন বা মারীচের সহায়তায় রাবনের সীতাহরণের প্রসঙ্গ যথারীতি আছে। সীতার সন্ধানে আকাশ বানীর নির্দেশে রাম দক্ষিণে যেতে থাকলে এক 'চাকোয়া' পাখি এবং এক বকের সঙ্গে রামের সাক্ষাৎ হয়। চাকোয়া রামের বীরত্বকে উপহাস করলে রাম অভিশাপ দেন। পরে জটায়ুর কাছে সীতাহরণের খবর পেয়ে মৃত জটায়ুর শেষকৃত্য সমাপন করে রাম সীতার সন্ধানে যান। আবার রাবন জটায়ুর হাত থেকে ছাড়া পেলেও সম্পাতিপুত্র সুপাক্ষের হাতে নিগৃহীত হন। অবশেষে লঙ্কায় পৌঁছে ত্রিজটার তত্ত্বাবধানে সীতাকে রাবণ বন্দী করে রাখলেন আশোকবনে এদিকে পথশ্রমে ক্লান্ত রামচন্দ্র কিস্কিন্ধ্যার গ্রামে পৌঁছান এবং যে গাছের ডালে সুগ্রীব ক্রন্দনরত তার তলায় বিশ্রাম করেন। সুগ্রীবের অশ্রুজল রামের শরীরে পড়লে রাম তা লক্ষ্মণের অশ্রু মনে করে কান্নারকারণ জিজ্ঞাসা করলেন। এই অংশেই অরণ্যকাণ্ডের ইতি। অধ্যাপক ভট্টাচার্য কৃত্তিবাসী ও দুর্গাবরী দুই অরণ্যকাণ্ডের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন—"কৃত্তিবাসী রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের তুলনায় আমাদের পুথিটির দৈর্ঘ্য কমই হইবে। কৃত্তিবাসে সবই পায়ারে গাথা। কৃত্তিবাস ও বাল্মীকির বাতাপি—ইল্বলের কাহিনী আমাদের কাণ্ডে নাই। দূষণ এখানে হইয়াছে ধুস্বর। শবরী ও কবন্ধের কাহিনীও আমাদের পুথিতে নাই। কিন্তু সীতার বালির পিণ্ডদান এবং রামের চাকোয়া ও বকের সহিত মিলন আমাদের পুথিতে নূতন"—যদিও দুর্গাবরী গীতিরামায়ণের অন্তর্গত অরণ্যকাণ্ড এবং দাস কর্তৃক অনুলিপিকৃত অরণ্যকাণ্ডে প্রচুর পাঠভেদ আছে, তবুও দুটিই যে একই কবির লেখা তা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। ঘটনাবৈচিত্র্যের জন্য যে নানা সংযোজন ঘটেছে তাকে সবটাই দুর্গাবরের বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে দুর্গাবরী রামায়ণ কামতায় জনপ্রিয় ছিল। তার জনপ্রিয়তার জন্য পুথির পাঠবৈষম্য বা প্রক্ষিপ্ত সংযোজন বিয়োজন ঘটতে পারে, যখন বিশেষ করে আদিমধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য ছিল শ্রুতি ও অনুলিপিনির্ভর।

মহারাজা বিশ্বসিংহের রাজত্বকালের অন্যতম সভাকবি ছিলেন পীতাম্বর। তিনি ভাগবতের দশম স্কন্ধ অনুবাদ করেছিলেন। মুলানুগতার দিক থেকে তিনি মালাধর বসুর প্রতিস্পর্ধী বলেও অনেক সমালোচক দাবি করেছেন। কবি পীতাম্বর সম্ভবত মহারাজা বিশ্বসিংহের পুত্র কুমার সমরসিংহ বা শুক্লধবজের রাজত্বকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁর সব রচনাতেই রাজকুমার সমরসিংহের পৃষ্ঠপোষণার উল্লেখ পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে পীতাম্বরের রচিত ভাগবতের দশম স্কন্ধের অনুবাদ (পুঁথি নং ৫৮) সংরক্ষিত আছে। গ্রন্থরচনার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

"দশম স্কন্ধের কথা পরম সম্পদ।
কৃষ্ণ জন্ম কর্ম্ম শুন হয়ে নিশবদ॥
অতি সুরপুর সে যে কামতানগর।
...আছয় বিশ্বসিংহ নৃপবর॥

তাহার তনয় সে যে সমরসিংহ নাম।
কৃষ্ণের লীলাতে তা এ অতি অভিরাম॥
শিশুমতি পীতাম্বর তাহার সমীপে।
কৃষ্ণের লীলার পদ রচিলো সংক্ষেপে॥[৩১]

পীতাম্বর রচনাশৈলীর মাধুর্য অনস্বীকার্য। সংস্কৃত ভাষার ভাবগম্ভীরতা মধ্যযুগীয় বাংলায় আস্বাদন অসম্ভব, কিন্তু কিছু কিছু ব্রজবুলি ভাষার মিশেলে মধ্যযুগের বাংলা ভাষা তার যাবতীয় মাধুর্য নিয়ে ভাগবতের সারাংশকে অনুদিত করেছে, যশোদার দধিমন্থন, কৃষ্ণের বালসুলভ চাপল্য, যশোদার কৃষ্ণকে রজ্জু বন্ধন, কৃষ্ণের বাঁধনে ধরা দেওয়া প্রভৃতি ঘটনাগুলি পীতাম্বরের রচনায় সার্থকভাবেই ফুটে উঠতে দেখা যায়।

ভাগবত "দশম স্কন্ধে" যশোদা কর্তৃক কৃষ্ণের রজ্জুবন্ধন ভাগবৎসত্তার বাৎসল্য রসে অভিসিঞ্চিত বহিঃপ্রকাশ যা ভারতে নানা কবির হাতে নানা ভাষায় বহুবর্ণিত। ভাগবতের মূলপাঠের যথাসাধ্য অনুসারী থেকে পীতাম্বর তাঁর অনুবাদ সমাধান করেছেন বাংলা ভাষার মধুক্ষরা বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুন্ন রেখে। পীতাম্বরের রচনা থেকে উদ্ধৃত করি তাঁর ভাগবতের অংশবিশেষ—

"তত পাছে একদিন নন্দের ঘরনী।
দেখে গৃহকাজে রত সব সেবকিনী॥
নষ্ট হৈব দধিদুগ্ধ হেন ভাবি মনে।
ধরিয়া মন্থনদণ্ডি জসোদা আপনে।
গুরুতর নিতম্বে পিন্ধিয়া বাসক্ষৌনী।
পটসুতে বান্ধি তাত সোনার কিঙ্কিনী॥
দধী মথে হরীর বালক কেলী গায়ে।
রুনু ঝুনু করের কঙ্কণ বাজি জায়ে॥
মথন দণ্ডের দড়ি টানিতে সঘনে।
কুণ্ডল জুগল থির না হএক শ্রবনে॥
পিন পয়োধর ভার হইল অস্থির।
ঘর্ম্মবিন্দু বিআপিত সকল স্বরির॥
পুত্রস্নেহে স্তন দুই শ্রবে ঘনে ঘন।
দেখিয়া গোবিন্দক ভোকে আইলা ততিক্ষন॥
দুই হাতে চাপিয়া মথনদণ্ডধরী।
না দেয় দধি মথিতে জননীক শ্রীহরি॥
হাসে দেবী জসোদা পুত্রের গতী দেখি।
পুত্র কোলে নিল দধি মথন উপেক্ষী॥
... ...
পেট না ভরিল জননীর খির পানে।
পাথর ধরিয়া নারায়ণ কোপ মনে॥
দধির ভাণ্ডত সে মারীল মেলিয়া।
ছাড়াইল সকল দধী কলস ভাঙ্গিয়া॥

অধর কামড়ি তবে চাহে চতুভিতী।
ঘরের ভিতর তবে গেল লক্ষীপতি॥
উদুখলে উঠি গিয়া চড়ি সকটত।
দধিদুগ্ধ খাইল তুষ্ট পুরিয়া মনত॥
বানরক দিল জত না পারি খাইতে।
চোর জেন চারী ভিতী চাহে সচকিতে॥
দুগ্ধ পরিপাক করি জসোদা জননী।
দুগ্ধ মথিবাক তরে আইলা ততিক্ষণী।
দেখে হাড়ি ভাঙ্গিয়া ছড়াইল দধিচয়।
নাকে হাত দিয়া দেবী মনত গুণয়।
হরি বিনে এ কার্য্যয়ানের নাহি হয়॥
... ...
ধরিল জশোদা জায়া গোবিন্দের করে।
পাড়িতে পাড়িতে গালি লআ জায় ঘরে॥
ঘসিয়া নয়ন হাতে কান্দে নারায়ণ।
লোতকে গলিত মুখ লাগিল অঞ্জন॥
মায়ের হাতের লড়ি চাহে ঘনে ঘন।
রহিল গোবিন্দ করি তবধ নয়ন॥
লড়ি দেখি ছাআল ডরায় মোর জেনে।
জসোদা ফেলাইল লড়ি এহিভাবি মনে॥
আজি বান্ধি থুইব তোক ঘরে আপনার।
আকার বর্যিত জার নাহি পূবর্বাপর।
জাহার মুরুতি দেখি জত চরাচর॥
জগত ঈশ্বর দেব জগৎ আধার।
তাক যশোদায় পুত্র হেন ভাবে মনে।
কাঙ্খালত দড়ি লাগাইল ততিক্ষণে
নাটে দ্বিআঙ্গুল দড়ি হরির গাওত
আর এক দড়ি আনি কুড়িল হাতত।
তথাপি তো বান্ধিবাক দ্বি আঙ্গুল নাটে
আন দড়ি য়ানহ জশোদা বোলে ঝাণ্টে॥
বারে বারে যত দড়ী অনিল বিপুল।
বান্ধিবার বেলা সেটি নাটে দ্বি আঙ্গুল॥[৩২]

কবি পীতাম্বরের রচনায় শ্রীকৃষ্ণের বালসুলভ চপলতা, মা যশোদার বাৎসল্য, ঈশ্বরীয় অনুভূতি বা ভাগবত্তার বহিঃপ্রকাশ সবকিছুই সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে বর্ণিত। গোপবালকদের সঙ্গে স্বয়ং নারায়ণ নিজ ঐশ্বর্য ভুলে গ্রাম্য ক্রীড়ায় মত্ত এভাবেই কবি নারায়ণকে বর্ণনা করতে চেয়েছেন—

"এহিমতে জাইতে বনে শ্রম পায়া কতোক্ষণে
রাম সুতিলন্ত তরুতলে।
বলভদ্রের চরণ কোলে তুলি নারায়ণ
শ্রম দূর করিল মর্দনে॥
পাছে উঠি দুয়ো ভাই নৃত্য করে সেহি ঠাই
অতি সুমধুর গিত গায়।
হংস গতি অনুকরে নাচে নাবিতে মউরে
রাব কাড়ে কোকিল পয়ার

ক্ষনে বাহুবুদ্ধ করি শ্রম জবে পাইল হরী
সয্যা রচি কিশলয় দলে।
এক সিশুক আনিঞা উরুত সিয়ের দিআ
ছাআত সুতিল তরুতলে॥
ধবজ বজ্র সত পাত অঙ্কুস অঙ্কিত তাত
হেন কৃষ্ণ পদ তুলি কোলে।
কোন গোপ সেহি তানে শ্রম নিবারণ মনে
জান্তিতে লাগিল তরুতলে॥"[৩৩]

পীতাম্বর মধুর রস সৃষ্টিতে আদিবেশের প্রাবল্যের দিকে নজর দেন নি ভালোবাসার স্নিগ্ধ মধুর প্রকাশই তাঁর কাব্য অনুরণিত—

"জতেক যুবতিগন কৃষ্ণক দেখিয়া।
মরীবার জন্য জেন উঠিল বসিয়া॥
... ...
হরসিতে কোন গোপী দুই করতলে।
ধরিলেক গোবিন্দের চরণ কমলে॥
কেহ কৃষ্ণভুজ ধরি আনন্দ আপার।
চন্দন চর্চিত কন্ধে থুইল আপনার॥
... ...
কোন গোপী প্রণাম করিল দণ্ডবতে।
দিলেক তাপিত কুচ কৃষ্ণের পায়তে॥
আর গোপী বিশম বিরহ দুখ পায়া।
সে কোপে কৃষ্ণক আড় নয়নে চাহিআ॥
নিজ কুচ কুঙ্কুম রঞ্জিত সুবসনে।
হেন বস্ত্র দিল গোপী কৃষ্ণক আসনে॥
বিমল জোগীর হ্রিদি আসন জাহার।
হেন দেব বসিল আসনে গোপীকার॥"[৩৪]

রাজ নির্দেশে পীতাম্বর ভাগবত অনুবাদের গুরুদায়িত্বে ব্রতী হলেও তাঁর নিষ্ঠা কবিত্ব শক্তি আর আন্তরিকতা প্রশ্নাতীত। তাই মধ্যযুগের বাংলা ভাষার যথাসাধ্য শক্তিতে তিনি সুললিত ভঙ্গীতে তাঁর অনুবাদ কাব্যের ছত্রে ছত্রে ফুটিয়ে তুলেছিলেন ভাগবত বিশ্বাসীর বিশ্বাসের আধার নারায়ণের নানা রূপ।

কবি পীতাম্বর মার্কণ্ডেয় পুরাণের অনুবাদও করেছিলেন। কোচবিহার রাষ্ট্রীয় গ্রন্থগারে মার্কণ্ডেয় পুরাণের দুটি পুঁথি সংরক্ষিত আছে (যথাক্রমে ৮, ও ১৩ নং)। ১৩ নং পুথিটি রাজা শিবেন্দ্রনারায়নের রাজত্বকালে অনুলিখিত হয়েছিল। কুমার সমর সিংহের সতর্ক দৃষ্টি ছিল যাতে রাজ পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত কবিরা রাজার মনোভাবের যথাযথ প্রতিফলন ঘটাতে পারেন তাঁদের রচনায়। রাজা হিসাবে কোচ রাজারা চাইতেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ও সংস্কারের ধারাকে কোচ রাজশাসনাধীন জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের প্রস্তাবনায় কবি পীতাম্বর লিখেছেন—

একদিন সভামাঝে বসি যুবরাজ।
মনে আলোচিয়া হেন কহিলন্ত কায।।
পুরানাদি শাস্ত্রে যেহি রহস্য আছয়।
পণ্ডিত বুঝয় মাত্র অন্যে না বুঝয়॥
এ কারণ শ্লোক ভাঙ্গি সবে বুঝিবার।
নিজ দেস ভাসাবন্দে রচিহ পায়ার॥
বেদপক্ষ বার আর শশাঙ্ক শকাত।
আরম্ভ করিলোঁ মার্কণ্ডেয় কথা যত॥
কুমার সমরসিংহ আজ্ঞা পরমাণে।
কহে পিতাম্বর নারায়ণ পরশনে॥[৩৫]

মার্কণ্ডেয় পুরাণ রচয়িতার কথানুযায়ী ১৫২৮ শকাব্দে তিনি রচনা করেন এই কাব্য, অথচ ইতিহাস অনুযায়ী তখন কোচবিহারের শাসনকর্তা মহারাজ লক্ষীনারায়ণ। তিনি সমরসিংহের পরবর্তী শাসক। ফলে পীতাম্বর নামধারী কবি একজনই, না পরবর্তীকালে আরও কোন কবি খ্যাতনামা হয়েছিলেন যার নাম পীতাম্বর, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। কোনো কোনো সমালোচক সিদ্ধান্ত করেছেন এই শকাব্দ প্রকৃতপক্ষে "পক্ষ বান বেদ আর শশাঙ্ক শকত"—অর্থাৎ ১৫৪২ বা ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে যখন কোচবিহারের রাজসিংহাসনে রাজত্ব করেছেন মহারাজা নরনারায়ণ। নরনারায়ণের বিক্রমশালী কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার শুক্লধবজ সমরসিংহ বা সংগ্রামসিংহ নামে খ্যাত ছিলেন। ফলে এক্ষেত্রে পীতাম্বরের সমরসিংহের সভাকবি হওয়ায় কোন বাধা থাকে না। খান চৌধুরী অমানতউল্লা তাঁর কোচবিহারের ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন শুক্লধবজ গৌড়দেশ থেকে পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ ও পীতাম্বর সিদ্ধান্তবগীশ নামে দুই পণ্ডিতকে স্বদেশে আনয়ন করেন, এবং তাঁর মতে মার্কণ্ডেয় পুরাণ এই পীতাম্বর সিদ্ধান্ত বাগীশের রচনা। রংপুর অঞ্চ ল থেকে ডঃ সুকুমার সেন সংগ্রহ করেছিলেন 'নল দময়ন্তী উপখ্যান' যার রচয়িতা হিসাবে পীতাম্বরের নাম পাওয়া যায়। 'উষা পরিণয়' নামে অপর একটি গ্রন্থেও ভনিতায় পাওয়া যায়—

"কামতা নগরে সুরপরি পরতেক।
তাতে সিসু পিতাম্বর নামে কবি এক॥"[৩৬]

অর্থ্যাৎ নানা ভাবে পীতাম্বর নামে কোন কবির একাধিক ভনিতায় বা একাধিক পীতাম্বর নামধারী কবির নানা রচনা পাওয়া গেছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুবাদক কবি পীতাম্বরের রচনার মৌলিকতা অনস্বীকার্য। অমৃতনিস্যন্দী

সংস্কৃত স্তবগানের বাংলায় অনুবাদ কষ্টসাধ্য নিঃসন্দেহে। কিন্তু পীতাম্বরকৃত অনুবাদ রচনাসৌন্দর্য ও স্বকীয়তায় অম্লান—

"তুমি ঈশ্বরী গোশানী তৃজগত জননী জগতপালনসংহারিনী
হবির্দ্দান দেবতার হবির্দ্দান পিতরের দুই মাত্র তুমি সে গোশানী।
যজ্ঞ হবির্দ্দান মন্ত্র উদাত্তাদি স্বর যত শুদ্ধচার নি (?) ভগবতী।
অয়াকার উকার আর বর্ন ম কার তিনমাত্রা তোমার মুরুতি
হ্রস্বদীর্ঘ প্লুত তুমি ত্রিমাত্রা উচ্চারিনী কহিবাক না পারি জাহাক॥
অর্দ্ধমাত্রা বুলি জাক হ্রস্বদীর্ঘ প্লুত তাক সেয়ো মাত্রা বুলি যে তোমাক।
বেদমাত্রা তুমি প্রধান জননী তুমি মাতা জগত ধারীনি॥
জগত পালন করহ শৃজন তুমি আপনে গোশানী॥
কল্পান্তর হৈলে জগত সকলে ভোজন কর আপনে।
শৃষ্ঠি কালে রুপা তুমি দেবী স্থিতি যে রুপ পালনে।[৩৭]

পুরান অনুবাদে নিয়োজিত কবি সাধ্যানুযায়ী পুরাণের দুরূহ তত্ত্ব আলোচনা করেছেন মাতৃভাষায় যথাসাধ্য সেই তত্ত্বের স্বরূপ বজায় রেখে। উপাদানের দুষ্প্রাপ্যতা হেতু পীতাম্বর নামে একাধিক কবি ছিলেন কিনা তা আলোচনা করে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানো নিশ্চয় সময়সাপক্ষে। কিন্তু এ কথাও অনস্বীকার্য, পীতাম্বর নামাঙ্কিত সবগুলি রচনাই সুখপাঠ্য।

সাহিত্য সাধনা ও মহারাজা নরনারায়ণ

বিশ্বসিংহের পুত্র মহারাজ নরনারায়ণ রাজসিংহাসনে আরোহন করেন ১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দে। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনিও রাজপৃষ্ঠপোষণায় সাহিত্যচর্চার ধারাটিকে নিরবচ্ছিন্ন রেখেছিলেন। কোচ রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় যে সাহিত্যসাধনার ধারার সূত্রপাত তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র কামরূপ কাছাড় অঞ্চল জুড়ে। রাজা নরনারায়ণের রাজসভাকবি হিসাবে রাম সরস্বতী ও কলাপচন্দ্র দ্বিজের নাম পাওয়া যায়। রাজভ্রাতা শুক্লধবজেরও শিক্ষা সাহিত্যে অনুরাগ ছিল, ফলে তাঁর উৎসাহেও অনেক কবি বা পুরাণ অনুবাদক রচনাকার্য চালাতে পেরেছিলেন। সরস্বতী ছিলেন মহাভারতের অংশবিশেষের অনুবাদক। তাঁর রচিত "সাবিত্রী উপখ্যান" জনসমাজে আদৃত ছিল। নরনারায়ণের অন্যতম সভাসদ অনন্তকন্দলী কবি হিসাবেও মান্য ছিলেন মহাভারতের অংশবিশেষের অনুবাদক ছিলেন তিনি তাঁর "সাবিত্রী উপখ্যান" জনসমাজে আদৃত ছিল। ভাগবত অনুবাদক (দশম স্কন্ধ) এবং রামবিষয়ক কীর্তন রচয়িতা হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। নরনারায়ণের অন্যতম সেনাপতি ও মন্ত্রী কবীন্দ্র পাত্র ও মহাভারতের অনুবাদ করেন। কবি সার্বভৌম ভট্টাচার্য 'ভবিষ্যপুরাণ' অনুবাদ করেন। এভাবেই বাহু কীর্তিমান সারস্বত সাধকের সমাবেশে মহারাজা নরনারায়ণের সভা ছিল উজ্জ্বল।

কবি রামসরস্বতী মহাভারতের উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, প্রভৃতি পর্বের অনুবাদ করেছেন। রাম সরস্বতীর অনুবাদ প্রসঙ্গে এ কথা বলা ভাল যে, এখানে অনুবাদ আক্ষরিক নয়। মূলকে নিজের যুগধর্ম ও যুগভাষায় বদলে নিয়ে তিনি অনুবাদ করেছেন। উপরন্তু কৃষ্ণ ভক্তির প্রাবল্যে কৃষ্ণের মানবসত্তা প্রায় অতিমানবীয় পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। মূল মহাভারতে যে রাজনীতি বা তত্ত্ব উপদেশ প্রভৃতি কাহিনীর প্রায় হাত ধরাধরি করে চলেছে, অনুবাদকালে সেই উপদেশকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন নি। যুদ্ধ উদ্যোগের শুরুতে ভীম কৃষ্ণকে বিবেচনা

করতে বলেছিলেন, যাতে ভরতবংশ লোপ না পায়। প্রয়োজনে তাঁরা দুর্যোধনের অনুবর্তী হয়ে চলবেন এমন ইঙ্গিতও তিনি দিয়েছিলেন। কিন্তু কবি রামসরস্বতীর অনুবাদে ভীম অস্বাভাবিক দীনতা প্রকাশ করে বলছেন—

"ভিক্ষামাগি খাইবো ঘরে ঘরে চিরকাল।
তথাপি মাধব বিবাদত নাহি ভাল।"[৩৮]

কিংবা কৌরব সেনারা যখন কৃষ্ণ ভক্তিতে আচ্ছন্ন—

"অর্জ্জুনর আগত সাক্ষাতে দামোদর।
প্রথমেতে দেখে গৈয়া বদন কৃষ্ণর॥
দুবর্বাদল শ্যামতনু সুকোমল কায়।
গায়ে পীতবস্ত্র যেন বিজুলি পরায়॥
শরতের পদ্ম যেন প্রফুল্ল বদন।
হৃদয় পরশে মুখে হাসি বিতোপন॥"—[৩৯]

যুদ্ধক্ষেত্রের উন্মাদনার মাঝে কৌরব সেনারা মেহিত হয়ে কৃষ্ণরূপ দেখছে, এ বর্ণনা কবির বাস্তববোধের পরিচয় দেয় না বলাই বাহুল্য।

আবার, কুন্তী যখন জন্মপরিচয় দিয়ে কর্ণকে ফিরে আসতে বলেন, তখন কর্ণ বলেন—

"মুই যদি সত্য এরি যাঁও তযু পাশ।
তেবে লোকে কিবা মোত করিবে বিশ্বাস॥
তুমি সম যতেক অসতী কন্যাচয়।
পুত্র উপার্জ্জিয়া তেজে কলঙ্কক ভয়॥
সত্য এরি যাঁও যদি তযু গৃহলাগি।
মুই তৈবে ভৈলো তা সম্বার বধভাগী॥"[৪০]

এখানে মহাভারতের কর্ণের বেদনা আর কবির সমকালীন জীবনবোধ অঙ্গাঙ্গী জড়িত। কোথাও কোথাও কবির জীবনবোধ মহাভারতীয় গাম্ভীর্যকে অস্বীকার করেছে। যেমন শরশয্যায় শায়িত ভীষ্ম অর্জুনকে জানাচ্ছেন—

"বংশধর নাতি তেই জলপিণ্ড আস।
যার গৃহে পুনর্জন্ম করিবন্ত বাস॥[৪১]

নাতির ঘরে পুনর্জন্ম বাসের ইচ্ছা ভীষ্মের মত চরিত্রকে সাধারণ বৃদ্ধের পর্যায়ে নামিয়ে আনে বইকি। দ্রোণপর্বের অনুবাদে রামসরস্বতী পুত্র গোপীনাথের সহায়তা নিয়েছিলেন বলে মনে করেন আঞ্চলিক ইতিহাসবেত্তারা। কিন্তু প্রাপ্ত পুথির পাঠযোগ্য অংশে এমন কোন উল্লেখ পাইনি। রামসরস্বতীর পুত্র কলাপচন্দ্র দ্বিজ রামায়ণের ঘটনাংশের অনুবাদ করেন। তিনিও রাজা নরনারায়ণের সভাকবি ছিলেন। কিন্তু কলাপচন্দ্র দ্বিজের ভূমিকায় কোন পুথি গ্রন্থাগারে বাংলা পুথির তালিকায় পাই নি।

অনন্ত কন্দলী নরনারায়ণের সভাকবি তথা রাজার বৈষ্ণব ধর্মের দীক্ষাদাতা শঙ্করদেবের দ্বারা অনুপ্রাণিত কবি ছিলেন। তিনি মূলত নাটগীত ধারায় কাব্য রচনা করেন বলেন অনুমান করা হয়। 'সীতার পাতাল প্রবেশ' তাঁর নাটগীতি শ্রেণীর রচনা। আবার ভাগবত অবলম্বনে 'কুমার হরণ' নামে রোমাণ্টিক আখ্যান কাব্য রচনা কথাও জানা যায়। অনন্ত কন্দলী রচিত 'রাজসূয় পর্ব' (পুথি নং ১০২) এবং অনুদিত 'ভাগবত দশম স্কন্ধ' (পুথি নং

১৯) কোচবিহারে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে আছে। মহারাজা নরনারায়ণকে তিনি "নৃপতি শ্রেষ্ঠতর" বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। অনন্ত কন্দলী ভাগবত দশম স্কন্ধের অনুবাদে নামমাহাত্ম্য জ্ঞাপন করে বলেছেন—

শুন নরনারী কৃষ্ণ চরিত্র বিচিত্র।
সাক্ষাতে অমৃত যেন পরম পবিত্র॥
কৃষ্ণের চরণে কহে অনন্ত কন্দলি।
ডাকি হরি বোলা পালাই যাওক পাপ কলি॥"[৪২]

মহারাজা নরনারায়ণের রাজত্বকালে সাহিত্য রচনার মুখ্য এবং উজ্জ্বলতম অধ্যায়টি বৈষ্ণব ধর্মবেত্তা মহাপ্রাণ শঙ্করদেবকে কেন্দ্রমণি করে গড়ে ওঠে। শঙ্করদেব কেবল আধ্যাত্মিক ভাবনায় নিজেকে ডুবিয়ে রাখেন নি, তাঁর রচিত সাহিত্যে কর্মের তালিকাটি দীর্ঘ—

(ক) কীর্তন ঘোষা বা লীলাপদ।

(খ) নাম ঘোষা বা ভজনপদ।

(গ) বরগীত বা পদগীতি। (ব্রজবুলিতে রচিত)

(ঘ) ভটিমা বা প্রশস্তিপদ। (ভটিমার প্রকারভেদ আছে। দ্বিবিধ ভটিমা যথাক্রমে দেব ভটিমা, ও রাজ ভটিম।)

(ঙ) নাট। (ব্রজবুলি বা কামরূপী-মৈথিলী ভাষায় রচিত একাঙ্কিকা বিশেষ যা রামায়ণ, মহাভারত বা ভাগবত অবলম্বনে রচিত হত।)

(চ) নিমি নরসিদ্ধি সংবাদ।

(ছ) ভক্তি প্রদীপ।

(জ) ভক্তি রত্নাকর। (সংস্কৃতে লেখা)

শেষ তিনটি রচনা ভক্তিতত্ত্ব নিয়ে রচিত।

শঙ্করদেবের অনেক অনুগামী কবি ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য তাঁর সুযোগ্য শিষ্য মাধবদেব। তিনিও গুরুর মত বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কোচরাজ দরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর জীবনের স্বর্ণপ্রসূ সময়ে তিনি নানা অনুবাদ এবং মৌলিক রচনা করেন। গুরু শঙ্করদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি বরগীত, ভটিমা, নাট প্রভৃতি রচনা করেন। বরগীত তাঁর গীতিকবি সুলভ বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল। তাঁর অন্যান্য রচনাগুলি হল—

(ক) ভক্তি রত্নাবলী (অসমীয়া পুথি নং-৯, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার)

(খ) শ্রীকৃষ্ণ জন্ম রহস্য (অসমীয়া পুথি নং ১৫, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার)

(গ) রাজসূয় কাব্য।

(ঘ) নাম ঘোষা। (জীবনের শেষভাগে রচিত)

মহাপ্রাণ শঙ্করদেবকে মধ্যযুগীয় কামতা কামরূপের সাহিত্যসাধনার কেন্দ্রবিন্দু বলা চলে। শোনা যায় রাজভ্রাতা শুক্লধবজ তাঁর স্ত্রী কমলপ্রিয়ার মুখে শঙ্করদেব রচিত "পামর মন রামচরণে মন দেহু" গানটি শুনে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, রাজসভায় শ্রীমন্ শঙ্করদেব প্রতিষ্ঠা পান এবং বৈষ্ণবধর্ম কোচবিহারে প্রচারিত হয়। তিনি একাধারে ধর্মপ্রচারক, নাট্যকার, গায়ক ও কবি। মহারাজ নরনারায়ণের অনুরোধে রচনা করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত 'ভাগবত পুরাণ' ও 'গুণমালা' নামে গ্রন্থ দুটি। যুবরাজ শুক্লধবজের অনুরোধে তাঁর ও মাধবদেবের একত্র প্রয়াসে রচিত হয় যমপুরাণের অনুবাদ। মানুষের মনের কাছে ভাগবত বা পুরাণ কথাকে নিয়ে যাওয়াই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। তাঁর অঙ্কিয়া নাটগুলির মধ্যে 'কালীয়দমন নাট', 'কেলিগোপাল নাট' 'পত্নীপ্রসাদ নাট' 'পারিজাত হরণ নাট', এবং 'রুক্মিনীহরণ নাটে'র সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। শঙ্করদেব ও তাঁর সাহিত্য সাধনা তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত।

এখানে আলোচনার স্বার্থে এই সুলেখক ও গায়ক মহাপুরুষের প্রসঙ্গ বিবৃত করলাম। শঙ্করদেব সম্পর্কে কেবল এটুকু বলা একান্ত প্রয়োজন, তিনি তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে যত রচনা করেছেন প্রতিটিই নানা অভিনবত্বে সমুজ্জ্বল। তাঁর রচিত অঙ্কিয়া নাটগুলির কাহিনীর উৎস পুরাণ বা ভাগবত হলেও সংস্কৃতি নাট্যরীতির তুলনায় তাঁর নাট্যরীতি অনেকটাই অভিনব। নাটগুলিতে অঙ্ক, দৃশ্য ইত্যাদি প্রবর্তনার ক্ষেত্রেও বিষয়টি অভিনব। তাঁর নাটকের ভাষা মধ্যযুগীয় প্রাচীনতার ছাপ এড়িয়ে অনেকটাই আধুনিক গন্ধী। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়।

"হে স্বামী আমার বহুত সতীনি, ইহার পারিজাত আনি কোন স্ত্রীক দেবা, তাহে বুঝয়ে নাহি— হামি কদাচিৎ তোমার সঙ্গ নাহি চাড়ব।" (পারিজাত হরণ-নাট।)[৪৩]

কোচবিহার রাজদরবার বা কামরূপ—আসামেও এই সময় নাট্যধর্মী সাহিত্য অভিনীত হওয়ার ঝোঁক ছিল। শঙ্করদেবের শিষ্য মাধব দেবের রচনা সৌকর্যও অতুলনীয়। মাধবদেব অনুদিত রামায়ণ আদিকাণ্ডে মহারাজা নরনারায়ণের প্রশস্তি থেকে অনুমান করা যায় তিনিও মহারাজা নরনারায়ণের পৃষ্ঠপোষণায় সাহিত্যচর্চা শুরু করেন—

"জয় জয় নরনারায়ণ হুই নৃপকুল শিরোমণি।
যাহার পরম প্রচণ্ড প্রতাপ ঢাকিল ইতো ধরণী"
সর্বগুণাকর যাহার সোদর শুক্লধবজ মহামতি।
পৃথিবীত যেন রাম লখখন প্রক্ষাত দুয়ো সম্প্রতি॥"[৪৪]

খান চৌধুরী আমানত উল্লার মতানুযায়ী মহারাজ লক্ষীনারায়ণের রাজত্বকালে শঙ্করদেব ও মাধবদেব কোচবিহারে আসলে তিনি তাঁদের সাদরে গ্রহণ করেন, এবং বৈষ্ণবধর্ম রাজধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি পায়। কিন্তু মাধবদেবের এই উক্তি প্রমাণ করে তাঁরা নরনারায়ণের রাজত্বকালেই কামতায় এসে উপস্থিত হন। পরবর্তীকালে মাধবদেবের রচিত 'নাম মালিকা'-র ভনিতায় মহারাজা নরনারায়ণের পুত্র লক্ষীনারায়ণের প্রশস্তি থেকে অনুমান করা যায় তিনি হয়তো লক্ষীনারায়ণের রাজত্বকাল পর্যন্ত কামতা রাজদরবারের সাহিত্য কীর্তিতে নিমগ্ন ছিলেন। ভণিতাটি নিম্নরূপ—

"জয় জয় লক্ষীনারায়ণ মহানৃপতির অগ্রগনি।
যাহার নির্মল যশস্যাসকল ঢাকিল ইতো ধরনী॥
জিতো দয়াময় উপধর্ম্মচয় করিয়া দূর সম্প্রতি।
দণ্ডি পাষণ্ডক সমস্ত লোকক করান্ত হরিত গতি॥"[৪৫]

মাধদেব রচিত 'নামঘোষা' দার্শনিক চিন্তাধারার উৎকৃষ্ট সংকলন। শঙ্করদেবের মত মাধবদেবের নাটপালাগুলি কিছুটা জনমুখীও হয়েছিল।

শঙ্করদেবের মত বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী না হলেও মাধবদেব ছিলেন যথার্থ কবিমনের অধিকারী এবং তার রচনাসম্ভারও বেশে ঈর্ষনীয়। তাঁর মৌলিক রচনাগুলির মধ্যে যেগুলির নিদর্শন পাওয়া যায় সেগুলির তালিকা নিম্নরূপ—

ক. ভক্তি-রত্নাবলী—এর একটি পুথি (অসমীয়া পুথি নং-৯) উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে আছে।
খ. শ্রীকৃষ্ণ জন্ম রহস্য—অসমীয়া পুথি নং-১৫ (উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার)
গ. রাজসূয় কাব্য—একটি রাজভ্রাতা শুক্লধবজের উৎসাহে রচিত।
ঘ. নামঘোষা—জীবনের শেষপর্বের রচনা। এতে কৃষ্ণের নামমাহাত্ম্য বর্নিত।

গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে মাধবদেবও বরগীত, ভটিমা, নাট প্রভৃতি রচনা করেন। মাধবদেব রচিত বরগীত তাঁর কবিত্ব শক্তির যথাযথ প্রস্ফুটন, এবং এগুলির যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ছিল। এছাড়া আদিকাণ্ড রামায়ণ তিনি অনুবাদ করেন। তাঁর রচিত চোরধরা নাট, 'অর্জুন ভঞ্জন নাট', 'ভূমিলুটুয়া নাট', 'ভোজন ব্যবহার নাট', 'কোত্রাখোলা নাট', 'পিপিড়া গুছুয়া নাট' এবং 'রাসঝুমুর' আজও কোচবিহারে বৈষ্ণব পদগানের আসরে গীত হয়। একথা সত্য যে শঙ্করদেব বা মাধবদেব রচিত বিপুল সাহিত্যকীর্তি অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাসের অংশীদার হয়ে পড়ায় স্থানিক ইতিহাস বেত্তারা ক্ষুব্ধ, কারণ কোচবিহারের মাটিতে বসে রচিত এই সাহিত্যকীর্তি গুলি মধ্যযুগের অসমীয়া সাহিত্যের বিষয় গৌরব যতটা বাড়িয়েছে, বাংলা সাহিত্যের ততটাই ক্ষতি হয়েছে। বিশেষত মধ্যযুগে, যেখানে বাংলা এবং কামরূপী ভাষার মূলগত পার্থক্য তখন গড়ে ওঠেনি তখন নির্বিচারে এই সাহিত্য সম্ভারের অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান করে নেওয়া নিয়ে তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তবে সঙ্গতভাবেই এ প্রসঙ্গে একথা বলা প্রয়োজন যে আলোচ্য বিবাদের যথার্থ সমাধান ভাষাতাত্ত্বিকের আওতায় পড়ে। শঙ্করদেবের অন্যতম প্রধান শিষ্য দামোদর দেবের রচিত কিছু বরগীতের সন্ধান পাওয়া যায়। মাধবদেবের শিষ্যদের মধ্যে গোপাল আতা, রামচরন ঠাকুর প্রমুখের নাম পাওয়া যায়। এদের মধ্যে গোপাল আতা 'ঘোষারত্ন' 'শঙ্খচূড় বধ' 'মহিষাসুর বধ' প্রভৃতি পদাবলী এবং পালাগান রচনা করেন। রামচরন ঠাকুর রচনা করেছিলেন 'শঙ্করচরিত'। এই রচনা কোচ রাজসভাশ্রিত সাহিত্য ভাণ্ডারে জীবনীসাহিত্য রচনার প্রমাণ দেয়। গৌড় বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের হাত ধরে শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে উৎকর্ষতা সাধিত হয়েছিল, সুদূর-পূর্ব প্রান্তেও তার অনুরূপ ঘটনা ঘটে। শঙ্করদেব, মাধবদেব, দামোদরদেব বা তাঁদের শিষ্য দ্বারা পরিচালিত বৈষ্ণব সত্রগুলি সমকালীন সাহিত্য, শিল্প, কৃষ্টির উন্নতি বিধানে তথা শিক্ষার বিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্বকালে সাহিত্যচর্চা

পরবর্তীকালে মহারাজা নরনারায়ণের পরলোকপ্রাপ্তির পর সিংহাসনে বসেন মহারাজা লক্ষীনারায়ণ। পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ মহারাজা লক্ষীনারায়ণও সাহিত্যচর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁর রাজত্বকালের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কবি হলেন গোবিন্দ মিশ্র, বিপ্র বিশারদ, ভট্টাদেব এবং দৈত্যারী ঠাকুর। এছাড়া গোপাল দ্বিজ ও রাম রায় নামে দুজন রচয়িতা শ্রীমদ্ভাগবত গীতার কয়েকটি পর্বের (মতান্তরে ১৮ পর্বেরই) অনুবাদ করেন। তিনি ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি। অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি শঙ্করাচার্য, অনঙ্গগিরি শ্রীধর স্বামী ও হনুমন্তের টীকার সাহায্য নিয়েছিলেন বলে জানা যায়। রাজার নির্দেশে ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সিদ্ধান্ত বাগীশ 'শিবরাত্রি কৌমুদী' 'মন্ত্রদীক্ষা কৌমুদী' 'একাদশী কৌমুদী' ও 'গ্রহণ কৌমুদী' সংকলন করেছিলেন বলে জানা যায়। এই সময়েই বিপ্র বিশারদ বা বিশারদ চক্রবর্তী নামে কোন কবি মহাভারতের বিরাট, বন ও কর্মপর্বের অনুবাদ করেন। তবে তাঁর রচনাগুলির মধ্যে কেবল 'বিরাটপর্ব' সম্পর্কেই তথ্যাদি পাওয়া যায়। বিপ্র বিশারদ তাঁর আত্মপরিচয় দিয়েছেন—

"রত্নপীঠে লক্ষীনারায়ণ নৃপবর।
বিহার কামতা নাম তাহার নগর॥
বিজ্ঞ বিপ্র এক সেহি নগরত বাস।
বিশারদ চক্রবর্তী গায় উপন্যাস॥
বিরাটের পদ সেহি কৈল লোক বসে।
বেদ বহ্নি বান চন্দ্র শাকে চৈত্রমাসে॥"[৪৬]

সময়কালে মহাভারতের পদ অনুবাদের আর একটি প্রচেষ্টা হল 'জৈমিনী সংহিতা' অনুসরণে রামচন্দ্র নামে

এক কবির অশ্বমেধপর্বের অনুবাদ। শঙ্করদেবের পৌত্র পুরুষোত্তম ঠাকুর এই সময় কোচবিহারের ভেলাডাঙায় বাস করতেন। তিনি রচনা করেছিলেন 'নব ঘোষা।' শঙ্করদেবের মৃত্যুর পর তাঁর অন্যতম শিষ্যদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে দামোদরদেব মাধবদেব থেকে ভিন্ন হয়ে 'দামোদরিয়া একশরণ' বৈষ্ণব মত প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মহারাজা লক্ষীনারায়ণকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন এবং রাজগুরু রূপে পূজিত হতেন। দামোদর দেবের নির্দেশেই তাঁর শিষ্য কেশবচরণ দেব কোচবিহারের বৈকুণ্ঠপুর সত্রে অবস্থানকালীন অনুবাদ করেন ভাগবতের নবম স্কন্ধ। দামোদর দেবের অন্যতম প্রধান শিষ্য গোপালচরণ দ্বিজ দামোদরপুর সত্রে বসে ভাগবতের তৃতীয় ও অষ্টম স্কন্ধ এবং বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদ করেন। কবিরত্ন ভট্টদেব ছিলেন দামোদরদেবের প্রধান এবং প্রিয় শিষ্য। তিনি বৈষ্ণবধর্মে সুপণ্ডিত ছিলেন। দামোদরদেব তাঁকে আদেশ দিয়েছিলেন সর্বজন বোধ্য ভাষায় পুরাণ ভাগবতের অনুবাদ করতে। গদ্যভাষারীতি প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তাও হয়তো এই সময় দামোদরদেবের অনুমান করে থাকবেন। তাঁর প্রেরণায় ভট্টদেব ভাগবতী ধর্মের মূলস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা এবং রত্নাবলী এই তিনটি পুথিকে সুন্দর সুশ্রাব্য কথ্য গদ্যভাষায় রচনা করেছিলেন—

"প্রভুর আজ্ঞায় বাঢ় স্কন্ধ ভাঙি
কথারূপ করিলন্ত॥
গীতা রত্নাবলী কথা রূপে তাকো
করিলন্ত বিরচন।
স্ত্রী শুদ্র শিশু সমস্তে বুঝয়
পঢ়ন্তে নাহি দুষণ॥"[৪৭]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য শঙ্করদেব ও মাধবদেবের রচিত অঙ্কিয়া নাট গুলিতে ছন্দবাধাকে ভেঙে গদ্য ভাষা ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু ব্রজবুলির প্রাচুর্যের ফলে গদ্যভাষার চলনটি আলাদাভাবে চোখে পড়ে না। কোচবিহারে অবস্থানকালীন ভট্টদেব আরো কয়েকটি বরগীত এবং সংস্কৃত ভক্তিমূলক গ্রহ রচনা করেছিলেন। মহারাজা লক্ষীনারায়ণের রাজত্বকালেই দৈত্যারি ঠাকুর তাঁর গুরুচরিত কাব্যখানি রচনা করেন। এই গ্রন্থে ধর্মগুরু ও কবি মাধবদেবের কোচবিহারে অবস্থান এবং সেই সময় মহারাজা লক্ষীনারায়ণের রাজসিংহাসনে আসীন থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থ অনুযায়ী কোচবিহারে মাধবদেবের মৃত্যু হয় ষোড়শ শতকের শেষভাগে (১৫৯৬)।

পরবর্তী মহারাজা বীরনারায়ণঃ কবিশেখর ও মহাভারতের কিরাতপর্ব

লক্ষীনারায়ণের পর পরবর্তী মহারাজা বীরনারায়ণ (১৬২৭-১৬৩২) তাঁর স্বল্প রাজত্বকালে রাজ্য পরিচালনার পাশাপাশি শিল্প সাহিত্যানুরক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে কবিশেখর নামে এক কবি মহাভারতের কিরাতপর্বের অনুবাদ করেন। কবিশেখর মহারাজা বীরনারায়ণের সভাকবি ছিলেন কিনা তা বোঝা যায় না। স্বভাববিনয়ী এই কবি তাঁর বিদ্যাবত্তা ও কবিত্ব প্রসঙ্গে সবিনয়ে লিখেছেন—

"নহেঞো পণ্ডিত আমি অন্ধক সমান।
গুরুরূপে জে দিলেক জ্ঞান দিষ্টি দান॥
নাহি শাস্ত্রজ্ঞান আমি কাব্য না পরিছি।
জনমে অধীন নর নাথক সেবিছি॥

কাব্যকোস অলংকার না জানি বিসেষ।
ভারথ পুরাণ নাহি সুনি সাবশেষ॥
তথাপিত রাজ আজ্ঞা লাগে পালিবাক।
এতেকে অধিক দোষ না দিবা আমাক॥"[৪৮]

তাঁর আত্মপরিচয় অংশ থেকে জানা যায় তিনি ছিলেন চন্দ্রসেনের দৌহিত্র, তাঁর পিতার নাম ভবানন্দ। কিরাতপর্বের রচনাকাল হিসাবে জানা যায়—

"সিন্ধুপক্ষ বান বিধু সকের সময়।
মকরত দেব দিনকরের উদয়॥
গুরুর দিনশ্য পঞ্চ মি পক্ষ পরধান।
কাননে কুসুম কর করিল প্রস্থান॥
সুগন্ধ সমির দসোদিসে সঞ্চারিল।
মন মথিবাক মনে মনোজ মিলিল॥
জন্মে জন্মে বিরনারায়ণ নরেশ্বরে।
যদি জন্মে নরতনু বিহার নগরে॥
ভবানন্দ নামে চন্দ্র সেনের নন্দন।
নিজ ধর্মে কত নিজ কুলের মণ্ডল॥
হেন মহাসয়ের তনয় অল্পমতি।
বোলো রাম কৃষ্ণ কবিসেখর বদতি॥"[৪৯]

সুতরাং প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৫২৭ শকাব্দে মাঘ মাসের পঞ্চমী তিথিতে বৃহস্পতিবার তিনি কিরাতপর্ব রচনা করেন। যদিও কোচবিহারের রাজপরিবারের ইতিহাসের আদি রচয়িতা জয়নাথ মুন্সী তাঁর রাজোপাখ্যান রচনায় জানিয়েছেন বীরনারায়ণের রাজত্বকাল ১৫৪৩-১৫৪৮ শকাব্দ। সেক্ষেত্রে ১৫২৭ শকাব্দ বীরনারায়ণের রাজত্বকালে কবিশেখরের কিরাতপর্ব রচনার কথা যুক্তিগ্রহ্য হয় না। অনুমিত হয় মহারাজা রচনা থেকেও জানা যায়। লক্ষীনারায়ণ অবিরাম যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যস্ত থাকায় রাজ্যশাসনের ভার বীরনারায়ণের হাতে সমর্পিত থাকে। ১৬১৪ খ্রিস্টাব্দে নাগাদ লক্ষ্মীনারায়ণ মোগল সৈন্যের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন একথা খান চৌধুরী আমানতউল্লার গ্রন্থে জানা যায় এমনই কোন সময়ে রাজসিংহাসনে বীরনারায়ণ আসীন থাকাকালীন কবিশেখর কাব্যরচনা করেছিলেন এমনটা হতেই পারে। কবিশেখরের রচনা সুখপাঠ্য, কাব্যভাষা গীতি কবিতা সুলভ পেলব।

"অন্তস্পুরত রাজরমনী।
মল্লিকামালায় কবারীসাজ
সুরঙ্গ সিন্দুর ভালেপিঞ্চিল।
খঞ্জন গঞ্জন চারু অঞ্চল।
যেমন কামবানে গেড়ল দিয়া।
তথাপি তরুণ তঙ্কর ডরে।
উরুর শোভা কইতে না পারি।
চরণ কমল মনক লোভা
বেশ করে সুনি মনোমোহিনী॥
নীলগিরী যেন গঙ্গার মাঝ॥
পূর্ণচন্দ্র যেন অগ্নি লাগিল॥
লোচন যুগলে লেপি কজ্জল॥
ভুরু শরাসনে থুইল জুড়িয়া॥
উপরে হেমঘণ্টাধবনি করে॥
যেন রামরম্ভা মানিছে হারি॥
মওগজ জিনি চরণশোভা॥

তাতে রুনুঝুনু নুপূর বাজে। জগত জিনিতে সদন সাজে॥
বীরনারায়ণ নৃপতি মণি। কবিশেখরের মধুর বাণী॥[৫০]

মহারাজ বীরনারায়ণের রাজত্বকালে নীলকণ্ঠদাস রচনা করেছিলেন 'শ্রী শ্রী দামোদর চরিত্র'। এই গ্রন্থ অনুসারে দামোদর দেবের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ মহারাজা বীরনারায়ণের উদ্যোগে সম্পন্ন হয়েছিল।

মহারাজা প্রাণনারায়ণের রাজত্বকালে সভাসাহিত্য

মহারাজা বীরনারায়ণের পুত্র প্রাণনারায়ণের রাজত্বকালেও কোচবিহার সভাসাহিত্যের জয়যাত্রা অব্যাহত ছিল। মুন্সী জয়নাথ ঘোষের 'রাজোপাখ্যান' গ্রন্থ থেকে জানা যায় মহারাজা প্রাণনারায়ণ সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যকরণ ও স্মৃতিশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন—"প্রাণনারায়ণ রাজা হওাতে দেশ উজ্জ্বল হইল। ধর্ম্মকৃয়া ও ধর্ম্মালাপ সর্বত্র হইতে লাগিল। রাজা ব্যাকরণ স্মৃতি সাহিত্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রুতিধর ও দ্রুত কবিতা রচনা করিতে পারিতেন।" "অসমিয়া সাহিত্যের রূপরেখা' গ্রন্থে ড. মহেশ্বর নেওগ মন্তব্য করেছেন "পচিশ অধ্যায়ের ক্রিয়াযোগসার ভনিতাত প্রাণনারায়ণের নাম আছে।" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬২১৪ নং পুথির ৪৪ পত্রাঙ্কে প্রাণনারায়ণের ভনিতা দেখা যায়—

"ক্রিয়াযোগ পুন্য কথঅ শ্লোক অর্থসারে।
সকলে না বুঝে তাহা পরাকৃত পরে॥
এতেক পয়ার শ্লোক অর্থ অভিপ্রায়।
প্রাননারায়ণ কহে অষ্টম অধ্যায়॥
অসার সংসার মাঝে সার নারায়ণ।
পূজহ গোবিন্দপদ লইয়া স্বরন॥
মঙ্গলের বাঞ্ছা লোক যদি মনে থাকে।
পূজহ গোবিন্দপদ ভক্তি অতিরেকে।
কৃয়া জোগসার কথঅ সুধাময় সার।
প্রাণনারায়ণে কহে লোকে বুঝিবার॥"[৫১]

মহারাজা প্রাণনারায়ণ নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং সাহিত্যনুরাগী ছিলেন। তাঁর সমকালে সক্রিয় পৃষ্ঠপোষণায় সভাসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। তার রাজত্বকালে অনেক কবিই কাব্যরচনা করেছিলেন যাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ। এছাড়াও অন্যান্য যে সভাকবিরা এই সময় কাব্য রচনা করেছিলেন তাঁরা হলেন শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের পিতা দ্বিজ রামেশ্বর, শ্রীনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণ মিশ্র, দ্বিজ কবিরাজ বিশারদ কবি, রামরায়, দ্বিজ রামেশ্বর প্রমুখ।

সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ যে বহুচর্চিত নাম নন তা সাহিত্যের ইতিহাসের অসম্পূর্ণতাকে প্রকট করে। অনুবাদ শাখায় তাঁর দক্ষতা প্রশ্নাতীত। তিনি মহাভারতের আদিপর্ব অনুবাদ সমাধাকরে দ্রোণপর্বের এক বিরাট অংশ অনুবাদ করেন। মূলের প্রতি অনুগত থাকলেও মৌলিক ভাবনার বহিঃপ্রকাশও দুর্লক্ষ্য নয়। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে তাঁর আদিপর্ব অনুবাদের একটি পুথি (পুথি নং ৭৭) আছে। তিনটি পুথি সংগৃহীত আছে কোচবিহার সাহিত্য সভার গ্রন্থাগারে (পুথি নং ১,২, এবং সংস্কৃত পুথি নং ১৪)। শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের রচনা সম্ভবত জনপ্রিয় হয় অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, কারণ একাধিক অনুলিপি পাওয়া গেছে এই সময়কালের মধ্যে। শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের রচনার মূল চারিত্রিক লক্ষণই হল ভাষার সতেজতা

মূলানুগত্য। যদিও সংস্কৃত কাহিনীর কোন কোন অংশ মধ্যযুগের প্রান্তিক বাংলার কবির জীবনবোধে না মিললে তিনি তাকে নিজের দেশ-কালের মত করে পরিবেশন করার কাজটি করেছেন। কাহিনীর সূত্রপাত দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার অখ্যান দিয়ে—

"পথশ্রমে পরিশ্রান্ত হৈল মহিপাল।
উত্তম উদ্যান এক দেখিল সেকাল॥
সর রিতুয় ফল পুষ্প সমন্নিত।
নানাবিধ তরুলতা হৈছে প্রফুলিত॥
নানাবিধ সব্দ পক্ষি দেখে সুসোভন।
ভৃঙ্গরায় মৈয়র ককিল খঞ্জন॥"[৫২]

কবি শ্রীনাথ আদি পর্বের রচনার ভনিতায় মহারাজ প্রাণনারায়ণের উল্লেখ করে বলেছেন—

"প্রাণনারায়ণ দেব আজ্ঞা পরমানে।
ভারতের পয়ার রচিল সুবন্ধানে॥
আদিপর্ব মহাভারতের কথাচয়।
শ্রীনাথ ব্রাহ্মণে পদবন্ধে বিরচয়॥"[৫৩]

পঞ্চ পাণ্ডব জননী কুন্তীর বিলাপ মর্মস্পর্শী হয়েছে তাঁর রচনায়—

"গগনে গরজে মেঘ রাত্রি গেল প্রহরেক
দেখি অন্ধকার নিশীথিনী।
বৎস না দেখিয়া জেন ধেনু হাম্মলায় ঘন
কান্দে মাও লোটায়া ধরনী॥
জৌবনত মরে পতি হৈলো মুঞি নিলাখতি
পঞ্চ গুটি পুত্র পালোঁ দুঃখে।
দুর্যোধন দুরাচার জত্ন করে মরিবার
দেষত না পাইলো ঠাই সুখে॥
দুর্যোধন দুরাচার বিষ দিলো মারিবার
ভীমক ফেলাল্য গঙ্গাজলে।
জতুগৃহ কৈল ঘোর পুত্রক মারিতে মোর
ভাগ্য এড়াইলো কর্ম্মফলে॥"[৫৪]

আদিপর্বে কোথাও আত্মপরিচয় দিয়ে যান নি কবি, অথচ "শ্রীনাথ" ভনিতায় অন্য একটি মহাভারতের পুথিতে আত্মপরিচয় দিয়েছেন—

"মল্লমহিপালের কনিষ্ঠ সহোদর।
শুক্লধবজ নামে দেব ভোগে পুরন্দর॥
তাহার পাঠক মহামাত্য ভবানন্দ।
কামরূপ-দ্বিজকুলকুমুদিনী চন্দ্র॥

নামত পণ্ডিত রায় তাহার তনয়।
রঘুদেব নৃপতির পাত্র মহাশয়॥
তাহার কনিষ্ঠ রামেশ্বর শুদ্ধমতি।
শ্রীনাথ হইলেন জ্যেষ্ঠ তাহার সন্ততি॥"[৫৫]

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত দ্রোণপর্বের দুটি পুথির তুলনামূলক পাঠবিচার করে জানা যায় শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ যে পুথিটি অসমাপ্ত রেখেছিলেন সেটি সম্পূর্ণ করেন দ্বিজ কবিরাজ। দ্বিজ কবিরাজের ভনিতায় মহারাজা মোদনারায়ণের প্রশস্তি থেকে অনুমান করা যায় দ্বিজ কবিরাজ মহারাজা মোদনারায়ণের পৃষ্ঠপোষণায় কাব্যচর্চা করতেন।

শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ রাজসভাসদ ও রাজার মনোরঞ্জনার্থ কাব্যরচনা করতেন সচেতনভাবে। ফলে তার রচনা লৌকিক নানা ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করে রাজসভাগন্ধী বিদগ্ধ সাহিত্য হয়ে উঠেছিল। "দ্রৌপদীর স্বয়ংবর" অংশে তাঁর রচনাসৌকর্যের প্রতিফলনের কিছুটা উল্লেখ করি—

"অনন্তর দ্রৌপদীক পুরস্ত্রী সকলে।
বিধিমতে স্নান করাইল কুতুহলে॥
গোরচনা তীর্থজল কুমকুম চন্দনে।
দ্রৌপদীক স্নান করাইল ত্রয়োগণে॥
তারপর সখীগণে করাইল বেশ।
আগরের ধূপ দিয়া শোন্দাইল কেশ॥
বান্ধিল কবরী যেন মদনের ছায়া॥
সিন্দুর তিলক দিল তার কামছায়া॥
খোপার উপর দিল দিল মল্লিকার মালা।
মনমৃগ বন্দী করিবার যেন ছলা॥
লোচনযুগলে চারু পিন্দাল অঞ্জন।
কমল দলত যেন বসিল অঞ্জন॥
অঞ্জনের রেখা দিল ভ্রুযুগে লেপন।
কামদেব ধনুত যেন চড়াইল গুণ॥
রবি শশী জ্বলে যেন কর্ণত কুণ্ডল।
লাবণ্যলতার যেন গোটা দুই ফল॥
নাসার উপর শোভে মুকুতার ফল।
তিলপুষ্পে পড়িয়াছে যেন হেমজল॥
কুচের উপর শোভে মুকুতার হার।
সুমেরু শিখরে যেন গঙ্গাজলধার॥
করত কঙ্কণ শোভে বলয়া ভূজত।
চন্দ্রকলা শোভে যেন আকাশ তলত॥
চরণে পিন্দাল দুই বাজন নুপুর।
রাজহংস সকলের গর্ব গেল দূর॥
কুসুমে রঞ্জিত বস্ত্র দেবাঙ্গ ভূষণ।

পারিপাটি করিয়া পিন্দাইল সখীগন॥
বিবাহ মঙ্গলসূত্র বান্ধিল মদনী।
রুচিকর হৈল যেন দ্রুপদনান্দিনী॥"[৫৬]

কবি শ্রীনাথকে অনেকে পরবর্তী কালের কবি রামসরস্বতীর সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রামসরস্বতী নামে পরবর্তীকালে সে কবি খ্যাতিমান হয়েছিলেন তিনি মহারাজা মহীন্দ্রনারায়ণের সমসাময়িক। ফলে দুই কীর্তিমান কবি কখনই অভিন্ন হতে পারেন না।

মহারাজা মোদনারায়ণ ও সভাসাহিত্যের উত্তরাধিকার

মহারাজা মোদনারায়ণের রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য কবি হলেন দ্বিজ কবিরাজ। ইনি শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের অসমাপ্ত দ্রোণপর্বের অনুবাদ সমাপ্ত করেন। সম্ভবত দ্বিজ কবিরাজ পূর্ববর্তী মহারাজার রাজত্বকালের শেষভাগে রাজসভার কবি মণ্ডলের আসন লাভ করেন। পরবর্তীকালে সভাসাহিত্যের মূল ধারাটি তাঁর কবিখ্যাতিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। 'দ্রোণ পর্ব' ছাড়াও তাঁর আর যে সাহিত্যকীর্তিগুলির কথা জানা যায় সেগুলি হল উদ্যোগপর্ব এবং গদাপর্ব। তাঁর গদাপর্বের পুথিটি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে সংরক্ষিত আছে (পুথি নং ২)। গদাপর্বের সূচনায় রাজপ্রশস্তি করে দ্বিজ কবিরাজ লিখেছেন—

"ভুবন মুহন মোদনারায়ণ
রাজা লভোন্তক জয়।
সুখিয়ে দেষ জার প্রসাদত
অন্ন বস্ত্রে বিপ্ররচঅ॥
কথাকো না জয়া কাকো না ডরাঅ
সদা বন্ধ আদি করে।
সেরি শাসগ্রাম সাধি নিজ কাম
ভব সাগরক তরে।
তাহার পিতৃর প্রাণ নৃপতির
জথা অজ্ঞা পরমানে।
ভকতি শ্রদ্ধায় স্বদেষ ভাষায়
দ্বিজ কবিরাজ ভনে॥"[৫৭]

আবার অন্যত্র ঃ

"চিরঞ্জীব নৃপমনি মোদনারায়ণ।
কেশোর বয়স রূপে মদন মোহন॥
জার রূপ দেখিল মাত্র সর্ব্বলোক।
শান্ত হয়া শন্তোশে পাশোরে দুঃখশোক॥
শরির যুড়ায় আপ্যাইত হয় প্রাণ।
চন্দ্র দেখি তৃশীত চকোর জে বন্ধান॥
সপ্ত রবীশতে ভূজে ভূভারক বহে।

ভালে শে আগমে জল্পীশের অংশ কহে।
ধন্য ধন্য অনুপ কুমারী দেবী আই।
ঈহেন পুত্রক গর্ভবাসে দিছে ঠাই॥
দ্বিজ কবিরাজে তার পীতৃর আজ্ঞায়।
গদাপবর্ব পদ ভনে স্বদেষ ভাষায়॥"[৫৮]

এই রচনাংশ গুলি থেকে বোঝা যায় দ্বিজ কবিরাজ মোদনারায়ণের পিতা প্রাণনারায়ণের আদেশে গদাপবর্ব রচনা শুরু করেছিলেন। হয়তো প্রাণনারায়ণের আজ্ঞায় রচনা শুরু হলেও মোদনারায়ণের রাজত্বকালে রচনাকার্য সম্পূর্ণ হয়। তা না হলে মেদনারায়ণকে লক্ষ্য করে রাজপ্রশস্তি এত দীর্ঘ হত না। মূল মহাভারতের শল্যপর্বের গদাযুদ্ধ বিষয়ক অংশ দুর্যোধনের হ্রদে প্রবেশের ঘটনার সঙ্গে সৌপ্তিক পর্বের অংশবিশেষ যোগ করে দ্বিজ কবিরাজ সেই অনুদিত অংশের নাম দিয়েছেন গদাপর্ব।

মহারাজা মোদনারায়ণের রাজত্বকালে অপর এক বিস্মৃতপ্রায় কবি যদুমণির রচনা আবিস্কৃত হয় উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে অসমিয়া পুথি সম্ভারের মধ্যে। এই কবি সভাপর্বের জরাসন্ধ বধের অংশ নিয়ে রচনা করেছিলেন 'সুবর্ণ ঘটিকা পদ'। এই পুথিতে আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে কবি বলেছেন—

"জয় জয় মহারাজ মোদনারায়ণ।
দুঃখিতের কল্পতরু সঞ্জন রঞ্জন॥
তাহার দেশত এক জদুমণি নাম।
করজোড়ে সমস্তক করহ প্রণাম॥
বাড়াতুটা পদদোষ ক্ষেমিবা আমার।
কৃষ্ণকথা শুনিসবে করিবা সাদর॥"[৫৯]

জরাসন্ধ বধের পরিকল্পনা হল আলোচ্য গ্রন্থটির বিষয়বস্তু। কিন্তু কবি সম্ভবত শ্রোতা মনোরঞ্জনের জন্য প্রচুর কল্পিত কাহিনীসূত্রের অবতারণা করেছেন। ভীম ও জরাসন্ধের মল্লযুদ্ধের ঘটনাটি অনুবাদের পাশাপাশি এখানে স্থান পেয়েছে এক অভিনব সোনার ঘোড়ার কাহিনী। যমরাজ একটি সুবর্ণঘোটকীর পিঠে চড়ে মগধে আসেন এবং কি ছলে জরাসন্ধের মন ভোলান তা বর্ণিত। পুথিতে কোথাও ঘোটকী বলা নেই, বরং বারবার ঘটিকা বা ঘুটিকা বলা হয়েছে। ফলে 'সুবর্ণঘোটকী' উচিত শব্দ হলেও 'সুবর্ণ ঘটিকা পদ' নামেই এই কাব্যের পরিচিতি। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়—

"কিন্তু একখানি মুঞি চাহোঁ বলিবাক।
সুবর্ণ ঘুটিকাখানি দিয়োক আমাক॥"[৬০]

মহারাজা মোদনারায়ণ নিঃসন্তান থাকায় রাজ্যের ক্ষমতা আত্মসাৎ করার লোভে রাজ্যের ছত্রনাজির মহীনারায়ণ এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জগৎনারায়ণ নানা রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করতে থাকেন। অবশেষে তা রাজদ্রোহে পর্যবসিত হয়। পরবর্তীকালে মহারাজা মোদনারায়ণ কঠোর হাতে সেই বিদ্রোহ দমন করেন। যদুমনির রচনায় সেই রাজদ্রোহ উপদ্রুত কোচবিহারের বর্ণনা আছে—

"বিহারে কামতাপুরী সত্যবতী।
স্বর্গপুর শোভে যেন পুরী অম্রাবতী॥
তার পতি মোদ ভূপ প্রচণ্ড কেসরি।

তাহার ভয়ত কম্পমান সববৈরী॥
রাত্রি নিদ্রা করে না মুখে না করে ভোজন।
থরহরি কম্পে সদা চমকিত মন॥
একথা থাকোক আপনার করা কাম।
নিরন্তরে সভাসদে বোলা রাম রাম॥"[৬১]

এখানে রাজভয়ে ভীত রাজদ্রোহী বর্ণনা জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

মহারাজা মহীন্দ্রনারায়ণ ও তাঁর সভাসাহিত্য

মহারাজা প্রাণনারায়ণের দেহান্তের পর থেকে প্রায় শতাধিক বছর সভাসহিত্যের বহুমুখী ধারা কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। প্রাণনারায়ণের রাজসভায় মিলিতভাবে সাহিত্যরচনা করেছেন এমন কবিও অপ্রতুল নন। কিন্তু মোদনারায়ণের সময়কার রাজনৈতিক অস্থিরতাই সম্ভবত সাহিত্যরচনার ধারা স্তিমিত হয়ে আসার মূল কারণ। পরবর্তীকালে মহারাজা মহীন্দ্রনারায়ণ তাঁর রাজত্বকালে উদার পৃষ্ঠপোষণা করলেও খুব বেশী কাব্যরচনার উল্লেখ পাওয়া যায় না। খান চৌধুরী আমানতউল্লা তাঁর "কোচবিহারের ইতিহাস" গ্রন্থে দ্বিজ রাম কবিরাজ অথবা রামসরস্বতী রচিত ভীষ্মপর্বের উল্লেখ করেছেন।

"মধুর ভারত পদ সুন সবে সভাসদ
আপদের তরণ-তরণি
নিদগতি দ্বিজ রাম অকপটে বোল রাম
চিন্তা কর চিত্তে চিন্তামণি॥"[৬২]

অন্যত্র, এই পুথিতেই,

"কমতার পতি মহিন্দ্র নৃপতি
তার আজ্ঞা পরমানে
নিদগতি রাম ছাড়ি আন কাম
রাম বল যত জনে॥"[৬৩]

মহারাজা মহীন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে দ্বিজ দেবনাথ নামে অপর এক কবি রচনা করেন 'জন্মাষ্টমী'। শ্রীকৃষ্ণের জন্মবিবরণ এই কাব্যের উপজীব্য। সম্ভবত বৈষ্ণব ধর্মালম্বী রাজপরিবারের সভাসাহিত্যকে মহাভারত বা রামায়ণ অনুবাদের গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত করার জন্যই তাঁর এই মৌলিক প্রয়াস—

"নমস্কার করি নন্দ নন্দের চরণ।
সরস্বতি গনপতি করিয়া স্মরণ॥
পদ করিবার হেতু করিয়াছি মন।
জন্মাষ্টমী মাহাত্ম্য জন্মরহস্য কথন॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া নারদ তপোধন।
ব্রহ্মা সন্নিহিতে জায়া বলিল বচন॥
সুন পিতামহ এক করি নিবেদন।
জন্মাষ্টমী ব্রতফল করহ শ্রবণ॥"[৬৪]

পুথিটি ক্ষুদ্রায়তন, কিন্তু আগাগোড়া সুললিত ভাষায় রচিত।

মহারাজা উপেন্দ্রনারায়ণ এবং সমকালীন অস্থিরতার অভিঘাত

মহারাজা মহীন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকাল থেকেই মোগল সেনাদের আক্রমণে পর্যুদস্ত হতে থাকে কোচবিহারের বোদা, পাটগ্রাম, কাকিনা, ফতেপুর, বামনডাঙা, ঘড়িয়ালডাঙ্গা প্রভৃতি চাকলাজাত। পরবর্তীকালে কিছু অংশ মহীন্দ্রনারায়ণ আপন অধিকারভুক্ত করতে পারলেও অনেকটাই হাতছাড়া হয়ে যায় পরবর্তী মহারাজা রূপনারায়ণের রাজত্বকালেও (১৭০৪-১৭১৪ খ্রিঃ) এমনই অস্থির সময়ে রাজাসনে আসীন হন মহারাজা উপেন্দ্রনারায়ণ (১৭১৪-১৭৬৩ খ্রিঃ)। এই সময় মোগল উপদ্রবে উপদ্রুত কোচবিহারে সুযোগ বুঝে আঘাত হানে ভূটানের সেনাদল। ফলে এই অস্থির সময়ে স্বাভাবিক ভাবেই মন্দীভূত হয়ে আসে সাহিত্যচর্চা। এই সময়কার দুজন কবির নাম জানা যায়—শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ (বিরাট পর্ব রচয়িতা) ও নারায়ণ দ্বিজ। খান চৌধুরী আমানতউল্লা উল্লেখ করেছেন নারায়ণ দ্বিজ রাজভ্রাতা কুমার খড়্গ নারায়ণের আদেশে 'নারদীয় পুরাণ' অনুবাদ করেন।[৬৫] কোচবিহার সাহিত্য সভায় ৩ নং পুথিখানিই হল উপেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকালে শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ রচিত বিরাটপর্বের পুথি।[৬৬] এই পুথির শুরুর দিকে আত্মপরিচয় জ্ঞাপক অংশে জানা যায়—

"মোহা পূর্ণবান উপীন্দ্র নারায়ণ
বেহার নগর ধামে।
তার রার্যে ঘর কৃষ্ণর কিঙ্কর
রচিল মূঢ় অজ্ঞানে॥"[৬৭]

রচনায় অনেক স্বাভাবিক রীতিনীতির উল্লেখ রচনাটিকে হৃদয়বেদ্য করেছে—

"বসিতে আসন দিল উচিত বেভার।
কর্পূর তাম্বুল দিল কৈল সতকার॥"[৬৮]

রাজভ্রাতা কুমার খড়্গনারায়ণের আদেশে নারায়ণ দ্বিজ নারদীয় পুরাণের অনুবাদ করেন। এর একটি অনুলিপি কোচবিহার রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত (পুঁথি নং ২৮)। এই পুথিকে রচয়িতা 'পুণ্যসংহিতা' নামে অভিহিত করেছেন—"ইতি শ্রী নারদীয় পুরাণে গঙ্গামাহাত্মে পুণ্য সংহিতা সমাপ্তঃ সাকে ১৭২৩ যবননৃপতেঃ সকাব্দা ১২০৮ রত্নাপীঠস্য নৃপতে যকাব্দা ২৯২" (পুষ্পিকা, পুথি নং ২৮)।[৬৯]

মহারাজা উপেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর শিশু রাজকুমার দেবেন্দ্রনারায়ণের রাজ্যাভিষেক হয়, কিন্তু পরে দুর্দান্ত ও লোভী রাজগুরুর চক্রান্তে তিনি হত হন (১৭৬৩-১৭৬৫)। ফলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় রাজ্যশাসনের অধিকার নিয়ে। ফলত মহারাজা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ ও মহারাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রাজ্যলাভ করলেও রাজ্যশ্রী ফিরলেন না। পরবর্তী প্রায় দুই দশকব্যপী অনিয়ন্ত্রণের পর নাবালক রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের রাজ্যভিষেক ঘটে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক রাজা বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত রাজ্য পরিচালনার দায়িত্বভার তুলে নেন মহারানী কামতেশ্বরী দেবী। পরবর্তীকালে রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের রাজসভা অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণের শিল্প সাহিত্য চর্চার পীঠস্থান হয়ে ওঠে।

মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ও সাহিত্যকীর্তির সুবর্ণযুগ

মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে নানা কবির একত্র সহাবস্থান কোচ রাজদরবারী সাহিত্যকে পৌঁছে দেয় ঈর্ষনীয় উচ্চতায়। প্রথমত অষ্টাদশ-উনিশ শতকের সন্ধিক্ষন এক স্পর্শকাতর সময় যা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। দ্বিতীয়ত রাজপৃষ্ঠপোষণার পাশাপাশি মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ নিজেও ছিলে সুকবি। ফলে এই সময়

দরবারী সাহিত্যের আকাশে চাঁদকে মধ্যমণি করে যেন অগনিত নক্ষত্রের শোভা। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের সাহিত্যকীর্তিগুলি নিম্নরূপ ঃ—

(ক) বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, মধ্যখণ্ড। (উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, পুথি নং-২)
(খ) বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, উত্তরখণ্ড। (ঐ, পুথি নং-২২)
(গ) স্কন্দপুরান, ব্রহ্মোত্তর খণ্ড। (ঐ, পুথি নং-২৩)
(ঘ) কাশীখণ্ড। (ঐ, পুথি নং-২৫)
(ঙ) রামায়ণের সুন্দরকাণ্ড। (ঐ, পুথি নং-৬০,৬৫)
(চ) মহাভারত, ঐশিকাপর্ব। (ঐ, পুথি নং-৭৩)
(ছ) সভাপর্ব। (ঐ, পুথি নং-৭৬)
(জ) শল্যপর্ব। (ঐ, পুথি নং-৮০)
(ঝ) খাণ্ডব দহন। (ঐ, পুথি নং-১১২)
(ঞ) পদ্মপুরাণ অবলম্বনে ক্রিয়াযোগসার। (ঐ, পুথি নং-২৩)
(ট) হরিভক্তিতরঙ্গ। (ঐ, পুথি নং-১০৯)
(ঠ) উপকথা (মৌলিক রচনা) (ঐ, পুথি নং-৬)
(ড) রাজপুত্র উপাখ্যান (মৌলিক রচনা) (ঐ, পুথি নং-১১)
(ঢ) শান্তিপর্ব। (কোচবিহার সাহিত্যসভা, পুথি নং-২৯)

এছাড়াও তিনি বেশ কিছু শাক্তসংগীত রচনা করেছিলেন যা কোচবিহার সাহিত্যসভা থেকে শরচন্দ্র ঘোষালের সম্পাদনায় মুদ্রিত।[৭০]

মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের সমকালে রচিত বিপুল সাহিত্যভাণ্ডারকে আলোচনার স্বার্থে তালিকাভুক্ত করলাম—

দ্বিজ পরমানন্দ—	মহাভারত। বনপর্ব।
দ্বিজ বলরাম—	মহাভারত। বনপর্ব।
দ্বিজ রমানাথ—	মহাভারত। বনপর্ব।
পণ্ডিত মাধবানন্দ—	মহাভারত। বনপর্ব।
দ্বিজ রুদ্রদেব—	মহাভারত। আদিপর্ব। রামায়ণ। অরণ্যকাণ্ড।
সারদানন্দ—	ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ রামায়ণ উত্তরকাণ্ড। কাশী খণ্ড।
সত্যনন্দ—	ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ। রামায়ণ উত্তরাকাণ্ড।
দ্বিজ ব্রজেন্দ্র সুন্দর—	হিতোপদেশ।
দ্বিজ রঘুরাম—	মহাভারত—বনপর্ব, আদিপর্ব, ভীষ্মপর্ব, শান্তিপর্ব। রামায়ণ-অযোধ্যাকাণ্ড, উত্তরাকাণ্ড, কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ক্রিয়াযোগসার।
দ্বিজ লক্ষীরাম—	মহাভারত-কর্ণপর্ব, শল্যপর্ব। রামায়ণ-অযোধ্যাকাণ্ড।

দ্বিজ বৈদ্যনাথ—	মহাভারত-বনপর্ব, মৌষলপর্ব, শান্তিপর্ব, কালিকাপুরাণ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শিবপুরাণ। পদ্মপুরাণ।
দ্বিজ মহীনাথ—	মহাভারত। বনপর্ব, অশ্বমেধপর্ব, প্রস্থানিক পর্ব। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।
মাধবচন্দ্রশর্ম্মা—	মহাভারত-স্বর্গারোহণ পর্ব, বিষ্ণুপুরাণ, চণ্ডিকার ব্রত কথা।
দ্বিজ রামনন্দন—	মহাভারত-গদাপর্ব, শল্যপর্ব, কালিকাপুরাণ, ধর্মপুরাণ, নৃসিংহপুরাণ।
দ্বিজ কীত্তিচন্দ্র—	মহাভারত-আশ্রমিক পর্ব, কালিকাপুরাণ, স্কন্দপুরাণ।
দ্বিজ রামচন্দ্র—	কালিকাপুরাণ।
দ্বিজ রাম (কবিরাজ)—	মহাভারত-ভীষ্মপর্ব।
শ্রীনাথ দ্বিজ—	রামায়ণ-কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।
দেবীনন্দন—	রামায়ণ-কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।
দ্বিজ মনোহর—	পদ্মপুরাণ।
মনোহর দাস—	মহাভারত কর্ণপর্ব।
দ্বিজ জগন্নাথ—	ভাগবত-ষষ্ঠ স্কন্ধ।
রিপুঞ্জয় দাস—	ক্রিয়াযোগসার
জয়দেব দ্বিজ—	মহাভারত-সভাপর্ব।
জয়নাথঘোষ—	রাজোপাখ্যান
জগতদুর্লভ বিশ্বাস—	সঙ্গীতশঙ্কর
দ্বিজ ভূতনাথ—	ষড়ঋতু বর্ণনা।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ—	গীতাবলী।
মণিরাম দাস—	গরুড় পুরাণ।[৭১]

এই কবিদের রচনার সূত্রে আরও অনেক রচয়িতার নাম জানা গেলেও তাঁদের রচনার কোন অংশ এখনও পাওয়া যায় নি। তবে সভাকবিদের সম্বন্ধে আলোচনার আগে মহারাজা সুকবি হরেন্দ্রনারায়ণের কাব্যকৃতি সম্বন্ধে কিছু তথ্য সন্নিবেশ করব।

মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ও রচনাসম্ভার

কবি হরেন্দ্রনারায়ণের কবিত্বশক্তির পরিচয় তাঁর সমস্ত রচনাসম্ভার জুড়ে বিরাজিত, কিন্তু একই সঙ্গে তাঁর মৌলিক কল্পনাকুশলতার পরিচয় রয়েছে তাঁর রয়েছে তাঁর শাক্ত পদগুলিতে এবং 'উপকথা' ও 'রাজপুত্র উপাখ্যান' কাব্যে। তাঁর রচিত 'উপকথা' দুটির কাব্যপরিকল্পনায় বিদ্যাসুন্দর বা আরাকান রাজসভার কবিদের রচিত লৌকিক মানবপ্রেমের প্রভাব সুস্পষ্ট। প্রথম উপকথাটি সূচিত হয়েছে প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের ধাঁচে। মঙ্গলাচরণ, দেবীবন্দনার মধ্যে দিয়ে গ্রন্থারম্ভে আত্মপরিচয় দিয়ে তিনি বলেছেন—

"শিববংশে জাত অবনিবিক্ষাত বিশ্বসিংহ অনুপাম।
তাহার তনয় অতি সুবিনয় নরনারায়ণ নাম॥
বহু বীয্যে সন্ত করিয়া বিক্রান্ত আক্রমিলা বহুদেশ।
তাহার তনয় হৈল শে সময় লক্ষীনারায়ণ শেস॥
সেই বংশজাত ভুবনবিক্ষাত ধৈর্যেন্দ্র নাম নরেস।
তাহার তনয় অতিয়বিনয় হরেন্দ্র নাম যে শেস॥"[৭২]

আবার কাব্যের সমাপ্তিও করেছেন মঙ্গলাচরণের ধরনে—

"বেদ গ্রহভূজ সকাব্দা নিরুজ
মিথুন রাশীত রবি।
উনবিংশতিক দিনে সাম্প্রতিক
সমাপ্ত করিল কবি।"[৭৩]

উপকথা দুটি মুখ্যত শ্রুত গল্প, পরে তা কবির কাব্যবিষয়ে পরিনত হয়। 'উপকথা' কাব্যটি 'কম্বোজ' ও 'মহাচীন' দেশের পটভূমিকায় রচিত। এই কাব্যে দুটি প্রেমকাহিনী-প্রথমটি মহাচীন দেশের রাজকুমারের সঙ্গে কম্বোজ রাজকুমারীর, এবং দ্বিতীয়টি মহাচীন দেশের এক চিত্রকরের কুমারী কন্যার সঙ্গে মহাচীনের রাজকুমার এবং কম্বোজ রাজকুমারীর স্বামীর। রাজকুমার দুজনের প্রণয়মুগ্ধ হয়ে পড়েন এবং—

"দুহার প্রেমেত বযনৃপতি হইল।
নিত্য নব নব রসে নৃপতি মজিল॥"[৭৪]

অবশেষে—

"দুজনাকে তুল্যভাবে সতত রাখিব"—এই শপথে কাব্যের সমাপ্তি। মানব-মানবীর প্রেম ও মিলন এখানে মহিমান্বিত হয়েছে,—কাব্যরসের উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে নি। রূপ বর্ণনা ও প্রণয়চিত্র চিত্রণে সহজেই বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব চোখে পড়ে—

(ক) "দুহার নেহাত দুহা দুহয় দুহার।
য়েক সনে দুহে বসি সুখেত অপার॥"[৭৫]

অথবা

(খ) দুহার বদন নিরোখিয়া দুয়োজন।
আনন্দসাগরে অতি নিমজিল মন॥[৭৬]

প্রভৃতি পদে বৈষ্ণব পদাকর্তাদের রচনার ভাবসৌকর্ম ছায়া ফেলেছে।

দ্বিতীয় উপকথাটি শুনেছিলেন "একদিন কুতুহলে রমণীর মণ্ডলে"—এবং তারপর,

"শুনিয়া সে বিচিত্র কথন।"
নিমজিল তাত মন বাসনা হৈল তখন
পদবন্ধ করিতে রচন॥"[৭৭]

এই কাব্যে কলিঙ্গ দেশের রাজপুত্র অনঙ্গমোহনের স্ত্রী রাকাবতী একদিন তার স্বামীকে হত্যা করেন। পরে মৃত রাজপুত্রের বন্ধু মন্ত্রীপুত্র আনন্দবিহারী আর তার স্ত্রী সুশীলা অলৌকিক উপায়ে রাজপুত্রের জীবন ফিরিয়ে আনেন এবং সুন্দরী স্বপ্নবতীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। এই মূল কাঠামোর সঙ্গে নানা উপকাহিনী, স্বপ্নবৃত্তান্ত, পশু পাখির সঙ্গে নানা কথা ইত্যাদি রূপকথাসুলভ মোটিফ যুক্ত হয়ে উপকথাটিকে আস্বাদ্য করে তুলেছে।

শাক্ত পদগুলি রচনার ক্ষেত্রেও কবি হরেন্দ্রনারায়ণের কাব্যপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ করে তাঁর কোন কোন পদে শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মমতের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে, যা বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাসের কোন কোন রচনার সঙ্গে ভাবসাজুয্য রাখে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়—

"কালী কি সামান্য মেয়্যা।
কালী ভুলাইল মহেশে মোহিনী হৈয়া॥
দ্বাপরের শেষে নটবর বেশে
বৃন্দাবনে আস্যা গোপাল হৈয়া
কালী কৈলা গোচারণ গোপাঙ্গনা মন মোহিলে
মোহন বাঁশী বাজাইয়া॥"[৭৮]
(হরেন্দ্রনারায়ণ)

তুলনীয়, শ্রীকৃষ্ণের কপালে চন্দন ও কুমকুমের টিপের সৌন্দর্যবর্ণনায় কবি জ্ঞানদাস—

"রজতের পাত্রে কেবা কালিন্দী পূজিয়াছে
জবা কুসুম তাহে দিয়া॥"

কালীর করালবদনী রূপটিও তাঁর রচনায় ফুটে উঠেছে সার্থকভাবে—

"ভুবন ভুলাইলে কার কামিনী ঐ রমণী
বামার করে করাল শোভিছে ভাল করবাল যেন দামিনী।
সুনীল নীরদ যিনি অঙ্গ নাচিছে ত্রিভঙ্গে তাল বিভঙ্গ।
বামার শিরে শিশুশশী ষোড়শী রূপশী শশীমুখী কাশীবাসিনী।
অট্ট অট্ট অট্ট হাসিছে মাভই ভাষিছে দনুজ নাশিছে
হরেন্দ্র কহিছে হৃদে প্রকাশিছে তব রূপ ভব জননী॥"[৭৯]

আবার আদ্যাশক্তির সঙ্গে মা-ছেলের সম্পর্কের গভীরতায় ডুব দিয়েছেন কবি—

"আমি এত দুখে দুখী কেন তোমার তনয় হৈয়া।
আহিকে যা হবার হৈল কি হবে তা কৈয়া।
দিবানিশি কর্ম্ম ভোগ ভুগিতেছি অবিয়োগ
সহেনা অন্তরে দুখ কত রব সৈয়া॥"[৮০]

মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের অন্যান্য সাহিত্যকীর্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৃহদ্ধর্মপুরাণের অনুবাদ, ক্রিয়াযোগসার, মহাভারতের শান্তিপর্বের অনুবাদ, সুন্দরকাণ্ড রামায়ণ ইত্যাদি। যদিও প্রাপ্ত অধিকাংশ পুথিই খণ্ডিত, তবুও হরেন্দ্রনারায়ণের কবিসত্তার প্রকাশ তাতে বাধা পায় নি। বস্তুত সাধারণ মানুষের কাছে সংস্কৃত রচনাসম্ভারের মূলকথাটি পৌঁছে দেওয়ার ইচ্ছাই তাঁর সক্রিয় সাহিত্যরচনা এবং পৃষ্ঠপোষণার অন্যতম বড় কারণ। স্কন্দপুরাণ অনুবাদকালে তিনি বারবার বলেছেন—

"স্কন্দপুরাণেক ভাষাবন্দে শুবচন।
করিব সকল লোক বুঝন কারণ॥"[৮১]

অথবা—

"তোমার চরিত্র পবিত্র মহত।
রটিয়াছে বেদব্যাস স্কন্দপুরাণত॥
প্রাকৃত মানবে তারে না পারে বুঝিতে।
এমতে বাসনা করি ভাষা বিরচিতে॥"[৮২]

সংস্কৃত পদ্মপুরাণের অংশ নিয়ে মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ "ক্রিয়াযোগসার" রচনা করেন। কিন্তু সম্ভবত শেষ করতে পারেন নি। সম্ভবত অপরাপর সভাকবিরা পরে এ কাব্য সমাপ্ত করেন। চতুর্থ অধ্যায় পর্যন্ত রচয়িতার নাম হিসাবে মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের নাম পাওয়া যায়। মহারাজের রচনা হিসাবে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের নাম পাওয়া যায়। কাব্যের শুরুতেই ভনিতায় রচনাকালের ইঙ্গিত ও কবির আত্মপরিচয় বর্ণিত—

"শ্রী সুন্দরাকাণ্ড নাম রামগুন অনুপাম
জাত গাঁথা কথা রশায়ণ।
রচিত প্রবন্ধ করি হরিপদ শিরে ধরি।
নিবেদি শ্রী হরেন্দ্র রাজন॥
এজে অগ্রহায়ন মাশে বিশ্চিকে তপন বাশে
কৃষ্ণপক্ষ দ্বিতীয় দিনত।
শুভারম্ভ রামায়ণ পদবন্ধে বিরচণ
শুভক্ষনে শোমবাসরত॥
কামতা বনিতা পতি বিশ্বসিংহ খিতিপতি।
শিবসুত হিরাগর্ভে জাত।
অরি-করি-বিদারণ ঘোর রণ-পঞ্চ ানন
জশ জার জগতবিক্ষাত॥
সে অংশে মম জাত শ্রী হরেন্দ্র নামে ক্ষাত
দুরিত পুরিত জার মতি।
রচে রাম গুনগান নিজ নিস্তার কারণ
সমনত ভয় পায়া অতি॥"[৮৩]

(উপকথা, পুথি নং ৬, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার)

সুন্দরকাণ্ড অনুবাদকালে প্রধানত বাল্মীকি রামায়ণকে অনুসরণ করার ফলে কাব্যটি অন্যান্য সমকালীন রামায়ণ

অনুবাদের তুলনায় আকারে বৃহৎ। বাল্মীকিকে স্মরণও করেছেন তিনি কোন কোন স্থানে—

"ইতি শ্রীশুন্দরাকাণ্ডে বাল্মীকিবচন।
সমুদ্রপ্রবেশ শর্গ হৈল সমাপন॥
অষ্টম নবতি শর্গ হৈল সমাধান।
মন দুরাচার রামনাম কর গান॥
শ্রী হরেন্দ্র কহে রাম করুণানিদান।
বিশম বিপাকে রামনাম কর গান॥"[৮৪]

(উপকথা, পুথি নং ৬, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্তাগার)

অবশ্য মৌলিক বেশ কিছু ঘটনার সংযোজনও করেছেন তিনি। যেমন বিভীষণের কুবের ও মহাদেবের কাছে উপদেশ প্রার্থনা এবং তাঁদের উপদেশ অনুযায়ী রামের কাছে আশ্রয়লাভ, সেতুবন্ধন করার সময় হনুমান কর্তৃক নলের শক্তিপরীক্ষা, নল রামের সাহায্য প্রার্থনা করলে রাম কর্তৃক হনুমানের শক্তিহরণ এই ধরনের বিষয়গুলি মূলানুগ নয়, তবে এগুলি সাধারণ পাঠকের পক্ষেও মনোগ্রাহী এবং জনশিক্ষার পক্ষে সহায়কও বটে। হনুমানের দর্পচূর্ণের অংশবিশেষ উল্লিখিত হল—

"দশন বিকাশী হাশী হাশী মহামানি।
ইচ্ছা কৈল মারুতির করি দর্পহানী॥[৮৫]
অথবা—
চিন্তামণি এহি চিত্তে চিন্তিয়া তখন।
কপি দেহে হনে নিজ শক্তি নারায়ণ॥
আপনার দেহভার আর সে সময়।
বহিতে অশক্ত ভক্ত পবন তনয়॥"[৮৬]

(উপকথা, পুথি নং ৬, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্তাগার)

সুন্দর কাণ্ড রামায়ণ ছাড়াও মহাভারতের তিনটি পর্বের পুথি কোচবিহার রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত। ঐশিক পর্ব বা সভাপর্বের কোন পুথিতেই রচনাকাল নেই। সংস্কৃত দশকুমার চরিতের মত বাংলা ভাষায় তিনি রচনা করেছিলেন মৌলিক রচনা "রাজপুত্র উপখ্যান।" এই আখ্যান রচিত হয়েছে এক রাজপুত্রের বিভিন্ন গল্প অনুসরণ করে কাব্যটিতে পয়ার এবং ত্রিপদী ছড়াতে ছন্দ নিয়ে নানা পরীক্ষা করেছিলেন মহারাজা—

"শুনি নররায় পুলকিত কায়
বোলে ইথেদায় নাহি কিঞ্চিত।
চলহ কানন মৃগয়া কারণ
দিন শুভক্ষণ করিয়া স্থিত॥
এহি বলিভূপ সেনা নানারূপ
দিল সঙ্গে অতি সুসাবধানে
দুই সখী বলি বলি জয় কালী
সুখে গেল চলি ঘোর কাননে॥[৮৭]

মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের সভাকবিগণ

প্রথমত, কোচবিহার রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত পুথির তালিকাদৃষ্টে এ কথা বোঝা যায় হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে রামায়ণের প্রায় সব কটি কাণ্ডই অনূদিত হয়েছিল। রামায়ণের নানা কাণ্ডের অনুবাদক হিসাবে সরদানন্দ, সতানন্দ, রুদ্রদেব রঘুরাম, দ্বিজ ব্রজসুন্দর এবং স্বয়ং মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের নাম পাওয়া যায়। এঁদের সকলের রচনাই যে পাওয়া গেছে তা নয়, কখনও কোনও পুথিতে সমকালীন রচয়িতা হিসাবে এঁদের উল্লেখ থেকেও খানিকটা ধারণা করা যায়। স্থানীয় ইতিহাসবেত্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেও জেনেছি যে তাঁদেরও ধারণা রামায়ণের সপ্তকাণ্ড এই সময় অনূদিত হয়েছিল। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে ৬৩ নং পুথিটি সারদানন্দ বিরচিত উত্তরকাণ্ড রামায়ণের অনুবাদ। পুথিতে সতানন্দ এবং রঘুরামের নামও কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। সারদানন্দ সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন, কাব্যের সূচনায় তাঁর সংস্কৃত 'রামাষ্টক' দেখে ধারণা করা যায় তিনি হয়তো রামভক্ত ছিলেন। রামাষ্টকের পরে গনেশবন্দনা, এবং পরে আবার রামবন্দনা শেষে কাব্যটি শুরু হয়েছে। 'রামাষ্টক' ছাড়াও পুথিতে মাঝে মধ্যেই সংস্কৃত শ্লোকের ব্যবহার তাঁর সংস্কৃত সাহিত্যরীতির প্রতি অমোঘ আকর্ষণের প্রমাণ। সূচনায় পৃষ্ঠপোষক রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের বংশপরিচয় দিয়েছেন কবি—

"জয়তি নৃপতি শে হরেন্দ্রনারায়ণ।
বিশ্ববর্বংশ অবতংস মেদিনীমদন॥
দ্বাপরে য়াদরি যুদ্ধে দেব রতিপতি।
তেজি কায় গেল তাঞে অমর বশতি॥
শেহি কায়া লয়া এজে বিহার নৃপতি।
ধৈর্যেন্দ্র নরেন্দ্র হৈতে হয়্যাছে উৎপতি॥
কন্দর্প সদৃশ দর্পযুত নরেশ্বর।
মহাবল পরাক্রম সুরুপে সুন্দর॥"[৮৮]

কাব্যের অন্যত্র তিনি রাজা এবং রাজপরিবারের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। রাজপরিবারে নিয়মিত রামায়ণ এবং অন্যান্য পুরাণ, কাব্যাদির চর্চা ছিল। শ্রী ন্যায়ালঙ্কার নামে কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শাস্ত্র আলোচনায় পারঙ্গম ছিলেন। এই ন্যায়ালঙ্কার পণ্ডিতকেই সারদানন্দ বরাবার প্রণতি জানিয়েছেন তাঁর রচনায়—

"বিজয় বিহারেশ্বর ভূমিপাল পুরন্দর
নরেন্দ্র হরেন্দ্রনারায়ণ।
তেজস্মিয় রস্মি অতি ধর্মসীল সিস্টমতি
বিপ্রকুলে আনন্দবর্ধন॥
শ্রী ন্যায়ালঙ্কার ধীরে তাহার আদেশে গীরে
প্রকাশিল রামায়ণ অর্থ।
কথায় কবিতা বন্দে তনয় সারদানন্দে
রামরস পানে হয়া মত্ত॥"[৮৯]

পুথির অন্যত্রও শ্রীন্যায়ালঙ্কারকে গুরুস্থানীয় রূপে প্রণতি জানাচ্ছেন সারদানন্দ—

"সে রাজ্ঞ আজ্ঞায় শ্রী ন্যায়ালঙ্কারের গুণে।
ভণয় সারদানন্দ অতি সকরুণে॥"[৯০]

আগেই বলেছি, এই পুথিতে সতানন্দ এবং রঘুরাম এই দুই কবির ভনিতাও পাওয়া যায়। রচনায় সতানন্দও শ্রীন্যায়ালঙ্কারের উল্লেখ করেছেন—

"চারি অংশে যদুবংশে হইয়া প্রকাস।
জেন হরি করিছেন দ্বারকা বিলাস॥
বিরাজে নৃপয়ো চারি অংশে এক অঙ্গ।
সচিব নাজির ধীর শুভাদেউ সঙ্গ॥
তদীয় নিদেসবর্তী শ্রী ন্যায়ালঙ্কার।
রামায়ণ মূল অর্থ করিল প্রচার॥
....
সেহি জে নরেশ মোকে করিল আদেশ।
উত্তরাকাণ্ডের পদ রচিতে বিশেষ॥
শ্রী ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের কৃপায়।
রচনা করিল পদ স্বদেশ ভাষায়॥
....
ভাষায় ভাব্যতা করি পয়ার প্রবন্ধ।
সীতার চরিত্র ভণে দাস সতানন্দ॥"[৯১]

দ্বিজ রুদ্রদেব নামে অপর এক সভাকবির কথা জানতে পারি যাঁর অনূদিত অরণ্যকাণ্ড উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। কাব্যের সূচনায় কবি জানিয়েছেন মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের আদেশক্রমে তিনি অনুবাদ করলেন রামায়ণের অরণ্য কাণ্ড—

"বিহার বিহরি শ্রমদ্ধরেন্দ্রভূপাল।
শিষ্টের পরম ইষ্ট দুষ্টজন কাল॥
সাম দাম দণ্ডভেদে পরমগম্ভীর।
সত্য, সৌধ দয়া ধর্মে যেন যুধিষ্ঠির॥
কার্য্যে বীর্য্যে সৌর্য্যে যেন মধ্যম পাণ্ডব।
কিঞ্চিত না সহে অরিকুলের তাণ্ডব॥
গুণিগণ গণনাত যেন ধনঞ্জয়।
শরণ লইলে দেন শত্রুক অভয়॥
নকুল সমান অতি সুন্দর সরীর।
সহদেব সম শাস্ত্রে যুদ্ধে মহাবীর॥
নীতি বৃহস্পতি দানে কর্ণের সমান।
বুদ্ধি দৈত্যগুরু রূপে জেন পঞ্চবান॥
তারিণী পদারবিন্দে করিয়া আশ্রয়।
ঘোর জমদণ্ড দেখি না করয় ভয়॥
যমের যাতনা মনে না করে ইঙ্গিত।
কালি নামাক্ষরে যার রসনা রঞ্জিত॥

হেন মহারাজা রাজেস্বরের আজ্ঞায়।
দ্বিজ রুদ্রদেব ভনে স্বদেশ ভাষায়॥
অরন্যকাণ্ডের সীতাদেবীর হরণ।
তারপদ করিবাক করিআছি মন॥"[৯২]

দ্বিজ রুদ্রদেব বিরচিত মহাভারত আদিপর্বের একখানি পুথিও উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে আছে (পুথি নং-৯২) অরণ্যকাণ্ডের পুথিতে রুদ্রদেব তাঁর পিতৃপরিচয় সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লিখেছেন—

"মাধবী শক্তির গর্ভে শিববির্জ্জেজাত।
ছিলো বিশ্বসিংহ ভূপ ভুবন প্রখ্যাত।
তার বংশে জন্ম মন্মথের প্রায় রূপ।
ভুবন বিজয়ী শ্রীল শ্রী হরেন্দ্র ভূপ॥
তার দেশবাসী সুর গুরুর সমান।
আছিলো ভূদেব নাম ভূদেব প্রধান॥
তার সুত অতি মূঢ় রুদ্রদেব নাম।
রচিলেন পদ শিরে প্রণামিএঞা রাম॥"[৯৩]

রচনাংশ থেকে জানা যায় রুদ্রদেবের পিতার নাম ভূদেব, এবং তিনি রাজসভায় ও সমাজে যে মান্যগণ্য ছিলেন তা "ভূদেব প্রধান" বাক্যাংশ থেকে ধারণা করে নেওয়া কঠিন নয়। দ্বিজ রুদ্রদেব মহারাজা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের সভাকবি ছিলেন এ কথা মহারাজা খানচৌধুরী আমানতউল্লা তার 'কোচবিহারের ইতিহাস' গ্রন্থে জানিয়েছেন। সম্ভবত অতিবার্ধক্য জনিত কারণে মহাভারত আদিপর্ব অনুবাদ প্রায় শেষ করে আনলেও শেষ করতে পারেন নি তিনি। তাঁর অসমাপ্ত কাজ পরবর্তী কালে শেষ করেন দ্বিজ রঘুরাম।

মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের অপর এক সভাকবি দ্বিজ রামনন্দন রচনা করেন কালিকাপুরাণ, যা বর্তমানে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত। কালিকাপুরাণ ছাড়াও তাঁর অনূদিত "ধর্ম্মপুরাণ", মহাভারতের "শল্যপর্ব", দ্বিজ ব্রজসুন্দর এবং রামনন্দন উভয়ের ভণিতাসহ "নৃসিংহপুরাণ" উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। কবি রামনন্দনের পিতামহ ছিলেন মহারাজা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের মহামন্ত্রী শচী নন্দন। কবি শচীনন্দন পুত্র শ্রীনন্দনের পুত্র। মহারাজার সভাপণ্ডিদের অন্যতম দ্বিজ পরমানন্দ সংস্কৃত মহাভারত থেকে অনুবাদ করেছিলেন মহাভারতের "বনপর্ব"। তাঁর রচনাতেও মহারাজার বিদ্যাবত্তা, কাব্যকুশলতা এবং সর্বোপরি রাজদরবারে সাহিত্যের এমন নানামুখী অনর্গল বিকাশের কথা বলা হয়েছে। দ্বিজ পরমানন্দ ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ, এবং শিবভক্ত। তাঁর 'বনপর্বে'র পুথিতে শিব বন্দনা মনোগ্রাহী—

"শিব শিব শতপত্র চরণে প্রণতি
সংসার সাগর মগ্ন তরী বিশ্বগতি॥
শূলী শবাসনধারী শ্বশান নিবাস।
শিবানীসেবিত পদ চৈতন্য প্রকাশ॥
সম্বরারি প্রাণহারি গিরীণ শ্রীকণ্ঠ।
সমুদ্র সম্ভব বিষাপানে নীল কণ্ঠ॥"[৯৪]

তাঁর রচনায় অন্য একটি ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়—

"ষোড়শ বার্ষিকে মহারাজা পুত্রবন্ত।
শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনারায়ণ গুণবন্ত॥"[৯৫]

অর্থাৎ ষোল বছর বয়সে রাজকুমার শিবেন্দ্র নারায়ণের জন্ম এবং সেই উপলক্ষে প্রচুর ধন দানের কথা তাঁর রচনায় পাওয়া যায়।

মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে সমসাময়িক ইতিহাস রচনার প্রয়াস দেখা যায়। মুন্সী জয়নাথ ঘোষ এই সময় রচনা করেন 'রাজোপাখ্যান' যা কোচবিহার রাজবংশের ইতিহাস এবং বংশলতিকাও বটে। "কোচবিহারের ইতিহাস" প্রণেতা খান চৌধুরী আমানতউল্লার মতে এই 'রাজোপাখ্যান' প্রমাদমুক্ত এক ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা, এবং তাঁর মতে ইংরাজ শাসনে কোম্পানির কালেক্টর যে রাজবংশ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংবলিত দলিল তৈরি করেছিলেন তার তুলনায় জয়নাথ মুন্সীর 'রাজোপাখ্যান' অধিকতর প্রামাণ্য।[৯৫] ইতিহাস সচেতন রাজা হরেন্দ্রনারায়ণও তাঁর মৌলিক রচনা 'উপকথা' কাব্যে তাঁর বংশপরিচয় দিয়েছিলেন। হরেন্দ্রনারায়ণের সভাকবিদের মধ্যে দ্বিজ বৈদ্যনাথের নাম পাওয়া যায়। দ্বিজ বৈদ্যনাথের আত্মপরিচয় লক্ষ্য করলে দেখা যায় তিনি বংশপরম্পরায় কোচবিহার রাজপরিবারের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর পিতামহ দ্বিজ রামেশ্বরের পিতা ভবানন্দ ছিলেন রাজভ্রাতা শুক্লধবজের সভার পাঠক। এভাবেই বংশ পরম্পরায় তাঁরা কোচ নৃপতিদের সভায় সারস্বত সাধনা করেছিলেন। মহাভারতের সভাপর্বের অনুবাদক হিসাবে মহীনাথ নামে কোন কবির নাম পাওয়া যায়। উপরিলিখিত দ্বিজ বৈদ্যনাথের পুত্র মাধবচন্দ্র শর্মাও মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের রাজসভায় কাব্যরচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত "বিষ্ণু পুরাণ" (পুথি নং ২১) একটি সুবৃহৎ কাব্য। 'বিষ্ণুপুরাণে' তিনি তাঁর পিতার সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ উক্তি করেছেন—

"পরম দেবতা—পাদপদ্ম পরায়ন।
দ্বিজ কৃষ্ণমিশ্র অধ্যাপকের নন্দন॥
বৃদ্ধ হইল বিষয় না জানে অদ্যাবধি।
গোবরছড়ার বৈদ্যনাথ বিদ্যানিধি।
তাহার কুমার পুরাণের পদগন।
শ্রী মাধব চন্দ্র শর্ম্মা করিল রচন॥"[৯৬]

(বিষুপুরাণ, পুথি নং-২১, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার)

"বিষ্ণুপুরাণ" থেকে জানা যায় দ্বিজ বৈদ্যনাথের বাসস্থান ছিল দিনহাটা মহকুমার গোবরছড়া গ্রামে। বিষয় বিমুখ আত্মমগ্ন কবির চরিত্রটি তাঁর পুত্রের রচনায় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। দ্বিজ ব্রজ সুন্দর হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্ব কালের আর এক উল্লেখযোগ্য কবি। তিনি ছিলেন মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের সভাসদ এবং সমসাময়িক কবিকুল তাঁকে "সুদ্ধশয় সুবুদ্ধি সুস্থির"—বলে সম্মান জ্ঞাপন করেছেন। তিনি "কালিকাপুরান" এর রচয়িতা। কিন্তু এই পুথির শেষাংশে তাঁর অনুজ দ্বিজ রামচন্দ্রের নাম পাওয়া যায়—

"কালিকাপুরাণে ইতি ত্রিপুরাচরণ গীতি
কবচ হইল সমাপন॥
শিববংসে হৈছে জাত শ্রীহরেন্দ্র নামে খ্যাত
ধরাতলে ধন্য অবতার।
তার দেশি লোকগন করিতে সদা পালন

ভূপরূপে বিহরে বিহার॥
ছিল সভাসদ তার অশেষ সদ্‌গুনধার
সুদ্ধাশয় সুবুদ্ধি সুস্থির।
আহ্নিক আচারযুত সুসিল ত্রিসন্ধ্যাপুত
সুবিনিত সুন্দর সুধীর॥
ব্রজসুন্দর নামেত সুবিখ্যাত জগতেও
কবিতা কমললতা জার।
আমি অনুজ তাহার রাজ আজ্ঞা অনুসার
ভনে রামচন্দ্র পদসার॥"[৯৭]

কবি শ্রী ব্রজসুন্দরের ভনিতায় একটি "নৃসিংহপুরাণ"—এর পুথি পাওয়া গেছে (পুথি নং ৭, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগর)। রামায়ণের "লঙ্কাকাণ্ড" এবং মহাভারত "সভাপর্ব" এর পুথিও (যথাক্রমে পুথি নং ৬২ এবং ৭৬, ঐ) পাওয়া গেছে। মূল সংস্কৃত "পঞ্চ তন্ত্র" থেকে অনুবাদ করে তিনি 'হিতোপদেশ' রচনা করেন। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে দেবীনন্দন, শ্রীনাথ দ্বিজ, দ্বিজ লক্ষীরাম, প্রমুখ কবিদের নাম পাওয়া যায়। তাঁর রাজত্বকালে ভাগবত ষষ্ঠ স্কন্ধের একটি পুথির রচয়িতা হিসাবে পাওয়া যায় দ্বিজ জগন্নাথের নাম। দিজ রঘুরাম নামে কবির 'বনপর্ব', 'ভীষ্মপর্ব' ও 'শান্তিপর্ব' অনুবাদের কথা জানা যায়। এভাবেই বহু শক্তিধর কবির কাব্য আরাধনায় আর স্বয়ং সুকবি মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় কোচরাজদরবারের সাহিত্যচর্চা এক অন্য মাত্রায় উন্নীত হয়।

মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণ ও সুবর্ণযুগের উত্তরধিকার

মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের পর রাজসিংহাসনে আসীন হন মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণ। তিনি ছিলেন শক্তিপূজার উপাসক, যদিও মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের সভাসাহিত্যের উত্তরাধিকার পরবর্তীকালে বজায় থাকেনি। সম্ভবত সভাকবিদের অনেকেই মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে কাশীতে অবস্থান করছিলেন। কারণ যাই হোক এ সময় সভাসাহিত্যের স্রোতস্বিনীতে ভাঁটার টান দেখা দেয়। মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের আমলের বিপুল দেনার চাপ এসে পড়ে মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের কাছে। কিন্তু অল্প সময়ের শাসন কালেই মহরাজা শিবেন্দ্রনারায়ণ সুদক্ষপ্রশাসকের মত যাবতীয় আর্থিক দৈন্যের হাত থেকে রাজ্যকে রক্ষা করেন। মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণ রচিত শাক্তগীতিগুলি পরবর্তীকালে প্রকাশনার আলো দেখলেও আজ তা দুষ্প্রাপ্য। ভক্তিতে, অনুভবে তাঁর রচনাগুলি অনন্যতার দাবি রাখে—

"ভয় কি শমনে যার শ্যামা রূপে মন মজ্যাছে।
হৃদয় মাঝারে আমার তারা রূপে আলো কৈর্য্যাছে।
দিনান্তে যে দুর্গা কয় তার কি অন্যেরে ভয়!
একথা অন্যথা নয় বেদাগমে প্রকাশিছে।[৯৮]

অথবা,

"কে আনন্দে আনন্দ মই সুধানন্দ ভরে
গলে নরশির মালা হরহৃদিপরে
কুটী চন্দ্র জিনি প্রভা কবা অপরূপ শোভা

নবীন নীরদ নীল নীরদবরণী
দলিছে দনুজ রণ অঙ্গন মাঝারে॥"[৯৯]

মহারাজ তাঁর পদে "শ্রীশিবেন্দ্র", "শিবেন্দ্রভূপ", "হরেন্দ্রসুত" প্রভৃতি ভণিতা ব্যবহার করেছেন।

মহারাজা শিবেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকালের সর্বাপেক্ষা উল্লেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তি হল রাজমহিষী বৃন্দেশ্বরী দেবী রচিত কাব্য "বেহারোদন্ত"। উনিশ শতকের সূচনায় নারীশিক্ষা যখন আলোচনার বিষয়, ঘরে ঘরে তার প্রতি বিরূতাই বেশি তখন কোচবিহারের রাজপরিবারের কুলবধূ বৃন্দেশ্বরী দেবী রচনা করলেন "বেহারোদন্ত"।[১০০] এই কাব্যটি কোচবিহার নৃপতিদের বংশলতিকাও বটে আবার মহারানীর আত্ম কথনসূত্রে তাঁর জীবন কথাও বটে। নারীর কলমে ইতিহাস রক্ষার প্রয়াস সম্ভবত তখনও তুলনারহিত। মহারাণী বৃন্দেশ্বরীর রচনাপ্রয়াস ছাড়াও অন্যা মহিষী কামেশ্বরী দেবীর আদেশে সভাকবি রিপুঞ্জয় দাস গদ্যে রচনা করলেন কোচবিহারের মহারাজাদের ইতিবৃত্ত—'মহারাজ বংশাবলী', গ্রন্থটিতে রচনাকালের কোন উল্লেখ নেই। তবে গ্রন্থশেষে রচয়িতা লিখেছেন—"মহারাজ চক্রবর্ত্তি শ্রী হরেন্দ্র চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ শ্রী শ্রী কামেশ্বরী কমতেশ্বরী খ্যাতা শ্রী শ্রী নরেন্দ্রনারায়ণ রাজমাতা আজ্ঞানুসারে হরবংশ মহারাজ বংশাবলী গাথা হইল।" রিপুঞ্জয়ের পুথি গদ্য বাংলায় লিখিত, তবে যতিচিহ্নের ব্যবহার সঠিকভাবে প্রযুক্ত না হওয়ায় পড়তে গিয়ে প্রতি পদে বাধা পেতে হয়।[১০১] কিন্তু সেই বাধা অতিক্রম করলে তৎকালীন গদ্যে রাজপরিবারের ইতিবৃত্ত এবং তার সঙ্গে জুড়ে থাকা যাবতীয় মিথ, রাজবংশ ধারার যাবতীয় পুঙ্খানুপুঙ্খ সূত্র তিনি যে যত্নসহকারে একত্রিত করেছেন তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে দ্বিজ বৈদ্যনাথ রাজ আদেশে ব্যাসদেবের সংস্কৃত শিবপুরাণের অনুবাদ করেন (পুথি নং ৪)। মহীন্দ্রনাথ শর্মা নামে এক কবির সন্ধান পাওয়া যায় যিনি মার্কণ্ডেয় চণ্ডী" (পুথি নং ১৪) রচনা করেন। পূর্বে উল্লিখিত কবি মাধবচন্দ্র শর্ম্মাও মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে একটি "চণ্ডিকার ব্রতকথা" রচনা করেন। এই সময়ই গোবরছড়া নিবাসী বিষ্ণুপ্রসাদ মুস্তোফি রচনা করেন স্মৃতিপুথি 'শ্রী বিষ্ণু প্রসাদন' এবং 'শ্রীবিষ্ণু প্রসাদবলী।' মহারাজা শিবেন্দ্র নারায়ণের রাজমন্ত্রী শিবপ্রসাদ বক্সী 'আহ্নিকাচার' তত্ত্বাবিশিষ্টম্ নামে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন বলে জানা যায়।

মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণ এবং উনবিংশ শতকের আবহনী

মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণ কাশীধামে অবস্থিতিকালে লোকান্তরিত হলে অপ্রাপ্ত বয়স্ক রাজকুমার নরেন্দ্রনারায়ণ রাজপদে আসীন হন। কোচবিহার রাজ্যটি ইতিপূর্বে কোম্পানীর করদ মিত্র রাজ্য পরিণত হয়েছিল, ফলে রাজপরিবার এই সংকটপূর্ণ সময়ে কোম্পানীর সহয়তা পেয়েছিলেন। তরুণ রাজার শিক্ষাদান প্রভৃতি বিষয়ে রাজপরিবারস্থ সকলে কোম্পানীর দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনার পর ঠিক হয় কৃষ্ণনগরে এবং কলকাতায় তিনি শিক্ষালাভ করবেন। এভাবেই কোচবিহার রাজ্যটি উনিশ শতকীয় নবজাগরণের ছোঁয়ায় জেগে ওঠে। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের সময় থেকে কোচবিহার উন্নয়নের কাজ শুরু হয়, আর মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণ সেই কর্মযজ্ঞের পরিধি অনেক বাড়িয়ে দেন। তিনিই আধুনিক কোচবিহারের রূপকার। পূর্বজ মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের মত তিনিও প্রাচীন পুথির সংরক্ষণে প্রয়াসী হন। বহু পুথির অনুলিপি প্রস্তুত করান হয়। তিনি এ বিষয়ে কোম্পানীর সঙ্গে আলোচনা করে পুথি সংরক্ষনের বিষয়টির আধুনিকীকরণে প্রয়াসী হন। নানা কর্মকাণ্ডে কোচবিহার তখন গতিময়। তাছাড়া আধুনিক চিন্তাধারা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবেশ ঘটেছিল রাজপরিবার ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত রাজন্য বর্গের সন্তানদের মধ্যে। ফলে নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় পুরাণ মহাকাব্য বা মঙ্গলকাব্য অনুবাদের বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল না। কবি যদুনাথ দাসের ভ্রমরগীতা (পুথি নং ১০৫ খ, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার)-র সন্ধান

পাওয়া যায় যা ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে রচিত বলে উল্লিখিত। কবি কালিদাস রচিত তিনখানি 'শনিচরিত্র'র সন্ধান মেলে। কিন্তু এর মধ্যে কোচবিহার রাজ্যে এসে গেছে মুদ্রণযন্ত্র (১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ)। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দেই প্রকাশিত হয়েছিল মহারানী বৃন্দেশ্বরী দেবীর 'বেহারোদন্ত' কাকিনায় প্রতিষ্ঠিত মুদ্রণযন্ত্র থেকে।[১০২] কোচবিহার রাজ্যে মুদ্রনযন্ত্র স্থাপনের মুখ্য আগ্রহ ছিল রাজমাতা কামেশ্বরী দেবী এবং বৃন্দেশ্বরী দেবীর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কোচবিহারে প্রথম সর্বসাধারণের জন্য স্কুল খোলা হয় বৃন্দেশ্বরী দেবীর উৎসাহেই।

কথাশেষ

১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রনযন্ত্রটি কোচবিহার শহরে স্থানান্তরিত হয় বর্তমান জলপাইগুড়ি শহর থেকে। এর মধ্যেই কোচবিহার কমিশনার মনোযোগী হয়েছিলেন কোচবিহার সংক্রান্ত পুরোনো সরকারী নথিপত্র মুদ্রণে কাজে। পাশাপাশি চলছিল সমসাময়িক সরকারী কাগজপত্র মুদ্রণের কাজ। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের রাজ্যভিষেকের সময় যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী রচিত 'কোচবিহার রাজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ' বিনামূল্য বিতরিত হয় এই রাজকীয় মুদ্রণালয় থেকে মুদ্রিত হয়ে। শুরু হয় কোচবিহার রাজকীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত সাহিত্যকীর্তি গুলির তালিকা প্রস্তুত ও মুদ্রণের কাজ। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ পায় কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত সঙ্গীতশাস্ত্রের স্বরলিপি সংক্রান্ত গ্রন্থ "গীতসূত্রসার"। এর আগে ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত হয়েছে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষণায় সম্পাদিত প্রথম সাময়িকপত্র 'কুচবিহার গেজেট', প্রথমে পাক্ষিক হলেও পরে এটি সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের ইচ্ছার ফলস্বরূপ প্রকাশিত হয় খানচৌধুরী আমানতউল্লা রচিত কোচবিহারের ইতিহাস' এবং ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত হয় জয়নাথ মুন্সী 'রাজোপাখ্যান' এছাড়াও অগনিত সরকারী নথি, বিভিন্ন রিপোর্ট এবং কয়েকটি সাময়িকপত্র (যাদের পরিচয় বিশেষ পাওয়া যায় না) প্রকাশিত হয়।[১০৩] আর এ সবের পাশাপাশি রাজপরিবারের সাহিত্যচর্চা চলতে থাকে পুরোমাত্রায়। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে রাজঅন্তঃপুরেও সাহিত্যচর্চা চলতে থাকে যার প্রধান পথ নির্দেশিকা ছিলেন বৃন্দেশ্বরী দেবী। বৃন্দেশ্বরী দেবীর আত্মকথাও কামতাপুর রাজপরিবারের ইতিহাসস্বরূপ 'বেহারোদন্ত' মুদ্রণের আলোয় আসার পর অন্তঃপুরে নারীশিক্ষা ও সচেতনতার জোয়ার আসে। পরবর্তীকালে নরেন্দ্রনারায়ণের পুত্র মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত। তিনি এবং মহারানী সুনীতি দেবী আধুনিক কোচবিহার শহরের রূপশিল্পী। শিক্ষা, সাহিত্য, স্থাপত্য, চিত্রকলার উন্মেষে এই সময় অনন্য। সারা রাজ্য জুড়ে অসংখ্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। স্ত্রী শিক্ষায় উৎসাহ দেওয়ার জন্য আলাদাভাবে স্কুল খোলা হয়। মুদ্রণালয়ের প্রতিষ্ঠা সাহিত্যক্ষেত্রকে আরও উর্বর করে। পাশাপাশি মহারানী সুনীতি দেবীর বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব বদলে দেয় রাজ অন্তপুরের রোজনামচাকেও। মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন সুকবি। তাঁর রচিত 'Good words' নামে কবিতাবলী লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হওয়ার কথা একাধিক সূত্রে পাওয়া যায়। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের বিখ্যাত শিকার কাহিনী 'Thirty seven years of Big Game Shooting in Cooch Behar, the Duars, and Assam : A tough diary by the Maharaja of Cooch Behar'' গ্রন্থটি মুম্বই এর Times Press থেকে মুদ্রিত হয়। মহারানী সুনীতি দেবী ছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যা। ফলে স্বচ্ছ মানবিক দৃষ্টি এবং স্নিগ্ধ ভক্তি প্রবণতা ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তাঁর 'Autobiography of an Indian' প্রকাশিত হয় ১৯২১ সালে। যদিও মহারানীর সাহিত্যসাধনার ইতিহাস অনেকদিনের। ১৮৮৭ সালে কলকাতা থেকে ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'সুকথা' প্রকাশিত হত কোচবিহার রাজআনুকূলে। এই পত্রিকাতেও "বামা রচনা" নামে ছদ্ম ভনিতার আড়ালে সুনীতি দেবী কাব্য রচনা করতেন। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'কবিতা ও গান'। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা

নৃপেন্দ্রনারায়নারায়ণের মৃত্যু তাঁকে বৈরাগিণী করে তোলে। এরপর একে একে নানা পারিবারিক দুর্যোগ, পুত্র রাজরাজেন্দ্র নারায়ণের অকাল মৃত্যু তাঁকে ঈশ্বরমুখী করে তোলে। তিনি ঈশ্বরের পায়ে আত্মোৎসর্গের পাশাপাশি সাহিত্য সাধনাকেই জীবনের একমাত্র অবলম্বন করে আঁকড়ে ধরেন। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর ছোটগল্প সংকলন—"সাহানা"। ১৯১৬তে প্রকাশ পায় 'The Bengal Decoits and Tigers' এরপর 'The Rajput Prince (১৯১৭) 'অমৃতবিন্দু' (১৯১৮) 'The beautiful Mughal Princesses' 1918 এবং অবশেষে ১৯২১ সালে প্রকাশিত হয় 'Autobiography of an Indian Princess : Memories of Maharani Sunity Devi of Cooch Behar'' গ্রন্থটি। ১৯২১ এই প্রকাশিত হয়েছিল 'কথকতার গান'। 'শিবনাথ' (১৯২১) ও 'শিশু কেশব' (১৯২১) নামে দুটি জীবনী গ্রন্থও তিনি রচনা করেন। শেষ জীবনের আধ্যাত্মিক আত্মনিবেদনের আকাঙ্খা থেকেই রচিত হল ''The life of Princess Yasodhara : The Wife and Disciple of Lord Buddha''' (১৯২৯)

মহারানী সুনীতিদেবীর দ্বিতীয় পুত্র জিতেন্দ্রনারায়ণ রচনা করেছিলেন 'Hello Darjeeling'' নামে একটি হালকা চালের নাটক (১৯১৪) যা ছোটলাট লর্ড কারমাইকেলের উপস্থিতিতে দার্জিলিং-এ অভিনীত হয়। এরপর এই বছরেই কলকাতার উডল্যাণ্ডস প্রাসাদ থেকে প্রকাশ করেন ইংরাজী মাসিকপত্র 'Wod lands wag' যাতে রাজবাড়ির নানা খবর থেকে দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সবই স্থান পেত। ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয় কাব্যগ্রন্থ '28th of February' গ্রন্থটি মহারানী ইন্দিরা দেবীকে উৎসর্গীকৃত। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ '4th of May' প্রকাশ পায় ১৭১৭ সালে।

কোচবিহার রাজপরিবারের অপর বিদুষী রাণী ছিলেন নিরুপমা দেবী। তিনি মহারানী সুনীতি দেবীর তৃতীয় পুত্র ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণের পত্নী। কোচবিহার রাজপরিবারে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরই স্বামী ও শ্বশ্রূমাতার অনুপ্রেরণায় তিনি নানা জনহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে 'সাহিত্য সভা'র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভিক্টর নিত্যন্দ্রনারায়ণ। এই সাহিত্য সভার মুখপত্র হিসাবে ব্রাহ্ম সমাজ থেকে একদা প্রচারিত 'পরিচারিকা' পত্রিকাটিকে পুনর্জীবিত করে সম্পদনার দায়িত্ব দেওয়া হল নিরুপমা দেবীকে। তিনি পত্রিকাটিকে ধর্মীয় গোঁড়ামির উর্দ্ধে যথার্থ সাহিত্যমূল্য সমন্বিত পত্রিকা হিসাবে যথাযত মর্যদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থ 'বসন্তমালিকা'। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ধূপ' প্রকাশিত হয় ১৯১৮ সালে। পরবর্তী কালে শান্তিনিকেতনে অবস্থান কালে রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু ছোটগল্পের নাট্যরূপ দেন। তিনি নিজেও একটি গীতি নাটিকা 'নাচের জন্ম' রচনা করেন। রাজশেখর বসুর 'ভূশণ্ডীর মাঠ' এবং বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের 'পরীর দেশ' ছোটগল্প দুটিরও তিনি নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর 'শেষের কবিতা' কাব্যগ্রন্থ। শেষ জীবনে জলঙ্গী নদীর তীরে নদীয়ার সাহেবনগরে তাঁর আশ্রমে বসে রচনা করেছিলেন আত্মকথা 'আমার জীবন'। তাঁর মৃত্যুর দশ বছর পর এই রচনা প্রকাশিত হয়।

কোচবিহারের রাজদরবারের সাহিত্য সাধনার সঙ্গে যুক্ত না হলেও আর একটি সারস্বত প্রয়াসের কথা কথাশেষে উল্লেখ অবশ্যকর্তব্য। কোচবিহারের রাজদুহিতা এবং জয়পুরের মহারানী গায়ত্রী দেবী রচিত আত্মকথন—''A Princess Remembers : The Memories of the Maharani on Jaipur'' গ্রন্থটি কোচবিহারের সমকালের নানা তথ্যের আকর। ফলে রাজদরবারাশ্রিত সাহিত্যকীর্তি হিসাবে না হলেও আধুনিক কোচবিহারের ক্রমপরিবর্তনের প্রামান্য সূত্র হিসাবে গ্রন্থটির মূল্য অনস্বীকার্য।

এ তাবৎ আলোচনায় মুখ্যত স্থান করে নিয়েছে বাংলা রচনাগুলি। যার মধ্যে অধিকাংশই হল নানা পুরাণ, ভাগবত এবং রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ। কিন্তু এর পাশাপাশি ভিন্নধর্মী কিছু রচনাসম্ভারও এই সাহিত্যভাণ্ডারকে পুষ্ট করেছিল। তার মধ্যে প্রধান হল তত্ত্বধর্মী সংস্কৃত সাহিত্য। কোচবিহার নৃপতিরা প্রত্যেকেই ছিলেন বিদ্যানুরাগী।

রাজ্যশাসনের আদিকাল থেকেই এই প্রান্তিক রাজদরবারের লক্ষ্য ছিল আপন কৌম জনসমাজকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের ধারায় অভিষিক্ত করার। তাই বারেবারে তাঁরা গৌড় অঞ্চল থেকে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের এনে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ রাজপদে নিয়োগ করতেন এবং স্মৃতি, শাস্ত্র, সংহিতার নানা পুথি রচনাতে উৎসাহিত করতেন। এভাবেই এই রাজদরবারে তত্ত্বাশ্রয়ী রচনার একটি সমান্তরাল ধারা প্রবাহিত হতে থাকে। পরবর্তীকালে মহারাজারাও অনেকে সংস্কৃত ভাষায় রচনার স্বাক্ষর রেখেছেন। কিন্তু সংস্কৃত রচনা সম্ভারের বিশেষত্ব হল, এই ভাষায় কাব্য বা নাটক বিশেষ রচিত হয়নি। মুখ্যত ধর্মতত্ত্ব ও পূজাবিধি এবং নানা শাস্ত্রীয় বিধি বিধান লিপিবদ্ধ করতেই সংস্কৃত পুথিগুলি রচিত হত। পাশাপাশি ষোড়শ শতক থেকে পুষ্টিলাভ করেছিল অসমীয়া ভাষায় রচিত সাহিত্য সম্ভারও। ধর্মাচার্য শঙ্করদেব ধর্মীয় তত্ত্ব প্রচারের পাশাপাশি কাব্য সাধনাতেও আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সুকবি শঙ্করদেব বেশ কিছু অঙ্কিয়া নাট, নামঘোষা, কীর্তন ঘোষা, প্রার্থনা বিষয়ক পদের রচয়িতা। তাঁর শিষ্য মাধবদেব ও দামোদর দেবের সুচারু লেখনীতেও বেশ কিছু পদ ও নাটের হদিশ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালেও শঙ্করদেবের মতানুসারী অদ্বৈত বৈষ্ণব মার্গের বেশ কয়েকজন সাধক কবির আবির্ভাব ঘটে। আচার্য শঙ্করদেব অসমীয়া ভাষার সঙ্গে ব্রজবুলির মিশেলে কিছু অসাধারণ পদসৃষ্টি করেছিলেন। পরবর্তীকালের কবিরা অবশ্য ব্রজবুলি ও অসমীয়ার মিলনকে তেমন রসোত্তীর্ণতায় নিয়ে যেতে পারেন নি। কিন্তু আবেগের অভাব তাঁদের ছিল না, আর এই আবেগই কোচ দরবারাশ্রিত অসমীয়া সাহিত্য সম্ভারকে পুষ্ট করেছে ভাগবদ্‌ভক্তির উচ্ছ্বাসে। বলা বাহুল্য এই উচ্ছ্বাস রাজধর্ম হিসাবে বৈষ্ণবধর্মকে স্বীকৃতি দেওয়ার পর জনমানসেও ছিল অপ্রতিহত, তাই বারবার রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষণায় কবিরা ফিরে গেছেন বৈষ্ণবীয় ভাবধারার অতীন্দ্রিয় অনুভূতির জগতে। একের পর এক রচিত হয়েছে, অনুদিত হয়েছে বৈষ্ণবীয় সাহিত্য-তত্ত্ব-দর্শন। বৈষ্ণব সাহিত্য রচনার ধারা বহুমুখী স্রোতোধারায় ভাসিয়ে দিয়েছে সম্ভ্রান্ত রাজন্য ও সাধারণ মানুষের ভেদ, শঙ্করীয় দর্শনের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দূরত্ব। সেই ভাগবতী ভোগবতী ধারায় পরিচয়ই পরবর্তী অধ্যায়ের উপজীব্য।

উল্লেখপঞ্জি ঃ

১। 'কোচবিহার দর্পণ' পত্রিকা, ফাল্গুন ১৩৫৩, রাজশক ৪৩৭, ৯ম বর্ষ, ১১ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১৮৩।
২। তদেব, পৃষ্ঠা-১৭৭-১৭৮।
৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ, রাজসভার কবি ও কাব্য, কলকাতা, বামা পুস্তকালয়, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৭৯।
৪। রায়, স্বপনকুমার, কোচবিহার রাজদরবারের সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, বুক্‌স্ ওয়ে, প্রথম প্রকাশ ২০১১, পৃষ্ঠা-৫।
৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ, রাজসভার কবি ও কাব্য, কলকাতা, বামা পুস্তকালয়, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৮১।
৬। রায়, স্বপনকুমার, কোচবিহার রাজদরবারের সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, বুক্‌স্ ওয়ে, প্রথম প্রকাশ ২০১১, পৃষ্ঠা-৬।
৭। তদেব, পৃষ্ঠা-৬।
৮। তদেব, পৃষ্ঠা-৬।
৯। তদেব, পৃষ্ঠা-৭।
১০। আহমদ, খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা, কোচবিহারের ইতিহাস, কলকাতা, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ ২০০৮, পৃষ্ঠা-৮৭।
১১। তদেব, পৃষ্ঠা-৫-৬।
১২। বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ, রাজসভার কবি ও কাব্য, কলকাতা, বামা পুস্তকালয়, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-১৭৯।
১৩। রায়, স্বপনকুমার, কোচবিহার রাজদরবারের সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, বুক্‌স্ ওয়ে, প্রথম প্রকাশ ২০১১, পৃষ্ঠা-১২।
১৪। তদেব, পৃষ্ঠা-২৪৯।
১৫। তদেব, পৃষ্ঠা-১৪।

১৬। তদেব, পৃষ্ঠা-১৬৮।

১৭। তদেব, পৃষ্ঠা-২৮, ১৬৮।

১৮। তদেব, পৃষ্ঠা-১৮।

১৯। তদেব, পৃষ্ঠা-১৪৫-১৪৬।

২০। তদেব, পৃষ্ঠা-১৪৬।

২১। তদেব, পৃষ্ঠা ১৫১-১৬১। প্রসঙ্গত রচয়িতা এই অংশে রাজপরিবারের সদস্যদের মুদ্রিত সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

২২। বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ, রাজসভার কবি ও কাব্য, কলকাতা, বামা পুস্তকালয়, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৮৮-৮৯।

২৩। তদেব পৃষ্ঠা-৮০

২৪। তদেব, পৃষ্ঠা-৮০,৮১।

২৫। রায়, স্বপনকুমার, কোচবিহার রাজদরবারের সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, বুক্‌স্ ওয়ে, প্রথম প্রকাশ ২০১১, পৃষ্ঠা-৭।

২৬-২৯। তদেব, পৃষ্ঠা-৮।

৩০। তদেব, পৃষ্ঠা-৯।

৩১-৩৪। পীতাম্বর রচিত 'ভাগবত দশম স্কন্ধ' পুথি নং-৫৮, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, কোচবিহার।

৩৫। পীতাম্বর রচিত 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ', পুথি নং-৮, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, কোচবিহার।

৩৬। রায়, স্বপনকুমার, কোচবিহার রাজদরবারের সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, বুক্‌স্ ওয়ে, প্রথম প্রকাশ ২০১১, পৃষ্ঠা-১৩।

৩৭। পীতাম্বর রচিত 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ', পুথি নং-৮, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, কোচবিহার।

৩৮। রায়, স্বপনকুমার, কোচবিহার রাজদরবারের সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, বুক্‌স্ ওয়ে, প্রথম প্রকাশ ২০১১, পৃষ্ঠা-১৫

৩৯-৪১। তদেব, পৃষ্ঠা-১৬

৪২। অনন্ত কন্দলী রচিত ভাগবত, দশম স্কন্ধ, পুথি নং-১৯ , উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, কোচবিহার।

৪৩। রায়, স্বপনকুমার, কোচবিহার রাজদরবারের সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, বুক্‌স্ ওয়ে, প্রথম প্রকাশ ২০১১, পৃষ্ঠা-১৯।

৪৪। তদেব, পৃষ্ঠা-২১।

৪৫। তদেব, পৃষ্ঠা-২৩।

৪৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ, রাজসভার কবি ও কাব্য, কলকাতা, বামা পুস্তকালয়, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৮৮-২৫।

৪৭। রায়, স্বপনকুমার, কোচবিহার রাজদরবারের সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, বুক্‌স্ ওয়ে, প্রথম প্রকাশ ২০১১, পৃষ্ঠা-১৯।

৪৮-৪৯। তদেব, পৃষ্ঠা-২৬।

৫০। তদেব, পৃষ্ঠা-২৭।

৫১। তদেব, পৃষ্ঠা-২৮।

৫২। তদেব, পৃষ্ঠা-২৯।

৫৩। তদেব, পৃষ্ঠা-৩১।

৫৪-৫৫। তদেব, পৃষ্ঠা-৩০।

৫৬। তদেব, পৃষ্ঠা-৩২।

৫৭। তদেব, পৃষ্ঠা-৩৫।

৫৮। তদেব, পৃষ্ঠা-৩৬।

৫৯। তদেব, পৃষ্ঠা-৪০।

৬০। তদেব, পৃষ্ঠা-৪১।

৬১। তদেব, পৃষ্ঠা-৪২।

৬২-৬৩। দ্বিজ রাম বিরচিত, 'মহাভারত ভীষ্মপর্ব', পুথি নং ১৯। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, কোচবিহার।

৬৪। রায়, স্বপনকুমার, কোচবিহার রাজদরবারের সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, বুক্‌স্ ওয়ে, প্রথম প্রকাশ ২০১১, পৃষ্ঠা-৪৪।

৬৫। আহমদ, খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা, কোচবিহারের ইতিহাস, কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ-১৯৯০, পৃষ্ঠা-১৮৭।

৬৬। রায়, দীপককুমার, কোচবিহার রাজদরবারের পুথি পরিচয়, কলকাতা, ছায়া পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ ১৪২১, পৃষ্ঠা-১৩১।

৬৭। রায়, স্বপনকুমার, কোচবিহার রাজদরবারের সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, বুক্‌স্ ওয়ে, প্রথম প্রকাশ ২০১১, পৃষ্ঠা- ৪৫।

৬৮। তদেব, পৃষ্ঠা-৪৬।

৬৯। Dasgupta, Shashibushan, A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts, Ed. Published by the Superintendent of Press, Cooch Behar, 1984.

৭০-৭১। রায়, স্বপনকুমার, কোচবিহার রাজদরবারের সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, বুক্‌স্ ওয়ে, প্রথম প্রকাশ ২০১১, পৃষ্ঠা-৭৫-৭৭।

৭২-৭৭। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ বিরচিত 'উপকথা' পুথি নং ৬, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, কোচবিহার।

৭৮-৭৯। রায়, স্বপনকুমার, কোচবিহার রাজদরবারের সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, বুক্‌স্ ওয়ে, প্রথম প্রকাশ ২০১১, পৃষ্ঠা-৬৯।

৮০। তদেব, পৃষ্ঠা-৬৮।

৮১-৮২। তদেব, পৃষ্ঠা-৫৮।

৮৩-৮৬। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ বিরচিত 'রামায়ণ সুন্দরকাণ্ড' পুথি নং ৬০, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, কোচবিহার।

৮৭। রায়, স্বপনকুমার, কোচবিহার রাজদরবারের সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, বুক্‌স্ ওয়ে, প্রথম প্রকাশ ২০১১, পৃষ্ঠা-৬৪।

৮৮। তদেব, পৃষ্ঠা-৭৯।

৮৯-৯১। তদেব, পৃষ্ঠা-৮০।

৯২-৯৩। তদেব, পৃষ্ঠা-৯০।

৯৪। তদেব, পৃষ্ঠা-১০১।

৯৫। তদেব, পৃষ্ঠা-১০২।

৯৬। মাধবচন্দ্র শর্ম্মা বিরচিত 'বিষ্ণুপুরাণ' পুথি নং ২১, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, কোচবিহার।

৯৭। রায়, স্বপনকুমার, কোচবিহার রাজদরবারের সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, বুক্‌স্ ওয়ে, প্রথম প্রকাশ ২০১১, পৃষ্ঠা-১০৭।

৯৮-৯৯। তদেব, পৃষ্ঠা-১৩৩।

১০০। তদেব, পৃষ্ঠা-১৩৯।

১০১। তদেব, পৃষ্ঠা-১৩৫।

১০২। তদেব, পৃষ্ঠা-১৪৮।

১০৩। তদেব, পৃষ্ঠা ১৪৫-২১৭। দুটি অধ্যায় জুড়ে রচয়িতা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন মুদ্রণযন্ত্রেণ প্রতিষ্ঠা ও মুদ্রণের যুগে কোচবিহার রাজ পরিবারের সদস্যদের সাহিত্যচর্চার বিবরণ।

———

বৈষ্ণব সাহিত্য ও কোচবিহার রাজদরবার

এ কথা অনস্বীকার্য যে সমগ্র উত্তরপূর্ব ভারতে কোচবিহার রাজ্য (পূর্ববর্তী কামতাপুর) ভাষা-ব্যাকরণ-সাহিত্য চর্চার পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী থেকেই, অর্থাৎ "খেন" রাজবংশের সময়কালেই সাহিত্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। পরবর্তীকালে কোচ রাজবংশের পৃষ্ঠপোষণায় সেই সাহিত্যচর্চা অভূতপূর্ব প্রসার লাভ করে। তন্ত্র স্মৃতি ব্যাকরণচর্চা যেমন ছিল, তেমনই ছিল রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত অনুবাদের ধারা। আর ছিল মনসামঙ্গল চর্চার ইতিহাস। মধ্যযুগে মহাপুরুষ শঙ্করদেবের আবির্ভাব এবং জীবনের এক সুদীর্ঘ অংশ কোচ রাজসভার সঙ্গে তাঁর সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে কোচ রাজসভাশ্রিত সাহিত্যে বৈষ্ণব প্রভাব স্বভাবতই বেশি। তাঁর প্রবর্তিত 'একশরণ নামধর্ম' পরবর্তীকালে শিষ্য দামোদরদেবের প্রেরণায় রাজধর্মে পরিণত হয়। যদি ও ততদিনে মাধবদেব এবং দামোদরদেব দুটি ভিন্ন সাধনমার্গ অবলম্বন করেছেন। বৈষ্ণব সাহিত্য তার নানামুখী উৎকর্ষতায় পৌঁছায় কোচরাজ লক্ষ্মীনারায়ণ ও তাঁর পরবর্তী রাজাদের অনুপ্রেরণায়। পাশাপাশি শাক্ত পদ ও সাহিত্য তথা তন্ত্রের বিষয়েও চর্চা হতে থাকে। শঙ্করদেব প্রচারিত ধর্মে কেবল বিষ্ণুবিগ্রহই অর্চিত, রাধার সেখানে স্থান নেই।[১] বর্তমানেও কোচবিহার ও উত্তর-পূর্বের বৈষ্ণব ধর্মে কেবল মদনমোহনই পূজিত। কিন্তু দরবারী সাহিত্যে উজ্জ্বল উপস্থিতি চৈতন্যদেবের জীবনীগ্রন্থগুলিরও। এভাবেই কোচবিহার রাজসভার পৃষ্ঠপোষণায় গড়ে ওঠে এক সুবিপুল সাহিত্য ভাণ্ডার যা একাধারে মনীষায় উজ্জ্বল এবং পরমত সহিষ্ণুতায় স্নিগ্ধ।

কামতা রাজ্যে কোচশাসন শুরু হয় ষোড়শ শতাব্দীতে। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ বা চতুর্দশ শতাব্দী থেকেই কামতা রাজ্যে সাহিত্য সাধনার পরিবেশ গড়ে ওঠে। কামতাপুর অধিপতি রাজা দুর্লভনারায়ণের সভাকবি হিসাবে হরিহর বিপ্র ও কবিরত্ন সরস্বতী নামে দুজন কবির সংবাদ জানা যায়। হরিহর বিপ্র এবং কবিরত্ন সরস্বতী একই সময়ে মহাভারতের বিভিন্ন অংশের অনুবাদ করেছিলেন। হরিহরের 'অশ্বমেধ পর্ব'-এর ভণিতা থেকে জানা যায়—

"জয় জয় নৃপতি দুর্লভনারায়ণ রাজা
কামতাপুর ভৈলা বীরবর॥
সপুত্র বান্ধব জেবে সুখে রাজ্য করন্তক
জীবন্তক সহস্র বৎসর॥
তাহান রাজ্যত যত সাধুজন মনমত
অশ্বমেধ পদমধ্যে সার।
বিপ্র হরিহর কবি হরির চরণ সেবি
পদবন্ধে করিলা প্রচার॥"[২]

কবিরত্ন সরস্বতী অনুবাদ করেন মহাভারতের "দ্রোণপর্ব।" এই কাব্যের ভণিতায় জানা যায় তিনি মহারাজা দুর্লভনারায়ণের পুত্র ইন্দ্রনারায়ণের সভাকবি হিসাবে তাঁর কাব্য রচনা করেন। কামতা দরবারের অপর এক কবি রুদ্রকন্দলীও মহাভারতের কিছু অংশ অনুবাদ করেছিলেন। এই মধ্যযুগের অপর এক শক্তিশালী কবি ছিলেন মাধবকন্দলী। তিনি রামায়ণ অনুবাদ করেন। অনুমান করা হয় তিনি প্রথম পাঁচটি খণ্ড অনুবাদ করেন, পরবর্তীকালে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব এবং মাধবদেব বাকি দুটি খণ্ড অনুবাদ করেন। মাধবকন্দলীর কাব্যের কোন পৃষ্ঠপোষক রাজার উল্লেখ না থাকায় তাঁর রচনার যথাযথ সময় ধারণা করা যায় না। কিন্তু নরনারায়ণের সমকালীন শ্রীমন্ত শঙ্করদেব

বা মাধবদেবের রচনায় মাধবকন্দলীর প্রতি সসম্ভ্রম উক্তি প্রমাণ করে তিনি অন্তত মহারাজা নরনারায়ণের সময়কালের পূর্ববর্তী। খ্যাতির বিচারে এগিয়ে থাকা মানবকন্দলীকে যদি কোচরাজংশের পূর্ববর্তী রাজত্বের অঙ্গীভূত করতে হয় তাহলে এটুকু বলা যায় কোচ রাজবংশ স্থাপনার আগেই কামতাপুর রাজসভায় এক সাহিত্যিক পরিমণ্ডল ছিল যা রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ অনুবাদ দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল। এই সমৃদ্ধ সাহিত্যিক উৎকর্ষতারই উত্তরাধিকার লাভ করে পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত কোচ রাজবংশ, যাঁরা এই সাহিত্যিক উৎকর্ষতাকে পৌঁছে দিয়েছিলেন শীর্ষে।

খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের একটি বড় অংশ জুড়ে ছিল মঙ্গলকাব্যের বিস্তৃতি। কামতাপুরও তার ব্যতিক্রম ছিল না। কোচ রাজদরবারে মনসামঙ্গল রচনার ধারা অব্যাহত ছিল। ছিল তন্ত্র-স্মৃতি-ন্যায় সীমাংসার ধারাও। কিন্তু গৌড়বঙ্গে যেমন শ্রী চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম সর্বগ্রাসী প্লাবনে ভাসিয়ে নিয়ে যায় সবকিছু, এবং চৈতন্য যুগের সূচনা হয়;তৎকালীন কামতা-কামরূপ অঞ্চলেও শ্রীমন্ত শঙ্করদেব ও তাঁর সুযোগ্য শিষ্য শ্রীমাধবদেব ও শ্রী দামোদরদেবের নেতৃত্বে দেখা দেয় অভূতপূর্ব বৈষ্ণব আন্দোলন যার অবশ্যম্ভাবী ফল হয় সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে নতুন নতুন ভাবের স্ফুরণ। প্রাক্ বৈষ্ণব যুগে, এমনকি কোচরাজবংশের শাসনকালের আগেই চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে রামায়ণ মহাভারত অনুবাদের মাধ্যমে ভক্তির ভিত্তিভূমি প্রস্তুত ছিলই। কোচ রাজাদের অনুপ্রেরণায় রচিত হতে লাগল নানা অনুবাদগ্রন্থ। বৈষ্ণব মহান্তরা রচনা করলেন তাঁদের মহামূল্যবান গ্রন্থগুলি। স্বাভাবিক ধার্মিক অনুপ্রেরণায় চৈতন্য জীবনীর অনুলিপি ও রাজদরবারে স্থান পেল। এভাবেই অন্যান্য রচনার পাশাপাশি গড়ে উঠল এক সুবিপুল বৈষ্ণব সাহিত্য সম্ভার সেই বৈষ্ণব সাহিত্যসম্ভারের আলোচনা সূত্রে তৎকালীন রাজদরবারের পুথিশালায় (বর্তমানে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের পুথিশালায়) সংরক্ষিত কয়েকটি পুথির আলোচনা এই অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হল। আলোচিত পুথিগুলি হল—

১। কবি পীতাম্বর অনূদিত 'ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ' (পুথি নং ৫৮)
২। কবি হৃদানন্দ বিরচিত 'চৈতন্য চরিত' (পুথি নং ৫০)
৩। কবি মাধবচন্দ্র শর্মা বিরচিত 'বিষ্ণুপুরাণ' (পুথি নং ২১)
৪। কবি জগতসিংহ প্রণীত 'গীত গোবিন্দ' (পুথি নং ৫১)
৫। কবি কালিদাস বিরচিত 'চৈতন্যগীতা' (পুথি নং ৩৫)
৬। কবি অদ্ভুতাচার্য বিরচিত 'রামায়ণ' (পুথি নং ৫৯)

পীতাম্বর রচিত ভাগবত ১০ম স্কন্ধ, পুথি নং-৫৮, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার

মহারাজা বিশ্বসিংহের রাজত্বকালে পীতাম্বর নামধারী একজন কবি 'ভাগবত ১০ম স্কন্ধ' অনুবাদ করেন। সম্ভবত কোচবিহার রাজদরবারে এটাই ভাগবত অনুবাদের প্রথম প্রয়াস। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে পীতাম্বরের 'ভাগবত ১০ম স্কন্ধ' (পুথি নং ৫৮) মার্কণ্ডেয় পুরাণ (পুথি নং ৮ এবং ১৩) সংরক্ষিত আছে।[৩] কবি পীতাম্বর সম্ভবত রাজা বিশ্বসিংহের এবং রাজপুত্র সমরসিংহের (শুক্লধবজ) পৃষ্ঠপোষণায় কাব্যরচনা করেন। ভাগবত অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন মূলানুসারী এবং আগাগোড়া সহজবোধ্য ভাষায় রচিত। তাঁর রচনা থেকেই রাজার ও রাজপরিবারের বৈষ্ণবীয় ধারার প্রতি আকর্ষণের কথা জানা যায়। বস্তুত, কবি পীতাম্বর অনূদিত রচনাটি বিশদ আলোচনার দাবি রাখে।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পীতাম্বর রচিত 'ভাগবত ১০ম স্কন্ধ' সংরক্ষিত ৫৮ নং পুথি হিসাবে। পুথিটি জীর্ণ, প্রথম দিকের একাধিক পাতা অপাঠ্য। দেশি তুলট কাগজে লেখা পুথিটির পরবর্তী পাঠযোগ্য পৃষ্ঠাগুলির মধ্যেও অধিকাংশই কীটদষ্ট। বর্ণাশুদ্ধি প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে বর্ণ বাদ পড়ে গেছে, ফলে বানান সম্পর্কে ধারণা করা অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। কবির আত্মপরিচয় সূচক কোন শ্লোক পাওয়া যায়

নি, ফলে কবির বিষয়ে বিশদ জানতে পারা যায় নি। তাঁর কাব্যরচনার সময়কাল সম্বন্ধেও সঠিক তথ্য জানা যায় না। তবে তাঁর ভাগবত রচনার নানা স্থানে মহারাজা বিশ্বসিংহ এবং রাজকুমার সমরসিংহের উল্লেখ কবিকে ষোড়শ শতাব্দীর ভাগবত অনুবাদক হিসাবে প্রতিষ্ঠা দেয়।

উদাহরণ স্বরূপ—

১. প্রচণ্ড প্রতাপ বিশ্বোসিংহ নররায়।
দানে হরীশ্চন্দ্র ভোগে পুরন্দর প্রায়॥
কুমার সমরসিংহ আজ্ঞা পরমাণে।
কৃষ্ণ কেলি সুপয়ার পিতাম্বর ভণে॥

২. "নৃপ বিশ্বোসিংহ জল্পেশ্বর অবতার।
হইল কুমার তার গুণের আধার॥
কুমার সেমরসিংহ আজ্ঞা পরমাণে।
কৃষ্ণকেলি সুপয়ার পিতাম্বর ভণে॥"

৩. কামতানগরে বিশ্বোসীংহ নরেশ্বর।
তাহার তনয় বড় গুণের লোকর॥
কুমার সমরসিংহ আজ্ঞা পরমাণে।
কৃষ্ণকেলি সুপয়ার পিতাম্বর ভণে॥"

এখানে স্পষ্টতই প্রতিপত্তিশালী রাজা বিশ্বসিংহের নাম উঠে আসে।

পীতাম্বর বিরচিত কাব্যখানি মূল ভাগবতের অনুসারী। ভাগবতের দশম স্কন্ধে বর্ণিত যাবতীয় ঘটনাই তিনি অনুপুঙ্খ ভাবে বর্ণনা করেছেন। বিরল কয়েকটি ক্ষেত্রে কবি স্বাধীন কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। যেমন বকাসুর বধের আখ্যানে কৃষ্ণ ও গোপশিশুদের যমুনাতে স্নানের বর্ণনা করেছেন, যেখানে মূল ভাগবতে নদীর নামের উল্লেখে তাকে কোথাও যমুনা বলা হয়নি। ভাগবতে কৃষ্ণসখা হিসাবে শ্রীদামের নাম পাওয়া যায়। যা পীতাম্বরের কাব্যে হয়েছে সুদামা। ভাগবতে আছে দেবযাত্রা উপলক্ষে শিব-পার্বতী পূজা অন্তে বিশ্রামরত নন্দকে অজগর আক্রমণ করলে তিনি প্রাণভয়ে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকেন, কিন্তু পীতাম্বরের কাব্যে আক্রান্ত নন্দ রাম ও কৃষ্ণ উভয়কে ডাকতে থাকেন। সম্ভবত কামতাপুর অঞ্চলে রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদের ফলে সমাজে সমান্তরাল বয়ে চলা রামভক্তি ও কৃষ্ণভক্তির ফ ল হতে পারে। এভাবেই কোনো চরিত্র বা কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সামান্য বদলের মধ্যে কবিকল্পনার স্বাধীনতা উপভোগ করেছেন তিনি। কিন্তু ঘটনাবলী বর্ণনা ও কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপের বর্ণনায় তিনি ছিলেন আপোসহীন। কৃষ্ণের জন্মসম্ভাবনা দিয়ে কাব্যের আরম্ভ। এরপর বসুদেবের সদ্যোজাত কৃষ্ণকে নিয়ে নন্দ ভবনে যাত্রা, যশোদার পুত্রস্নেহ, কৃষ্ণের শৈশবকালীন বিবরণ ও লীলা, যেমন পূতনাবধ, যশোদাকে মুখগহ্বরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দর্শন করানো প্রভৃতি বর্ণিত। বাল্যলীলার সূচনা হয়েছে যমল-অর্জ্জুন উদ্ধার পর্ব দিয়ে। এরপর পর্বত দৈত্য বধ, অঘাসুর ধেনুকাসুর বধ বর্ণিত। কালীয়দমন পর্ব বর্ণনায় কবির রচনানৈপুণ্য এবং কালীয় নাগ কৃষ্ণকে মেরে ফেলেছে ভেবে যশোদার করুণ আর্তি মর্মস্পর্শী। এরপর কবি ব্যোম নামে অসুরের বর্ণনা করেছেন। গোচারণ কালে ব্যোম আক্রমণ করলে কৃষ্ণ তাকে বধ করেন। বাল্যলীলা বর্ণনার পর অক্রূরের আগমন, কৃষ্ণের মথুগমন, ত্রিবক্রার মনোগত অভিলাষ পূর্ণ, অতঃপর কংসবধের বিস্তারিত বর্ণনা কবির সহজ সুন্দর ভাষায় বর্ণিত। এরপর উদ্ধবের কৃষ্ণের সংবাদ নিয়ে বৃন্দাবন গমন, জরাসন্ধর সঙ্গে কৃষ্ণের বিরোধ বর্ণনা, রুক্মিনীর সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহ

প্রভৃতি বর্ণিত। অতঃপর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পটভূমিতে আবির্ভাব হল শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যমূর্তির। পাণ্ডবপুরীতে গমন, ভীমার্জ্জুনের সাহায্যে জরাসন্ধ বধ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ, শিশুপাল বধ, বলরামের তীর্থ পর্যটন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ প্রভৃতি বর্ণনা করে অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের "হরি-হর" মূর্তিতে আবির্ভাব বর্ণনার পর কাব্যের সমাপ্তি। কবি অত্যন্ত সুচিন্তিত শব্দচয়নে সাজিয়েছেন তাঁর কাব্য। এর ফলে একাধারে যেমন তাঁর বর্ণনা হয়েছে সংহত এবং বস্তুনিষ্ঠ, অন্যদিকে তা হয়ে উঠেছে কবির মানসভূমির প্রতিবিম্ব। কাব্যটিতে কবির পরম বৈষ্ণব মনোভাব ফুটে উঠেছে কিন্তু কোথাও অতিরিক্ত আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে নি। কাব্যের সূচনায় দেবকী বসুদেবের বিবাহের পর দৈববাণী শুনে কংসের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলেন—

"আছিল মথুরাগ্রামে পুরি পুণ্যবতী।
সুরসেন নাম তাত এক নরপতি॥
বসুদেব নাম ছিল তাহার তনয়।
সর্ববিদ্যা নিধান অতি শে গুণময়॥
দেবকীনন্দনী সে দৈবকী মহাসতি।
করিল বিবাহ বসুদেব সুদ্ধমতি॥
রথগজ দাশী দাস কনক রতন।
দেবকে যৌতুক দিল জাঞিত কতখন॥
অনন্তরে বসুদেব দৈবকি সহিতে।
রথত চড়িল গিআ আতি হরষিতে॥
কনক চাবুক হাতে কংস দৈত্যপতি।
আপনে হঈল গিআ রথের সারথি॥
এমন পবন যেন রথের সঞ্চার।
জাঈতে আকাসিবানি সুনি দুর্ব্বার॥
ওরে রে বর্ব্বর কংশ সুনা দুরাচার।
দৈবকী অষ্টম গর্ব্ভে হইব কুমার॥
সেহি সে অন্তক তোর জান মহাসএ।
দৈবকিক বাহিবাক তোর কী জুআয়॥
আকাশি বচন কংশ সুনি হেন জাঈতে।
দৈবকীর কেশত ধরিল বাম হাতে॥
কাটিবাক আসে কংশ হৈল খড়্গপানি।
দেখি বসুদেব স্তুতি বোলে মৃদু বানি॥
তুমি মহারাজা কংশ ভুবন বিদিত।
স্ত্রিবধ পাতক তোমার অনুচিত॥

অতঃপর জন্মমাত্র সন্তান কংসের হাতে তুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসুদেব দেবকী নিজগৃহে যান। সন্তান জন্মানোমাত্রই বসুদেব যখন কংসের কাছে আসেন তখন—

"হাসিয়া হাসিয়া কংশ বুলিল বচন।
লআ জাহ ঈহাত নাহিক প্রওজন॥

জখন হৈবেক তুয় তনয় অষ্টম।
আকাশে সুনিলো বানি সেহি আমার জম॥
দৈবকী অষ্টম গর্ব্ভ হৈবেক জখন।
ভুমিষ্ঠ হইলে মোক দিবা ততিক্ষণ॥
সেহি সে মোহোর মির্ত্তু কহিল নিশ্চীতে।
সুনি বসুদেব ঘর গেলা হরষিতে॥
নরপতি বিস্বোসীংহ পরম শৃমন্ত।
জার কির্তি প্রচারি গেল দিগ দিগান্ত॥
প্রচণ্ড প্রতাপ আদি গুণের আলয়।
হৈল গুণর নোকর তাহার তনয়॥
দুর্য্যন দলন সর্য্যনের মনোরম।
বড় বটে রসীক জুবত পঞ্চানন॥
কুমার সমর সিংহ আজ্ঞা পরমাণে।
কৃষ্ণকেলি সুপআর পিতাম্বর ভনে॥"

অবশেষে একদিন নারদ মুনি এলেন, এবং বলা বাহুল্য কুমন্ত্রণা দিয়ে উত্তেজিত করে গেলেন কংসকে। যার ফলস্বরূপ—

"তবে কংসাসুর সেবক প্রচুর
পাঠায়া দিল তখনে॥
দৈবকী বসু দেবক আনিএঁা
থুইল নিগড় বন্ধনে।
দৈবকী কুমার আনি পুনবর্বার
অগ্রতে মারীল তেনে॥
জত উপজিল সকলে মারীল
না রাখীল একজন।
বাপ ভাই জত সুরিদ সমস্ত
সবাকে পিড়ে দুর্য্যন॥
বাপ আপনার আনি দুরাচার
আগত নিগড় দিআ।
আন বন্ধু জত পাঈল সমস্ত
সবাক থুইল বান্ধিয়া॥
আন জত জত পলাঈল সমস্ত
দেস দেসান্তরে ভাগী।
মৎস বিধর্ব্বক অবন্তি দেসক
কুরু পঞ্চালক লাগি॥
কতো জদুগণ পসিল স্বরণ
ভক্তিভাব দরসি আ।

প্রাণমাত্র রাখি সকল উপেক্ষি
রহিল কংস সেবিআ॥"

সব কিছু ছারখার করা অত্যাচারী রাজশক্তির ভয়ে পীড়িত দেশবাসীর অসহায় ছবি ফুটে উঠেছে এখানে। পাশাপাশি কেবল প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে "ভক্তিভাব দরসিআ" আপাত রাজভক্ত নাগরিকদের কংসের ভয়ে ভীত প্রাণরক্ষার্থে আপোস করে বেঁচে থাকার ছবিটি বাস্তব সম্মত তো বটেই, চিরকালীন ও বটে। আজও এই ছবির প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করা যায় না। অতঃপর বলরাম জন্ম এবং দেবকীর অষ্টম সন্তান কৃষ্ণের জন্ম সম্ভাবনা। কবি বর্ণনা করেছেন জশোদার গর্ভে মহামায়ার এবং দেবকীর অষ্টম গর্ভে বিষ্ণুর জন্ম সম্ভাবনা—

"তাত অনন্তরে দেব দেব নারায়ণ।
পুর্ন্নব্রহ্ম সনাতন জগত কারণ॥
জোগির অগোচর আকার বিবর্য্যিত।
হেন দেব আসি হৈল ভুবন বিদিত॥
সেবক দআয় তার দৈত্যের বিনাশে।
ভুবন নিবাশ রহিলন্ত গর্ব্ভবাশে॥
সকল জগত জার জঠর ভিতরে।
হেন দেব দৈবকীয়ে ধরীল ওদরে॥
বিষ্ণু তেজমঈ হৈল দেবকনন্দনী।
জলিতে লাগিল দির্ঘ রূপ সুশোভিনী॥
দৈবকীর পতি দেখি কংশ গুনে মনে।
হৈল আমি জে সুনিলো আকাশ বচনে।
তেজ পূঞ্জমঈ তনু দেখো দৈবকীর।
এহি সে অষ্টম গবর্ভ জন্ম হরীর॥
গুনিয়া কংশের সুপ্ত নাহিকে হৃদয়।
সদা চিত্তে দৈবকীর অষ্টম তনয়॥
পাছে সিব ব্রহ্মা আদি যত দেবগন।
দেখিল দৈবকীগর্ভে আঈল নারায়ণ॥"

পিতা বসুদেব অলৌকিক উপায়ে হলেন মুক্তশৃঙ্খল। অতঃপর ঘনবর্ষার রাতে শিশুকৃষ্ণকে নিয়ে বসুদেব নন্দগৃহে যাত্রা করেন—

"গগনে গরজে ঘন কোলে লআ নারায়ণ
বসুদেব চলে ধিরে ধিরে॥
এ পালি প্রহরীগণ সবে নিন্দে অচেতন
খসিল কপাট সিতোদ্বারে॥
মন্দ মন্দ বরিসন বৃষ্টি নিবারণ ঘন
অনন্ত ভূজঙ্গ অধিপতি।
সিরে সহশ্রেক ফনে ছত্র ধরীল তখনে
গোবিন্দক করিতে পিরিতি॥

বসুদেব শিরত জেন শোভে আতপত
দেখ নারায়ণের সহিতে।
বড়ার শংহতি হঈয়া য়লপজনে
সম্পদ পাবয় এহি মতে॥
পদগতি মন্দ করে গেল জমুনার তিরে
ঘাটত রহিল ততক্ষণে।
ফেনার তরঙ্গ ঘন দেখিয়া চমকে মনে
স্রোতে জেন সঞ্চরে পবন॥
জলজন্তু ভয়ঙ্কর কুম্ভির মিন মগর
সঙ্কুল জমুনা নদিতিরে।
স্রোতের সবদ ঘন জেন জলধগর্য্যন
সুনি বড় কম্পয় সরীরে॥
বসুদেবের কলে দেখি ত্রৈলোক্যের নাথ
তখনে জমুনা তরঙ্গিনী।
গম্ভির জমুনা নির ভয় মনে মহাবির
মরন আপনার গুনি॥
পাছে ত্রৈলোক্যের পতি জানিয়া তাহার গতি
মাআ করিলন্ত নারায়ণ॥
ফেরূ এক হৈল পার বসুদেব দেখে জল
জমুনাত নামিল তখন॥

সহজ সরল বর্ণনা এবং স্বচ্ছন্দ কাহিনীর গতি কবির কাব্যের বিশেষত্ব। বাল্যলীলার অন্তর্গত অসুর বধের ঘটনা পরম্পরাগুলি স্বচ্ছন্দ গতিতে বর্ণিত। পাশাপাশি যশোদার মাতৃস্নেহ, নন্দ-যশোদার কৃষ্ণকে নিয়ে আনন্দময় জীবনযাত্রা সাধারণ বাঙালি পরিবারের আদলে আটপৌরে বর্ণনার উজ্জ্বল—

"বিহানে ভোজন করী গেল দুয়োজন।
খেড়ি খেলাইতে ক্ষুধা নাহি এতক্ষণ॥
প্রতুস বিহানে গেল বেলী হৈল অস্ত।
রৌদ্রে ঝামরীলা ঘর আশ্য জগন্নাথ॥
ভোজন না করে নন্দ তোমা পন্থ চাআ।
দুঃখ না দিয়ো ঘরে ঝাণ্টে আশ্য ধাআ॥
খির খাওশিআ জেবা রুচে মনে।
কালী হৈলে খেলাঈর্বা জত শিশু সনে॥
ধূলা রৌদ্রে খেলাইতে ঘাম বহে গাবে।
বচন না শুনে ছাআ কি করীব মাবে॥
ডাকাঈতে ভাঙ্গে গলা তেহো নাস্যে ঘরে।
তোর বাপে আসি ফল দিবেক তোমারে॥

এ তেল আমলা দিআ স্নান করাঈআ।
খিরসা সর্ক্করা দধী দিলেক বাড়িআ॥
ভোজন করীল রঙ্গে জত সিশুগন।
মাআয়ে মনুশ্য কেলি করে নারায়ণ॥
নারায়ণ কথা পাপকালান্ত অগুনী।
সুনিলে বৈকুণ্ঠ জায় খণ্ডয় বিঘিনী॥
কুমার সমরসিংহ আজ্ঞা পরমানে।
কৃষ্ণকেলি শুপআর পিতাম্বর ভনে॥"

এখানে যশোদার স্নেহময়ী মাতৃহৃদয় প্রকাশিত, কিন্তু কৃষ্ণকে ক্ষীর ননী খাওয়ানোর বর্ণনা তো বহুল প্রচলিত বর্ণনা। আসল সৌন্দর্যটুকু বাঙালি মায়ের ঐ অনুযোগের মধ্যে লুকিয়ে আছে—

"বচন না শুনে ছাআ কি করিব মাবে॥
ডাকাঈতে ভাঙ্গে গালা তেহো নাস্যে ঘরে।
তোর বাপে আসি ফল দিবেক তোমারে॥"

আজও দস্যি ছেলেদের সঙ্গে পেরে উঠতে না পারলে মায়েরা বাবার বকুনির ভয় দেখিয়ে শান্ত করেন বৈকি। মধ্যযুগের কবির কাব্যের সুরটুকু আজও তাই অমলিন।

এরপর কৃষ্ণের কৈশোরের নানা লীলা বর্ণিত। শেষে অক্রূরের বৃন্দাবন আগমন এবং কৃষ্ণ বলরামের মথুরাগমন, মুষ্টিক চানুর বধ এবং শেষে কংস বধ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন কবি—

"কংশ আপনার জম দেখি নিকটত।
এশে পায়া খড়্গা চর্ম্ম ধরীল হাতত॥
ধরিবাক নারায়ণ জায় জেহি দিশে।
খড়্গা ফিরায় কংস এড়াইবার আসে॥
ডেয় দিয়া নারায়ণ সেহি সময়ত।
বাম হাতে ধরীলন্ত কংসের কেসত॥
মঞ্চ হৈতে কংসকত ফেলিল আছড়ীয়া।
পড়িল তাহাত কৃষ্ণ বিশ্বম্ভর হআ॥
জীবন তেজিল কংশ ভূমিত পড়িয়া।
নির্ব্বাণ পরম পদ তেনে পাইল গিআ॥

কিন্তু দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন কৃষ্ণের ধর্ম হলেও কবির ধর্ম মানবপ্রেম, তাই কংসের পতনের পর তাঁর শোকাকুলা রাণীদের তিনি ভুলতে পারেন না—

"কংসের রমণী বাহিরাল্য সুনি
হিআ কুটে করতলে॥
বিমুকুত কেসপাস ক্ষনে ছাড়ে দীর্ঘশ্বাসহে
নয়ন ঢাকিয়া আখির জলে॥
অকি প্রাণনাথ কথা গেলা আমাকে ছাড়িয়া॥

আপনার দোসে প্রভু পরান হারাইলাহে
মধুপুরী অনাথ করীয়া॥
ধুলায় ধুসর হআ বিরসর্য্যাত সুতিয়া
জথা কংস আছে প্রান ছাড়ি।
তথা আশী নারীগনে কেহ মুরূছয়ে ঘনে
কেহ কান্দে চরনত পড়ি॥
কেহ সংখ কৈল দূর মোছে সিসের সিন্দুর
কাজল ধুইল আঁখিজলে।
গজমুকুতার হার ছিন্ডিয়া পেলাইলোহে
কর্ন্নের সব খসাইল কুণ্ডলে॥
হেন বিভু নারায়ণ শ্রীজীল তিন ভুবন
জাহার বচন সুমরনে।
জার পদ করী পুজা রাবণদেবের রাজা
তাক মন্দ বোলে কি কারণে॥
চরনের নিরে জার পারে মুকুতি দিবার
সংকরে ধরীল জাক শীরে।
হেন গোবিন্দের সনে বৈরিভাব করী হে
তাঞী কি না জাইব জমপুরে॥
গোদেব দ্বিজ সর্য্যন তাপ দিলা অনুক্ষণ
অল্প আউ হৈল তার সাপে।
অভাগিনী নারী গণ অনাথ করিলা হে
না জিব হো তোমার সন্তাপে॥
নারীর করূনাবানি সুনি দেব চক্রুপানি
আশ্বাস্য করিল ততিক্ষনে।
কুমর শেমরসিংহ আজ্ঞা পরমানে হে
সিশুমতি পীতাম্বর ভনে॥

ভাগবতের পরিচিত কাহিনী বা প্রচলিত হরিমহিমা সূচক বিষয় বর্ণনায় কবি সাবলীল ও সিদ্ধহস্ততো বটেই, পাশাপাশি অসাধারণ মমতায় ছুঁয়ে যান তাদেরও যাদের চোখের জল আর বিলাপ অনুক্ত থেকে যায় কাব্য সাহিত্যে। অতঃপর কৃষ্ণের মথুরা অধিপতি হওয়া এবং পরবর্তীকালে দ্বারকাধীশ রূপে অধিষ্ঠিত হওয়ার বর্ণনা আছে, জরাসন্ধ বধ ও শিশুপাল বধ প্রসঙ্গও বর্ণিত। কৃষ্ণ ও রুক্মিনীর বিবাহ প্রসঙ্গে উভয়ের রসমধুর প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক ফুটে উঠেছে যখন রুক্মিনীকে বিবাহের রাতে পরিহাসছলে তিনি বলেন—

"কোন কাম করীলা হে মুগুধি বরনারী।
গোপস্বামী বরিলেন রাজার কুমারী॥
হের দেখ তনু মোর না হয় সুন্দর।
কেবা মোক বুলিবেক রাজার কুমর॥

কোন কালে নাহি বসি আসী সিংহাসনে।
মোত মন রুক্মিনী মজাঈলে কোন গুনে॥
মথুরা ছাড়িলো মুঞি বৈরি ভয় পায়া।
সাগরের মধ্যে মুঞি আছিলো লুকীয়া॥
লোকের সম্বন্ধ আর কিছু নাহি মোর।
হেন বর রুক্মিনী হঈল কেনে তোর॥
জে সব পুরুষ বড় রূপে গুনে সুন।
জাচকে পাইলে তার কহে কিছু গুণ॥
তখন বোলভ মুঞি ছাড়ি দেঞোতোক।
বর জোগ্য স্বামী জেন ভাল বলে লোক॥"

কৃষ্ণের নিষ্ঠুর বাক্য শুনে

"হরীর নিষ্ঠুর বোলে জেন বিন্ধিলেক শেলে
ভয়ে দেবী হআ বিআকুলি॥
মুরূছিত অচেতন জেন চণ্ড সমিরন
উপড়িয়া পড়িল কদলি॥
নাসিকাত খর শ্বাস সিথিল হৈ গেল বাস
ধরনীত লোটয় চিকুর।
নয়ন নিরে অঞ্জন ভিজিলেক ভ্রূদল
কুচের কুঙ্কুম হৈল দূর॥
রূক্মিনীর দেখি গতি ডরাল্য মথুরাপতি
মরে জানি সঙ্কা হৈল মনে।
শেমরসিংহ কুমর আজ্ঞা পরমানে তার
কৃষ্ণকেলি পিতাম্বরে ভনে॥"

অতঃপর কৃষ্ণ—

"কেন প্রিআ কান্দ অকারণে।
পরিহাস বোলো বানি সুন হের সুবেধনী
তাতে দুঃখ কর নিজ মনে॥
মুরূছিত রূক্মিনী দেখিআ সারঙ্গ পানি
খাট হৈতে নাম্বি ঝাম্প দিআ।
চারি হাতে আলিঙ্গিআ কোলে নিলেক তুলিআ
মুখানি ধোআল জল দিআ॥
গায়ের বসন কাঢ়ি চিকুরের ধুলাঝাড়ি
আপনে বান্দিল নারায়ণে।
কাজল দিল নয়নে কুচ জুগত আপনে
বিভূষিত এ গন্ধ চন্দনে॥

তুমী মোর জীবধন সংসার সার রতন
তুমী মোর প্রাণের ঈশ্বরী॥
তব সনে বিঘটন সত্যে মোর হেন মোন
তিল এক রহে জুগচারি।
মার্য্যি প্রিয়ার বদন মধুময় সুবচন
হাঁসি হাঁসি বোলে নারায়নে॥
কুমার শেমর সিংহ হরীপাদপদ্মভৃঙ্গ
কৃষ্ণকেলি পিতাম্বর ভনে॥"

রুক্মিণীর প্রতি এই সস্নেহ কৌতুক আর তারপর সুগভীর উৎকণ্ঠায় রুক্মিণীর পরিচর্যারত কৃষ্ণ কোথায় যেন বৈষ্ণব পদাবলীর কৃষ্ণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। রুক্মিণীর সেবারত কৃষ্ণ একীভূত হয়ে যান শ্রীরাধার উৎকণ্ঠিত প্রেমিক কৃষ্ণের সঙ্গে। কাব্যপাঠের সমাপ্তিতে তাই থাকে এক অননুভূত আনন্দবোধ যা পাঠকের পরম প্রাপ্তি।

দ্বিজ হৃদানন্দ রচিত 'চৈতন্যচরিত'—পুথি নং-৫০, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার

চৈতন্য চরিতকাব্য হিসাবে যে পুথিখানি কোচবিহার রাজদরবারের সংগ্রহশালায় সংগৃহীত ছিল তার রচয়িতা দ্বিজ হৃদানন্দ। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে প্রস্তুত কোচবিহার রাজদরবারে সংগৃহীত পুথির তালিকা প্রস্তুত করতে গিয়ে ড. শশীভূষণ দাশগুপ্ত অনুমান করেছেন পুথিটি দেড়শ বছরের পুরনো। ১৬"/৪" আকারের পুথিখানি বর্তমানে কোচবিহার রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে পুথি নং ৫০ হিসাবে সংরক্ষিত।[৪] হৃদানন্দ রচিত "চৈতন্য জীবনী" গ্রন্থটি জীর্ণ, কীটদষ্ট, ফলে রচয়িতা বা রচনাকাল সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু জীর্ণ খণ্ডিত পাতাগুলিতে যে কাব্যসম্পদ লুকিয়ে আছে তা অতুলনীয়। সর্বোপরি শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের 'একশরণ নামধর্ম' প্রভাবিত কামতাপুর রাজসভায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ধারক ও বাহক শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী রচনার প্রয়াস রাজশক্তির ধর্মীয় উদারতা ও সহনশীলতার পরিচায়ক।

দ্বিজ হৃদানন্দের কাব্যে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন ও বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের বিষয়ে যতটা তথ্যাদি সন্নিবিষ্ট তার চেয়ে বেশি যত্নশীল ছিলেন তিনি শ্রী চৈতন্যের ঐশ্বর্য প্রকাশে। নিমাইকে শ্রী বিষ্ণুর অবতার হিসাবেই তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন তাঁর কাব্যে। এ বিষয়ে অনেকটা তাঁর কাব্য বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবতের সমধর্মী। অন্যান্য চৈতন্য জীবনীকাব্যের মত কাব্যের সূচনায় "শ্রী শ্রী চৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ" বলে কাব্য আরম্ভ করা হয়েছে। কাব্যের সূচনায় শ্রী চৈতন্যদেবের মর্ত্যধামে আগমনের কারণ বর্ণিত হয়েছে—

"কহিব সে সব কথা শোন দিয়া মন।
জেরূপে সচির গর্ব্বে জন্মিলা নারায়ণ॥
ব্রহ্মা লোকে বৈসে ব্রহ্মা সঙ্গে দেবগণ।
আনন্দিত সবর্বলোক ব্রহ্মার....॥
...জতে চাইর বেদ থাকে সবের্বক্ষণ।
সরির হইয়া থাকে ব্রহ্মার গোচরে॥
জত্নে....রাগ বিষ্ণুর ভুবনে।
মূর্ত্তিমন্ত হইয়া কাঁদে ব্রহ্মার সদনে॥

হাতে বিনা দেব দেবি সরস্বতি।
অতিশয় মঙ্গলগিত মধুর ভারথি॥
মহিত হৈলা প্রভু দেব পষুপতি।
ভক্তিরসে আনন্দিত হইা প্রজাপতি॥
পরম রসে সে আছে দেব পারিষাদ।
হেনকালে উপস্থিত হইলা নারদ॥
নারদ দেখি ব্রহ্মা হৈল্বাচ্ছসিত।
সকল দেবতা রিসি হইলা আনন্দীত॥
কহ কহ মুনিবর কহত কারণ।
কি ভএ কোন রসে আছে আমার এ তিনি ভুবন॥
সুনিঞা নারদমুণি কহিলা সকল।
স্বর্গোলোকের বাত্রা আগে জানাইলা...সন॥
পাতালের বার্ত্রা সব কহে মুনিবর।
সুনিঞা আনন্দীত ব্রহ্মা পাইলা বিস্তর॥
ব্রহ্মা বোলে মুনিবর কহত কারণ।
প্রিথিবিতে নরলোক আছে বা কেমন॥
নারদ কহেন ব্রহ্মা কহিতে না পারি।
প্রীথিবীতে.....অধিকারি॥
প্রীথিবিতে মনতুমী দেহ প্রজাপতি।
কলির প্রভাবে লোক জাত্র য়ধগতি।
আপনি শ্রীজিলা শ্রীষ্ঠি য়নেক জত্নে।
য়ধগতি জাত্র লোক দেখিবা কেমনে।
জ্ঞানবোধ নহি লোকের দয়া য়াদর॥
কলির প্রভাবে লোক বড়ই কাতর।
পরধন হরে সিস্য গুরু নাহি মানে॥
নষ্ট হৈল লোক (নব) কলির অধিকারে॥
লোকের চরিত্র দেখি পাই বড় ভএ।
সবর্বক্ষণ মিথ্যা বিম্ব সত্য নাহি কয়ে॥
অপকম্ম করে লোক না করে তরাস।
সাধুজন দেখিয়া নরে করে উপহাস॥
পরহিংসা পরনিন্দা করে পরদার।
পরধন নিতেবিম্ব চিন্তা নাহিয়ার॥
গুরুগর্ব্বিত জন কিছু নাহি মানে।
অপকম্ম তুষ্ট হইয়া ভ্রমে রাত্রিদিনে॥”

অতঃপর ব্রহ্মাকর্তৃক প্রতিবিধানের আশ্বাস, বিষ্ণুপুরে দেবগণের গমন এবং বিষ্ণুর স্তুতি, অতঃপর বিষ্ণুর প্রতিবিধানের আশ্বাস। এরপর কবির বর্ণনা—

"বিষ্ণু বোলে সুন লক্ষ্মি তুমী আমার বচন।
প্রীথিবিতে জন্মিবার করহ গমন॥
একদ্ধংসে পুরুষ হবা আর অদ্ধংসে নারি।
দুই অংশে লভিব জন্ম সুনহ সুন্দরি॥
পূর্বজন্মে করিল সচি অনেক কামানা।
আমি পুত্র হই তার মনের কামানা॥
প্রীথিবি মজিল সব কলির অধিকারে।
তার লাগি জন্মি গিআ সচির ওদোরে।
চল চল দেবগণ চলহ সকলে।
জন্ম লই বৈষ্ণবরূপে প্রীথিবি মণ্ডলে॥
আমি পুত্র হইবো গিয়া সচির ওদোরে।
কামনা করিয়াছে সচি গঙ্গাতীরে॥
প্রভু বচনে ভক্তি রসময়নার।
দ্বিজদৃদানন্দে কহে গৌর অবতার॥
দেবগণ পটাইয়া দিলা লক্ষ্মীপর্ত্তি।
জন্ম লভিতে প্রভু গেলা সিঘ্রগতি॥
সচির গর্ব্বতে গিয়া জন্মিলা নারায়ণ।
পুত্রমুখ দেখে সচি হরষিত মন॥"

অতঃপর শিশু নিমাই এর বাল্যলীলা বর্ণনা। যদিও কাহিনীর সূচনা থেকেই কবি নিমাইএর ভাগবত্তা প্রচারে উৎসুক, ফলে দ্রুতই সদ্যকৈশোরে পৌঁছে যান কবি—

"কতদিন তবে প্রভু চিন্তে মনে মনে।
ব্রহ্মা নিবেদন কৈল বৈকুণ্ঠ ভবনে॥
কলি পরাভব হরোদিবে জন্মিয়াছি সংসারে।
পরাজয় করিব কলিক কিকি প্রকারে॥
নবদিপে আছে প্রভু কেহ এ না জানে।
বিভা করি কতদিন আছে নীজ ঘরে॥
নিরবধি থাকে প্রভু নম্বদার তিরে।
... ...
নয়ানের প্রেম জেন করে টলবল।
সুমেরু শিখর ধারা বহে জেন জল॥
এহিমতে বারে নীত্যে প্রেমের আরম্ভ।
....

নিমাই এর ঈশ্বরীয় রূপ প্রকাশে কবি এক বিচিত্র ঘটনার সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন কাব্যে। তাহল কলির নিমাই এর কাছে আগমন এবং তাঁকে রীতিমত অনুরোধ করেন বৈকুণ্ঠে ফিরে যেতে যাতে কলির সর্বগ্রাসী বিনষ্টি অবাধে চলতে পারে। কবির ভাষায়—

"দণ্ডবত কৈল কলি দেখি নারায়ণে।
জোরহস্তে মিনত্তি করে ধরিয়া চরণে॥
চারিজুগের সৃষ্টি প্রভু করিয়াপণে।
গোলোক—কীয়া তুমি য়াইলা কি কারণ॥
কতে কলিক ধন্ম তোমাতে বিদিত।
সংসার হইল প্রভু পুর্নু বিরাজিত॥
পাপ সঞ্চারে জিব পুর্নু নাহি করে।
আপনার পাপ জিব আপনে সঞ্চারে॥
....
স্ত্রি হইআ বিসপানে মারিবেক পতি।
গুরুপত্নি রাজপত্নি হরিবে ব্রাম্মাণে॥
গুরু হয়া সিস্য করিবে লণ্ডভণ্ড।
রাজা হআ প্রজাক করে মিছা দণ্ড॥
ব্রাম্মাণে দস্যোঁর বৃঁদ্ধি করিবে সদত্র।
ব্রম্মচারি জবনে আচারে মন॥
এইসব হবে প্রভু কলির বিচার।
তে কারণে কলি নাম থুইয়াছে আমার॥
এখনে পরিত্রাণ করি অবধান।
হৈল বৈষ্ণব সকল সংসার॥
জথা জাই তথা সুনি তোমার বিচার।
সংসারে করি নস্বর মায়া অধিকার॥
জথাত্র তোমার হৃর্ত্তি তোমার হরণ।
সেসব স্থানেতে নাহি মোর গমন॥
যে করে তোমার পূজা তোমাতে ভকতি।
জাইতে সে সব স্থানে কি মোর সকতি॥
....
প্রিথিবি ছাড়িয়া কর বৈকণ্টে গমন॥
কুপিত হইয়া বোলে প্রভু বোলখানি।
সুন সুন এক কথা পাপিষ্ঠ কলি॥
বৈকুণ্ঠ থাকিয়ামি জানিলাম সকল।
তোমার অধিকারে লোক পাপেতে বিকল।।
কারণে আসি আমিত আপনে।

তোমার বিস এ দূর করিবার তরে।।
পাপতে বিকল লোক হয়িল লণ্ডভণ্ড।
ভালমতে তোমার করিব জমদণ্ড।।

কলির সঙ্গে বিবাদ প্রসঙ্গে নিমাই-এর কঠিন মূর্তিটি প্রকাশিত, সে রূপ পরবর্তীকালে সংকীর্তনে নেতৃত্ব ও কাজী দলন প্রসঙ্গে মধ্যযুগের বাংলা দেখেছে।

চৈতন্যদেবের আবিভার্বের প্রস্তুতিপর্বেই কবি তাঁকে অবতাররূপে প্রতিষ্ঠা করার পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। স্বভাবতই তা করতে গিয়ে কবিকে নিমাই পণ্ডিতের জীবনে বেশ কিছু অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ ঘটাতে হয়েছে। এমনই একটি ঘটনার অবতারণ করেছেন কবি কেশব ভারতীর আশ্রমে। কোন কারণবশত ক্রুদ্ধ নিমাই (তখনও দীক্ষা হয়নি) গাছের ছায়ার বিশ্রাম করছিলেন। আশ্রমের অন্য সন্ন্যাসীরা পুজোয় বসলে তাঁর দিব্যমূর্তি ঘটের উপর প্রকাশিত দেখেন—

মৃগচর্ম্ম পরিয়া হইয়াছে দ্বিজবর।
সেহিমূর্তি দেখে সব ঘটের উপর॥
ক্রোধ করিয়া প্রভু সুইয়াছে তরুতলে।
সেইরূপে সেহিমূর্তি দেখিল সকলে॥
পূর্ণু সনাতন প্রভু গোলোকলিবাসী।
সেই প্রভু আসিয়াছে হৈতে সন্ন্যাসি॥
দেখিয়া সন্ন্যাসিগণের হৈল তরাস।
বিস্মএ সকল লোক কেহ না করে প্রকাস॥
নাহি অর্ণ্যভাব মনে কেসব ভারতি।
সকলের প্রধান সেহি অতি সুদ্ধমতি॥
সকল সন্ন্যাস্যি বলে সুনহ ভারতি।
কহিব স্বরূপ কথা সুন সুদ্ধমতি॥
সর্ন্ন্যাস করিতে যে য়াসিয়াছে দিজবর।
সেহিমূর্ত্তি দেখো জেন ঘটের উপর॥
যথা ভাবি তথা দেখি বাহির অন্তর।
মৃগচর্ম্মে বসিয়াছে পুর্নু সোসধর॥
একভক্তি হইয়া সন্ন্যাসি সকল।
প্রভু দেখিবারে জায় সেই তরুতল॥
বৃক্ষবেরি চারপাশে জতেক সর্ন্ন্যাসি।
জয় জয় সঙ্গ দিয়া প্রবেসিদ্ধারাসি॥
প্রণমিঞা ভক্তিভরে স্তুতিয়তিসয়।
অপরাধ ক্ষম প্রভু করিলাম বিনয়॥
মাআপাসে বন্দ প্রভু চীনিতে না পারি।
ক্ষেমো ক্ষেমো অপরাধ বোলে দণ্ডধারি॥”

অতঃপর কেশবভারতীর দীক্ষাদান প্রসঙ্গ—

"উস্থাস্বরে স্তুতি করে কেশব ভারথি।
নমো নমো নারায়ণ তুমি লক্ষিপতি॥
তর্ত্ত না জানিঞা বলিয়াছোঁ...।
অপরাধ চরণ কমলে করোদ্ধার॥
ভারথির স্তুতি প্রভু দেখিয়া সার্ক্ষাতে।
স্বমক্ষে দাঁড়াইলা করিয়া জোর হর্ত্তে॥
কেসব ভারথি বোলে সুন মোহাসত্র।
কহিব সর্ন্নাস মন্ত্র না করিবা ভএ॥
জেমতদুচিত বীধি কহিবে কারণ।
তপজপ অদ্ধনাম ধবনি সাধন॥
হেনকালে দেববানি হইল আকাসে।
হইলা চৈত্যন্ন নাম মনের অভিলাসে॥
ভক্তি এ চৈত্তন্ন নাম ভাবে দেবগণ।
তে কারণে পরিত্রাণ এ তিনি ভুবন।
কহিলা সর্ন্নাস্যমন্ত্র কেসব ভারথি।
ধরিয়া সর্ন্নাসিবর আছে লক্ষিপতি॥"
....

বাসুদেব সার্বভৌমের সঙ্গে চৈতন্যদেবের বিচার পর্বটিও কবি অলৌকিকতার আবরণে আড়াল করেছেন—

"নিজগণ সঙ্গে প্রভু করিয়া জুগতি।
সার্বভৌম আশ্রমে প্রভু গেলা সিগ্রতি॥"

অতঃপর সার্বভৌমের সঙেগ সাক্ষাৎ, সাত দিন ধরে নানা শাস্ত্রের আলোচনা ও বিচার এবং শেষে বাসুদেব সার্বভৌমের শ্রী চৈতন্যদেবের কাছে নতিস্বীকার ও চৈতন্যদেবকে স্বয়ং ঈশ্বর ঘোষণার মধ্যে দিয়ে এই অংশের পরিসমাপ্তি—

"ছারিয়া সর্ন্নাসির বেস কপট বর্জিত।
চতুর্ভূজ মূর্তি ধরি হইলা উপস্থিত॥
সঙ্ক চক্র গদা পদ্ম মকর কুণ্ডল।
প্রকাশিত মুখ যেন চন্দ্রমা মণ্ডল॥
নবজলধরপিত বস্ত্র পরিধান।
নপুর কেঞুর হার বলআ কঙ্কণ॥"

অতঃপর এই দেবমূর্তি কর্তৃক সার্বভৌমকে আশ্বাস প্রদান ও আশীর্বাদদানের মধ্য দিয়ে এই পর্বের সমাপ্তি। কবি হৃদানন্দের কাব্যে চৈতন্যদেবের চরিত্র অলৌকিকতার মণ্ডিত, ফলে বাস্তবতা ক্ষুণ্ণ হয় নিঃসন্দেহে। কিন্তু কাব্যটির সুখপাঠ্য অনুভূতি ক্ষুণ্ণ হয় না। কাহিনীর গতি সাবলীল, যদিও জীর্ণতার জন্য স্থানে স্থানে পুথিটি পড়ার উপযুক্ত ছিল না। কিন্তু কাব্যে শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্রে অলৌকিকত্ব আরোপ করলেও মাটির বুকে বেড়ে ওঠা

সাধারণ মানুষের জীবন, তাদের আনন্দ-বেদনাকে কবি ফুটিয়ে তুলেছেন সাবলীল নিপুণতায়। সংসারের অবশিষ্ট বন্ধন কনিষ্ঠ পুত্র নিমাইও যখন সন্ন্যাস নেন তখন শচীমাতার হাহাকার কবির লেখনীতে ফুটে উঠেছে এভাবেই—

"কান্দিতে লাগিলা সচি ভূমিত লোটএ আ॥
দেজ রিদানন্দেক কহে কৃষ্ণর বচনে।
বলিব নাগরি কিছু সচির ক্রন্দনে॥
... ...
খানিক এথাত্র বৈসু বাছারে নিমাঞি।
মরূক অভাগিনি মা ও তোরে তুমি জাছ ছারি॥
কাট বৃক্ষ ভূমে পড়ে অস্বমিতে।
তেমনি অস্থির সচির বচনে॥
তর্ত্তক্ষণের পরে চৈতন্য পাইআ।
নিমাঞি নিমাঞি বলিয়া কান্দিআ কান্দিআ॥
সন্ন্যাসি হইআ জাও দেস ভ্রমিবারে।
এসব বুদ্ধি বাছা কে দিল তোমারে॥
....
খেদে কান্দেন শচী আউলাইআ কেষ।
মোর প্রাণ লইআ নিমাঞি জাও কোন দেষ॥
বাছিআ করাইলা বিভা চন্দ্রবদনি।
হেন বধূ ঘরে মোর হৈলা অনাথিনী॥
একপুত্রর মাআ আমি জানে সর্বজন।
তাহাতে এমত কন্ধ কৈলা কি কারণ॥
তোমার গুণত জসে সবর্বলোকে বোলে।
তিলেক না দেখি প্রাণ না রহে আমারে॥
তুমি ধন তুমি প্রাণ তুমি সে সম্পদ।
তোমার বিস্থেদে বাপ প্রাণে সেহি বধ॥
করণো করিআ কান্দে পাএ আরও তাপ।
দ্বিজ রিদানন্দে বোলে সচির বিলাপ॥
....
না কান্দ না কান্দ সচি সুনহবচন।
নীমাঞি মুনিস্য নহে প্রভু নারায়ণ॥
পূর্বজন্ম তোমার কামানার ফলে।
পুত্ররূপে জন্মিয়াছে.....॥
এতদিনে লোকপটে আছিল তোমার ঘরে।
অখনি প্রচার প্রভু করিব সংসারে॥
নীমাঞি তোমার নহে নীস্বএ কারণ।

কৃষ্ণ ২ করি দুস্ক কর নীবারণ॥
সফেলো সরিল তোমার সফেলো বসতি।
শ্রীকৃষ্ণ চৈর্থন্ন তোমার সন্তথি॥
সাফল জন্ম তো হইয়াছে সংসারে।
আপনে জন্মিয়াছে হরি তোমার ওদোরে॥
অজধ্যায় কৌশল্যারূপে কান্দিয়াছ তুমি।
চৌদ্ব বৎসর তাথে রাম ছিল বোনবাসে॥
দৈব্যঁকি রূপেতে দুষ্ক পাইলা বিস্তর।
কান্দিলা কৃষ্ণক লাগিয়া কংসের পোঁতাঘর॥"

নিমাই পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার বেদনাও বিস্মৃত হন নি কবি। শচীমাতার বিলাপে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রসঙ্গ এনে আমরা কাঁদতে দেখি শচীকে। আবার বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপ প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন—

"কান্দে লক্ষি বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর বিলাপে।
বিচ্ছেদে বেকল সোক কান্দে দুষ্ক তাপে॥
চিকুর করবি ভাল এঞা নাইগ শোকে।
লক্ষির করুণা সুনি কান্দে সবর্বলোকে॥
দ্বিজ রিদানন্দ কহে কৃষ্ণর পদতলে।
লক্ষির করুণা সুনি কান্দে সবর্বলোকে।।
কান্দে কান্দে লক্ষিদেবি হইয়া সোকমতি।
কি দোসে ছাড়িয়া মোরে গেলাপ্রাণপতি॥
মুক্তকেশে ধাত্র আর প্রভুর ঘরণি।
ভূমে লোটাইল জেন সোনার পুত্তলী॥
তোমার.....প্রাণ ধরাইতে নারি।
বিষ খাইয়া মরিব কিবা হইব দেসান্তরি॥"

শ্রী চৈতন্যদেব প্রবর্তিত নামধর্মের প্রসঙ্গে কবি বলেছেন—

"হরেকৃষ্ণ মোহামন্ত্র চারিবেদের সার।
যজ্ঞ ভোমে তপয়াদি সম নহে তার॥"

এভাবেই দ্বিজ হৃদানন্দ গৌড় বাংলার বৈষ্ণব রসধারা প্রবাহিত করাতে পেরেছিলেন বহুদূরবর্তী কামতাপুর অঞ্চলে, যা শঙ্করদেব প্রবর্তিত একশরণ নামধর্মে আদ্যন্ত মজেছিল। দ্বিজ হৃদানন্দ এবং এমনই আরও কিছু কবি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও রাধাতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন সমাজ জীবনে এবং এখনও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গান বা কীর্তনের আসরে রাধামাধব কেন্দ্রিক পদ শোনা যায়। কাহিনী পরিকল্পনার অলৌকিকত্বের অতিরেক রচনাটিকে ক্লান্ত করতে পারত, কিন্তু করেনি তার কারণ কবির রচনার একাধারে শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়ার মানুষী বেদনার মর্মস্পর্শী রূপায়ণ, অন্যদিকে কাব্যশরীরে কবির অলংকার সমাবেশের স্বকীয়তা। বাসুদেব সার্বভৌমের সঙ্গে আলোচনার পর পর দিব্যভাবগত শ্রীচেতন্যের বর্ণনায়—

"চান্দ চন্দনের ফোটা চন্দনের উপর।
নীসির তিমিরে জেন জিনি সোসধর॥"

অথবা করুণাঘন শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেশ বর্ণনায়—

"নএণানের প্রেম জেন করে টলবল।
সুমেরু শিখার ধারা বহে জেন জল॥"

অথবা—

"নএণানের জল বহে সুরধুনি তরঙ্গ॥"

দ্বিজ হৃদানন্দের কাব্যের রচনাকাল বা পৃষ্ঠপোষক রাজার সম্বন্ধে কোন বিস্তারিত বা সংক্ষিপ্ত তত্ত্ব পাওয়া যায় না। তবে বলভদ্র পণ্ডিত প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

"ক্রেপার সাগর বলভদ্র সুপণ্ডিত।
লিলায় করিলা ক্রেপা হইয়া রখণ্ডিত॥
পরম জন্য লোক নবদ্বীপে ধর্ম্ম।
প্রসাদ করিলা জথা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ন॥"

এ প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপাধন্য বলভদ্র পণ্ডিতের কথা স্মরণ হয় যিনি চৈতন্য চরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে শ্রীচৈতন্যদেবের তীর্থ ভ্রমণ সঙ্গী—

"বলভদ্রাচার্য আর পণ্ডিত দামোদর।
দুইজন সঙ্গে প্রভু আইলা নীলাচল॥"

এই বলভদ্র পণ্ডিতের প্রসঙ্গে বলা যায়, বৃদ্ধ বয়সে তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েও যদি দ্বিজ হৃদানন্দ কাব্য রচনাকরেন, তবে মূল রচনা ষোড়শ শতাব্দীর অপরাধ হওয়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু সময়কাল সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া না গেলেও কবির ভক্তিনম্র পাণ্ডিত্য আর পরম মমত্ববোধ কাব্যটিকে এক অন্য মাত্রায় উন্নীত করেছে তা পাঠক মাত্রের কাছেই অনস্বীকার্য।

মাধবচন্দ্র শর্ম্মা বিরচিত বিষ্ণুপুরাণ পুথি নং ২১, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার

পরবর্তী আলোচ্য পুথিটি কোচবিহারের মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের সভাকবি মাধবচন্দ্র শর্ম্মা বিরচিত বিষ্ণুপুরাণ। বর্তমানে পুথিটি (পুথি নং-২১) উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের পুথিশালায় সংরক্ষিত। ভণিতায় কবি পৃষ্ঠপোষক রাজা হিসাবে মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন। বস্তুত মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকাল কোচবিহার রাজসভাশ্রিত সাহিত্যের সুবর্ণযুগ, কারণ সুকবি ও সুলেখক রাজা নিজেও বহু গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। তাঁর রাজসভায় নিয়মিত সাহিত্যচর্চা হত, শাক্ত-বৈষ্ণব-স্মার্ত পণ্ডিতদের নানা রচনায় এই সময়ের রাজদরবারের সাহিত্যচর্চা ছিল শীর্ষস্পর্শী। আলোচ্য "বিষ্ণুপুরাণ" (পুথি নং-২১) পুথিটি আকারে ২০˝×৫১/২˝, মূলত একজন লিপিকরের হস্তাক্ষরই পাওয়া যায়, পুথিটি অত্যন্ত ভাল অবস্থায় ছিল, জীর্ণতা বা অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির কারণে অপাঠযোগ্য হয়ে পড়েনি।[৫] যদিও কাল নির্দেশক উক্তি পাওয়া যায় নি। কাহিনী বর্ণনায় পারম্পর্যের অভাব চোখে

পড়ে, কিন্তু কবির বর্ণনাভঙ্গী অত্যন্ত সরস, পাপতাপে জরাজীর্ণ সাধারণ মানুষের প্রতি কবির গভীর মমত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায় কাব্যে। কাজের সূচনায় ভগবান বিষ্ণুর মাহাত্ম্যবর্ণন প্রসঙ্গে ধ্রুবর সাধনা ও ভগবান বিষ্ণুর কৃপার বিবরণ বর্ণিত—

"নৃপসুত শিশু অতি ভয় দরশায় ততি
নাদ করে নিশাচরগণ॥
আর শিবা সকলের অট্টহাস আরাবের
মহাশঙ্কে লঙ্ঘি নগগণ॥
গোবিন্দ চরণাসক্ত অনন্য মানস ভক্ত
সে যোগি বসে ভয়ংকর।
নিশাচরগণ আর সে সকল চমৎকার
না হইল ইন্দ্রিয় গোচর॥
সতত একাগ্র মন আত্মাতে শ্রী নারায়ণ
আছেন এমত জ্ঞান করি।
হরিতে মনের ক্লেশ হরিতে করি অশেষ
ধারণা অপরধ্যান ধরি॥
অনন্ত এ মায়াচয় যদ্যপি হইল ক্ষয়
তবে দেবগণ সমুদায়।
তপভঙ্গ করিবার না পারিয়া আর তার
ভয়ার্ত্ত হইল পুনরায়॥
ধ্রুব হইতে পরাভব আশঙ্কাত দেবসব
কম্পমান হয়া কলেবর।
পরামর্শ করি পরে পুরন্দর সহকারে
বৈকুণ্ঠে চলিল নিরন্দর॥
ত্রিভুবন নাথ হরি তার কাছে তরাতরি
নিবেদিল যত বিবরণ।
অনাদি নিধন স্বামি শরীরীর অন্তর্যামি
রক্ষা কর দানব সূদন॥
দেব দেব জগন্নাথ তুমি জগতের তাত
পুরুষের উত্তম পরেশ।
অদ্ভুত জগতাহত জগজন হৃদিস্থিত
গোলোকেশ দেবহৃষিকেশ॥
ধ্রুবের দারুণ তপে তপ্ত হইয়া সেহিতাপে
তোমার চরণে দেবগণ।
ইন্দ্র চন্দ্র আদি করি অধিকার পরিহরি
আশি সবে পশিহিল বন॥

দিনে দিনে জে প্রকার বৃদ্ধি হয় চন্দ্রমার
সেহিমত ধ্রুবের তপস।
বৃদ্ধি পাইতেছে জান দেবদেব ভগবান
সেহি ভয়ে কম্পিত ত্রিদশ॥
উত্তানপাদের সুত তপ অতি অদভুত
আচরণ করিয়াছে জান।
তপ হৈতে নিবর্ত্তন কর তাকে নারায়ণ
আমার দিগেক কর ত্রাণ॥"

অতঃপর বিষ্ণুর কাছে সাহায্য চাইতে আসা দেবতারা নিজের ভয়ের স্বরূপটি প্রকাশ করে ফেললেন—

"না জানি মনের তার বাসনা বা কি প্রকার
ইন্দ্রত্ব সূর্যত্ব কিবা হয়।
ধন কিবা... বাসনা করেন এহি
আমার দিগের মনে হয়॥"

দেবতারা অন্তর্যামী হতে পারেন, কিন্তু কবির কাব্যে তাঁরা নেহাতই কিছু উচ্চপদাধিকারী যাঁরা মানবশিশুর কাছে সূর্যত্ব, ইন্দ্রত্ব হারানোর ভয়ে কাতর, এবং যে কোন মূল্যে তাঁরা নিজেদের গদি অটুট রাখতে চান। ভগবান বিষ্ণু তাঁদের আশ্বস্ত করেন—

"ইন্দ্রপদ নাহি মাগে সেহি শিশু মহাভাগে
এহি সত্য বচন আমার॥
সূর্ঝত্ব না করে মনে আর অন্যপদগণে
নাহি তার মনের বাসনা।
যে তাহার মনোরথ শুনহে দেবতাযত
অন্যে নাহি জানে আমি বিনা॥"

অতঃপর শ্রীবিষ্ণু ধ্রুবকে দর্শন দেন ও বর প্রার্থনা করতে বলেন—

"দেখ মম মহামূর্ত্তি তুমি অতি পুণ্যকীর্ত্তি
গ্রহণ করহ ইষ্টবর॥"

বালক ধ্রুব বর প্রার্থনা করে বলেন—

"ধ্রুব বলে ভগবান সবর্বপূত হৃদিস্থান
নিবাস তোমার দেবেশ্বর॥
যেহি বর চাহি আমি তাহা কি না জান স্বামি
তুমি অন্তর্যামী দামোদর॥
তথাপি দেবের স্বামি জেহি ইচ্ছা করি আমি
প্রার্থনা তোমাত তাহা করি॥
তোমার শরণাগত দেবগণ কত কত

আছেন দিক্‌পাল নামধরি॥
ইন্দ্র অগ্নি আদি করি দিশগণ অধিকারি
হইয়াছে তোমার কৃপায়।
উত্তম অক্ষয় স্থান কৃপা করি ভগবান
এহি বর দিবেন আমায়॥
ভগবান বলে বাণী তব বাঞ্ছা আমি জানি
পূর্ব্বজন্মে তুমি অতিশয়।
তপশ্চা করিয়া বনে তোষিয়াছ অনুক্ষণে
ব্রাহ্মণ আছিলা তেজোময়॥
তারপর কালবষে শরীর ছাড়িয়া শেষে
উত্তানপাদের সুত হয়া।
স্বাক্ষাৎ পাইলা যম তুমি ভক্ত নিরূপম
এই জন্মে তপশ্চা করিয়া॥
আমাকে করিয়া ধ্যান তুষিয়াছ মতিমান
দিব বর বরের প্রধান।
তারাগণের আশ্রয় হয়া তুমি তেজোময়
সকল লোকের উর্দ্ধস্থান॥
সেহি স্থানে ধ্রুবলোক হৈয়া জান পুণ্যশ্লোক
তথাতে জননী সহকার।
রাজ ভোগ আদিকরি অন্তকালে তরাতরি
যাবা বতস না জন্মিবা আর॥”

ধ্রুবের তপস্যাকালে যে জননী একাকিনী চোখের জল ফেলেছেন, নারায়ণের বরদানকালে তার কথাও ভোলেন নি কবি। তাই ধ্রুবের সঙ্গেই তার জননীর কথাও উচ্চারিত হয়েছে কবির কাব্যে। মূলত ধ্রুব উপাখ্যানই গুরুত্ব সহকারে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া মনু ও মন্বন্তরের উৎস বর্ণনা করেছেন কবি, বর্ণনা করেছেন অত্যাচারী রাজা বেনের অত্যাচার ও আত্মম্ভরিতার কাহিনী—

“রাজ্যে অভিষেক তাক ঋষিসমুদায়॥
করিল যখন সেহিকালে সেহি বেনে।
এহিমত আজ্ঞা করিলেন সবর্বজনে॥
যজ্ঞ না করিবে দান না করিবে আর।
হোম না করিবে কেহ নির্দেশে আমার॥
যজ্ঞ ভাগ ভোক্তা আমি আমা হৈতে আর।
অন্য কেহ নাহি এহি জানিবেন সার॥”

মুনিঋষিরা একজোট হয়ে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন—

“এমত বচন তার শুনি মুনিগণ।
নৃপতিক সম্বোধিয়া বলিছে তখন॥

ঋষিগণ বলে প্রজা সকলের হিত।
জেহি তাহা এবে শুন বলিব কিঞ্চিত॥
সকলে মিলিয়া এহি মহাঋষিগণ।
তোমার—শনে দেবদেব নারায়ণ॥
পূজা করিবার ইচ্ছা করিয়াছি মনে।
তাহাতে কিরূপ আজ্ঞা করেন আপনে॥
জার রাজ্যে দেব হরি হইলা পূজিত।
বিদূর হইল তার মনের দূষিত॥
জাহার পুরীত আর পূজা পায় হরি।
সেহি ভাগ্যবন্তজন মনুজ কেশরী॥"

বেন রাজার প্রসঙ্গের পরে ধ্রুবের পূর্বপুরুষের বিবরণ বর্ণিত, এরপর সগর রাজা ও মহামতি ঔবর্বর কথোপকথন বর্ণিত, যেখানে ঔর্ব্ব বর্ণনা করছেন যথার্থ গৃহধর্মপালন কেমন করে সম্ভব—

"গৃহস্থের আর জেহি সদাচার
তাহার জেহি লক্ষণ।
কথা সে সকল কৃপা করি বল
সুনিতে আমার মন॥
ঔর্ব্ব মুনি কয় নৃপ মহাশয়
শুন সাবধান হয়া॥
গৃহী সকলের ধর্ম্ম আশ্রমের
বেদ অভিমত লয়া॥
বলিব সে সবকর অনুভব
গোপনীয় অতিশয়॥
তাহার লক্ষণ করহ শ্রবণ
জেহি সদাচার হয়॥
সদা জেহি আর করেন আচার
সেহি পুণ্যবন্তগণ॥
সাধু কর্ম্ম করি ঈশ্বরেক স্মরি
সাধু হয় অনুক্ষণ॥
তার মত চয় সদাচার হয়
তাহার আচার জেহি।
সিদ্ধ যোগীগণ হয়া একমন
আচরণ করে সেহি॥
গৃহী নরগণ করিয়া যতন
ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উঠীয়া।
ধর্ম্ম সনাতন করিয়া চিন্তন
তদন্তে অর্থ চিন্তিয়া॥

কামেক চিন্তিয়া শুদ্ধ মন হয়া
মোক্ষেক তাহার পর।
উঠি প্রাতঃকালে যোগীন্দ্র সকলে
সন্ধ্যার হবে অন্তর॥
করি আচমন করিয়া ভোজন
দিবাভাগে না শূয়িবে॥
গৃহকর্ম্মজত করিবে তাবত
যাবত সুস্থ রহিবে॥
সন্ধ্যা উপাসন করি বীরগণ
আদিত্যের অস্তকালে॥
হরিক চিন্তিবে অতি শুদ্ধ ভাবে
গৃহস্থ লোক সকলে॥
হরি আরাধিয়া সংসার চিন্তিয়া
থাকিবে প্রহরদ্বয়॥
তার অনন্তর করিবেক নর
শয়নাদি কর্ম্মচয়॥
যেহিকালে নরে গোদোহন করে
শাক্ষাত থাকিবে তথা॥
লয়া অল্পক্ষীর আসিবেক ধীর
গরুক না দিয়া ব্যথা॥
আর যদি তথি মিলেক অতিথি
তাক সেহিক্ষণে লয়া।
আপন মন্দিরে আসিবেক ধীরে
অতিহৃতহৃত্য হয়া॥
আপন মন্দিরে অতিথিক পরে
শক্তিমতে পূজাকরি।
দিবেক আসন করাবে ভোজন
যেহি গৃহধর্ম্ম ধারী॥
তেজিয়া অতিথি যেহি পাপমতি
অন্নেক করে ভক্ষণ॥
পাপগণ সেহি গ্রাস করে দেহী
বেদের এহি বচন॥
বেদ মন্ত্রচয় গোপনীয় হয়
স্নান তর্পণাদি করি।
তার অর্থগণ পদ বিরচন
কিমতে করিতে পারি॥”

বেদ প্রভাবিত, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রভাবিত জীবনধারার যে আবার উজ্জীবন ঘটছিল, রাজ পৃষ্ঠপোষকতায় এই ধরনের কাব্যরচনা হয়তো তার প্রমাণ। এমনকি আলোচ্য কাব্যের পঞ্চদশ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার পোষিত পার লৌকিক ক্রিয়াদি বিষয়ে দীর্ঘ বর্ণনা আছে যা প্রমাণ করে শঙ্করদেবের তিরোভাবের দুশো বছরের মধ্যেই কোচ রাজবংশ স্থিত হয়েছে ব্রাহ্মণ্য স্মার্ত সংস্কারেই, যদিও সাধারণ মানুষের মধ্যে শঙ্করদেবের প্রভাব বর্তমান ছিল। হয়তো রাজপরিবারেও ছিল, তবু কোথাও সমন্বয় প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। পঞ্চদশ অধ্যায় থেকে উদ্ধৃত হল—

"দশ কর্ম্মবিধি উক্ত বেদ মন্ত্রচয়।
তার অর্থগণ পদ করা যুক্ত নয়॥
বেদমন্ত্র অর্থগণ করিলে প্রচার।
বেদের অবজ্ঞা হয় কি বলিব আর॥
প্রেতের ক্রিয়ার কথা সংক্ষেপ করিয়া।
বলিব অখন শুন সাবধান হয়া॥
যখন নরের প্রাণ হয় বিমোচন।
সেহিক্ষণে তার শব লয়া বন্ধুগণ॥
নদীতীরে লয়া তথা করিয়া স্থাপন।
স্নান করাইবে মন্ত্র করিয়া পঠন॥
স্নান অনন্তরে চিতা উপরে তা দিবে।
বেদমন্ত্রগণ দিআ অগ্নিক পূজিবে॥
বিধিমতে অনলেক করিয়া পূজন।
সবেত লাগায়া দিবে সবর্বন্ধুগণ॥
পুত্র পৌত্র যেহি জার থাকে বিদ্যমান।
দাহ করি মৃতদেহ করিবেক স্নান॥
স্নান করি সেহিজলে যত বন্ধুগণ।
যথাবিধি করিবেক প্রেতেক তর্পণ॥
তদন্তরে প্রতিদিন দিবে পিণ্ডগণ।
অশৌচান্ত কার্য এবে করহ শ্রবণ॥"

এরপর যাবতীয় পারলৌকিক ক্রিয়া, মাসিক এবং বাৎসরিক শ্রাদ্ধাদির ব্রাহ্মণ্য বিধির সবিস্তার উল্লেখ আছে। পরবর্তী অধ্যায়টি সম্পূর্ণতই মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের পিতৃবিয়োগ ও পিতৃশ্রাদ্ধ বিষয়ক ঘটনাবলী নিয়ে লেখা। ষোড়শ এবং সপ্তদশ অধ্যায়েও রাজবংশাবলী বিশেষত মহারাজা হরেন্দ্রনাথের বিষয়ে এবং তাঁর পিতৃবিয়োগ ও শ্রাদ্ধাদি বিষয়ক কথাও বারবার এসেছে। কাব্যের শেষাংশ খণ্ডিত, ফলে কাহিনীর শেষাংশ জানা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভণিতায় কবি নিজের বা পৃষ্ঠপোষকের নাম জানান নি—

"ইতি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয় অংশে পদ।
দশম অধ্যায় পূর্ণ হৈল সভাসদ॥"

অথবা—

"ইতি বিষ্ণু পুরাণে তৃতীয় অংশ মানে।
পঞ্চদশ অধ্যায় পিতৃর কথাগণে॥

শিবশিব বল জীব রাম বল আর।
এই নামেক রাখ হৃদয় মাঝার॥"

বস্তুত হরিনামের উল্লেখও বিশেষ পাওয়া যায় না। বিষ্ণুপুরাণের এক জায়গায় পিতা বৈদ্যনাথ, যিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন তাঁর সম্পর্কে সশ্রদ্ধ উক্তি করে কবি লিখেছেন—

"পরম দেবতা পাদপদ্ম পরায়ণ।
দ্বিজ কৃষ্ণমিশ্র অধ্যাপকের নন্দন॥
বৃদ্ধ হৈল বিষয় না জানে অদ্যাবধি।
গোবরাছড়ার বৈদ্যনাথ বিদ্যানিধি॥
তাহার কুমার পুরাণের পদগণ।
শ্রী মাধবচন্দ্রশর্ম্মা করিল বচন॥"

অন্যত্র আবার তিনি বলেছেন—

"ভুবন বিখ্যাত যশ মহিমা বিশাল।
শ্রীল শ্রী হরেন্দ্রনারায়ণ মহীপাল॥"

এভাবেই মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের রাজসভায় সম্মিলন ঘটছিল নব্য বৈষ্ণবধর্মের উদারতার সঙ্গে স্মৃতি-শাস্ত্র-বৈদিক সংস্কারের উত্তরাধিকারের।

জগতসিংহ রচিত গীতগোবিন্দ পুথি নং ৫১, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার

পরবর্তী আলোচ্য পুথিটি উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের পুথিশালায় সংরক্ষিত ৫১নং পুথি, কবি জগতসিংহ রচিত "গীতগোবিন্দ"। ১৪´×৪½/২´ আকার বিশিষ্ট দেশীয় তুলট কাগজে নির্মিত পুথিটি পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লেখা জয়দেব বিরচিত গীত গোবিন্দের বঙ্গানুবাদ[৬], কিন্তু তার চলন ও কবির বাচন ভঙ্গিমা একান্তই কবির নিজস্ব। পয়ার এবং ত্রিপদীর মধ্যে আবদ্ধ থাকায় জয়দেব সৃষ্ট শব্দঝংকার ও ধ্বনি মাধুর্যের বদলে এখানে গ্রামবাংলার মেঠো সুর ও পাঁচালি সুলভ নম্র মাধুর্য সঞ্চারিত। কবির রচনায় তাঁর জীবন পরিচয় বা কোন রাজার পৃষ্ঠপোষণায় তিনি কাব্য রচনা করেছিলেন তাও জানা যায় না। কোচ রাজদরবারের সরাসরি পৃষ্ঠপোষণায় তিনি কাব্য রচনা করেছিলেন এমন প্রমাণও কাব্যে নেই। হয়তো কবি রাজদরবারের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন না। কাব্যবিচারে কবিকে রচনা শক্তির জন্য সাধুবাদ দিতে হয়। কারণ জয়দেবের কাব্যকে আত্মস্থ করে তার ধ্বনিঝঙ্কৃত বিদগ্ধ রূপটিকে বাংলার পল্লীপ্রকৃতির রস রূপের ছাঁচে ঢালাই করা নিঃসন্দেহে কঠিন। কাব্যটিতে কোন পর্বভেদ নেই, কোন অধ্যায় অনুযায়ীও কাব্যটি ভাগ করা নেই। কাব্যের সূচনায় বিষ্ণুর দশাবতার বর্ণনায় কবি বলেন—

"প্রলয় পয়োধিজলে তল যায় বেদ।
মীনরূপে কেশব খণ্ডালে তার খেদ॥
নৌকার চরিত্রে ভাগবত করিলাপার।
জয় জগদীশ হরি নন্দের কুমার॥
কচ্ছপ স্বরূপে দেব দেবলক্ষিপতি।
পৃষ্ঠত ধরিলা বিপুলতর ক্ষিতি॥
ধরণীধরণ কর চক্রের আকার।

জয় জগদীশ হরি নন্দের কুমার॥
পুনরপি গোবিন্দ শূকর রূপ ধরি।
ইঙ্গিতে ধরণী লৈল দশনত করি॥
কলঙ্ক লইয়া যেন শোভা চন্দ্রমার।
জয় জগদীশ হরি নন্দের কুমার॥

মঙ্গলাচরণ দিয়ে কাব্য সূচনা—

"জয় জয় নম জগজিবন মুরারি।
গোবর্দ্ধনধারি গোপিজন প্রিয়কারি॥
কংশ কেসি মথন মোহন বেস জার।
করোক কল্যাণ সেহি দৈবকি কুমার॥
ত্রিভুবন নাথ দেব নমো তৃপুরারি।
ভকতজনার ভবভয় দুঃখহারি॥
অর্দ্ধ অঙ্গ পিতবস্ত্র অর্দ্ধ বাঘছাল।
বনমালা য়র্দ্ধয়ঙ্গে অর্দ্ধমুণ্ডমাল॥
সঙ্খচক্রত্রিসুল ডম্বারু সোভা করে।
অর্দ্ধ চন্দ্র মুকুট মণ্ডিত নিরন্তরে॥
অর্দ্ধয়ঙ্গে কমলা ভবানি য়র্দ্ধয়ঙ্গে।
করোক মঙ্গল হরিহর মহারঙ্গে॥"

অতঃপর গৌরীবন্দনা, লক্ষ্মীবন্দনা, সরস্বতীবন্দনা, ব্যাসবন্দনা, পুরাণবন্দনা, শুকদেব আদি ঋষি বন্দনা, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণববন্দনার পর সরাসরি রাধামাধবের "বিলাসকলা" বর্ণনা করতে বসেছেন কবি। কৃষ্ণ বিরহে খিন্ন রাধার সখি কৃষ্ণের কাছে শ্রীরাধার মনোকষ্টের কথা বলতে এসেছেন—

"সুন্দরবদনে বহে নয়নের জল।
শিশির ধউত যেন প্রফুল্ল কমল॥
কিবা চন্দ্রমাক রাহু গ্রসিয়াছে দান্তে।
অমৃত গলিতে আছে তাহার আঘাতে॥
নবচূতাঙ্কুর হস্তে দিয়া পঞ্চ বান।
মানিনীমোহন বেশ মকরবাহন॥
প্রণাম করহো বলি তোমার চরণে।
পসিলো পবন প্রভু বোলে খনে খনে॥
জেগুনে হএন প্রভু আপনে বিমুখ।
সুধানিধি মলয়জে দহে তার বুক॥
এহিবুঁলি প্রাণসখি....হইয়া।।
কণ্টক বিপিনে কতো বেড়ায় চাহিয়া॥
কষ্ট পায়া শশিমুখী থাকে অধোমুখে।

মন্মথে মনক দহে আপনার সুখে॥
পুনরপি সহচরি বোলে আরবার।
কৃষতনু হৈছে সখি বিরহে তোমার॥
তনে ন্যস্ত করিয়াছে মুকুতার হার।
ধরিতে না পারি তাকো করে পরিহার॥
মলয়চন্দন সখি দিয়া.....।
কালকূট জ্বালাসম মানয় মনত॥
বদন কমলে কতো অস্ফুট বচন।
মৌন হয়া থাকে কতো সঙ্কাযুত মন॥
মলয় পবন জদী সরীরে লাগয়।
মদন অগণি সমদ্ধদয়দহয়॥
সজল নলিনী দলে সকলে দেখিয়া।
পরম দুঃখিতা সখি বলেক কান্দিয়া॥
বিরহ ব্যথিত হয়া রাধিকা তরুণী।
সকামে নিষ্কামে জপে হরি হরি বাণী॥
রোমাঞ্চ শরীর কতো হবয় শীতল।
কম্পিতে আভয় কতো বিরহে বিকল॥"

সখির মুখে রাধার বিরহ বর্ণনা শুনে নন্দনন্দন তাঁর কাছে পৌঁছতে চেয়েছেন দ্রুত—

"গোবিন্দ পদারবিন্দে করি নমস্কার।
জগত সিংহে ভণে গীত গোবিন্দ পয়ার॥
নন্দের নন্দন বৃন্দাবন.....।
সহচরি বাক্যে জেন অমৃত সিঞ্চয়॥
গোবিন্দ বদতী সখি সুনহে সুন্দরি।
তোমার সখির পানে চল সিঘ্রকরি॥
এই নিন্ধ এত মুঞি থাকিবো নিশ্চয়।
মোর বাক্যে সান্ত কর রাধার হৃদয়॥
আনিবা রাধাক তুমি মিনতি বচনে।"

এরপর সখি রাধার কাছে গিয়ে মিষ্টভাষণে রাধাকে তুষ্ট করেন, এবং কৃষ্ণের রাধার প্রতি যে ঔৎসুক্য আজও অম্লান তা ব্যক্ত করেন। উপরন্তু প্রিয়বচনে রাধাকে তুষ্ট করে তিনি বলেন—

"সুনহে সুন্দরি সখি কি কহিব আর।
খেদ করে বনমালী বিরহে তোমার॥
সমীপে রহয় যদি মলয় পবন।
দশগুণে উদভব মদন দহন॥
বিকসিত দেখি অতি কুসুম কানন।
বিরহে বিকল হয় নন্দের নন্দন॥"

কিন্তু অভিমানিণী রাধার অভিমান টলে না, অতএব সখিকেই মধ্যস্থতা করতে হয় কৃষ্ণের কাছে গিয়ে—

"স্মরসরে তাপে রাধা নির্ল্লজ্জ হইয়া।
তব অঙ্গসঙ্গামৃত থাকয় চিন্তিয়া॥
আর সুনিয়োক প্রভু আশ্চর্য্য...।
চন্দন চন্দ্রের রশ্মি সখিক দহয়॥
কন্দর্পের শরে দেহ করিছে বিকল।
দহিতে....কমলিনী দল॥
তাহার চিন্তায় সখি বিকল হইয়া।
ধরণী সরনে থাকে মুরুহিত হয়া॥
পূবর্বকালে তোমার বিরহে বিধুমুখি।
মনসিদ্ধ তাপে দুঃখে না মেলায় আঁখি॥
রসাল চুতের অগ্র করি বিলোকন।
সকতি নাহিক দুঃখে মেলিতে নয়ন॥"

এরপর কুপিত ইন্দ্রের আজ্ঞায় বৃন্দাবনে ভয়াবহ বৃষ্টির বর্ণনা এবং বৃষ্টিতে কাতর ব্রজবাসীর পরিত্রাণার্থে—

"বৃষ্টিত ব্যাকুল হৈছে গোকুলের জন।
দেখিয়া ধরিল হরি গিরি গোবর্ধন॥
সপ্তদিন সপ্তরাহ বরিষিল বারি।
বাম হাতে গোবিন্দে আছিল গিরিধরি॥"

প্রকৃতি শান্ত হলে, বৃন্দাবন পূর্বাবস্থায় ফিরে গেলে রাধিকাকে সখির পুনরায় অনুরোধ—

"রাধিকা তরূণী সুন নিতম্বিনি
বিলম্ব না কর আর।॥
ধীরজে সমিরে যমুনার তিরে
আছয় নন্দ কুমার॥
রতিসুখ আসে মদন আবেসে
পিন্ধি নানা অলঙ্কার॥
সঙ্কেতর স্থানে মদন কাননে
সত্বরে কর সঞ্চার॥
তোর নাম লয়া সঙ্কেত করিয়া
বাজার মোহন বেণু॥
মৃদু মধুস্বরে পরাণ সঞ্চরে
চন্দনে লেপিত তণু॥
তব আগমনে সঙ্কিত নয়নে
সয়ন করিব সখি।

বৃক্ষপত্র নড়ে পক্ষি সব পড়ে
পন্থক থাকে নিরেখি॥
....
হে গৌরিতরুণী সুনহ আপনি
স্বরূপ মোর বচন॥
তোর পয়োধরে মাধব উপরে
করিব অতি শোভন॥
জে বক্ষ স্থানতে আছয় বহিতে
গজমুকুতার হার।
জলদে জেহেন দামিনী শোভন
করিতে আছে বিহার॥"

মানভঞ্জনার্থে সখি আরও বলেন—

"হৈছে অতিশয়মানী নন্দের নন্দন।
চন্দ্রমাবদনি মান করিয়ো ভঞ্জন॥
দেখিয়ো রজনি অবসেস নাহি হয়।
জাইতে দেখিব হেন তেজিও সংসয়॥
হেন জানি প্রাণ সখি মোর বোল ধর।
মধু মথনের পাশে চলিয়ো সত্বর॥"

এরপর রাধা মাধবের সাক্ষাৎ হয়, রাধার লজ্জা উভয়ের মিলনের বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং মাধব অন্য গোপীর কাছে গমন করলে রাধার মান অলঙ্ঘ্য হয়ে দাঁড়ায়। তীব্রভাবে তিনি কৃষ্ণকে বলেন—

"জাগয়ো মাধব জাগয়ো কেশব
না বোল না বোল মোকে॥
কপট বচনে মোহোক আপনে
না তোলো মদন শোকে॥
ধূর্ত্তবাদী তুমি জানিলোহো আমি
কত চতুরতা আর॥
তোমার বচনে মদন দহনে
দগধে প্রাণ আমার॥
পূর্বে যে নাগরী রসের আগরি
হরিল খেদ তোমার।
কমল নয়ন করিয়ো গমন
প্রসন্ন হৈয়োক তার॥"

কিন্তু কোপভরে কৃষ্ণকে বিদায় দিয়ে রাধা অনুতপ্ত হন, এবং

"প্রিয় গোবিন্দক দেখি লজ্জিত বদনে।
সখি মুখ চাহি রৈল কটাক্ষ নয়ণে॥
দিবসের চন্দ্র যেন ন করে প্রসর্ন্ন।
নিশ্বাস মরুত মন নহে সুপ্রসর্ন্ন॥
রাধিকার মুখ হেন মাধবে দেখিয়া।
প্রেমভাবে প্রিয় বাণী বোলয় হাসিয়া॥
কমলবদনি প্রিয়ে তেজিয়োক মান।
স....মদনানলে দহে মোর প্রাণ॥
....
চন্দ্র মুখ স্ফুরিত অধর সুধা তোর।
দেখিতে চঞ্চল মোর নয়নচকোর॥
দন্ত চন্দ্র হাস্য কৌমুদীর প্রকাসনে।
মদন তিমির হর করিয়ো আপনে॥
সুনহে সুন্দরি প্রিয়ে বোলহ বচন।
মোক প্রতি যদি তোর আছে কোপ মন॥
নয়ানের তিক্ষ্ণ বাণ কটাক্ষ সঞ্চারে।
প্রহরিয়া প্রিয়া মোর হরহ পরাণে॥
ভুজপাশে বান্ধি প্রিয়া দশনের ঘাতে।
কর সেই শাস্তি তোর সুখ হয় জাতে॥
তুমি সে ভূষণ মোর জিব প্রাণধন।
ভব জলধির মধ্যে তুমি সে রতন॥
....
স্মরবিষহারি পদ পল্লব তোমার।
হৃদয় বঞ্চিত হেন চরণ আমার॥
এহি মত প্রিয় চাটু পটু সুবচনে।
নানা পরকারে বোলে নন্দের নন্দনে॥"

আক্ষরিক অর্থেই জয়দেবকে মনে পড়তে পারে—

"ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম"॥

অথবা—

"বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতিদর তিমিরমতিঘোরম্।"

অথবা—

"স্মরগরল খণ্ডনম্ মম শিরসি মণ্ডনম্
দেরি পল্লব মুদারম্॥"

মনে পড়ে যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবির গীতগোবিন্দের ঋণস্বীকার—

"যদি কিছু বোল বোলসি তবে
দশনরুচি তোহ্মারে॥
হরে দুরুবার ভয় আন্ধকার
সুন্দরি রাধা আহ্মারে॥"

কিন্তু এখানেও তো অনুবাদের পর মূলের হীরকদ্যুতি প্রতিফলিত। কিন্তু জগৎসিংহ তাঁর কাব্যে মূলকাব্যের ছায়াটুকু রেখে তাকে পয়ার ত্রিপদীর ঘরোয়া চলনে আটপৌরে পল্লীবাংলার নম্রতায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর কাব্যকে আদিরসের ও বৈদগ্ধ্যের মিশেলে ঝলসে তোলার প্রলোভন থাকলেও কবি জগৎসিংহ পল্লীবাংলার শান্ত মেঠো সুরটিকেই আঁকড়ে ধরেছেন। ফলে অপার স্নিগ্ধতায় কাব্যটি আগাগোড়া ভরপুর, আর এই স্নিগ্ধতাই পাঠকের প্রাপ্তি।

কালিদাস বিরচিত চৈতন্যগীতা পুথি নং ৩৫, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার

পরবর্তী আলোচ্য পুথি কালিদাস রচিত চৈতন্যগীতা। পুথিটি উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের পুথিশালার ৩৫ নং পুথি হিসাবে চিহ্নিত এবং সংরক্ষিত। ১৪˝×৬˝ আকার বিশিষ্ট পুথিটি কীটদষ্ট, এবং কবিপরিচিতি হিসাবে প্রায় কোন তথ্য পাওয়া যায় না।[৭] কালিদাসের বিশদ পরিচয় বা সময়কালের ধারণা পাওয়া না গেলেও কালিদাস ভণিতায় আরও একাধিক কাব্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। কোচবিহার 'সাহিত্যসভা' গ্রন্থাগারে তিনখানি "শনিচরিত্র" (১৩, ১৪, ১৫ নং পুথি) ও একটি কালিকাবিলাস (২৭ নং পুথি) সংগৃহীত রয়েছে। 'চৈতন্যগীতা' কাব্যে তিনি ভণিতায় একাধিক বার বলেছেন—

"নিতাই চৈতন্য পাদবন্ধো করি য়াস।
চৈতন্যগীত সাস্ত্র কহে কালিদায।

কিন্তু কোথাও সমকালীন রাজা বা রাজবংশের উল্লেখ নেই। হয়তো তিনি রাজসভাশ্রিত কবি হিসাবে পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁর রচনা প্রমাণ করে বৈষ্ণব ধর্মের বহুল প্রচলনের সময় কেবল শঙ্করদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মই নয়, শ্রীচৈতন্যদেব এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মও সমাজ ও সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত ও আদরণীয় ছিল। কবি কালিদাসের কাব্যের সূচনা গুরুবন্দনা দিয়ে—

"অজ্ঞান তিমিরান্ধস্যাং জ্ঞানাঞ্জন সোলাকায়া।
চক্ষুরুণ্মিলিতং জেন তস্ম্যাত শ্রীগুরুবে নমঃ॥
প্রথমে বন্দিব গুরু বাঞ্ছা কল্পতরু।
কৃষ্ণ প্রাপ্তির জেই হয়ে জেই মুল॥
অজ্ঞান তিমির নাম ভক্তি করি পরকাস
বন্দো সেই অতুলবরণ॥"

গুরুর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে কবি বলেছেন—

"সংসার ভিতর জত দেব দেবি আছে কত
তাহা না করিহ সন্ধান॥

রাধাকৃষ্ণ নাম মন্ত্র সর্ব্ব সাস্ত্র বেদ তন্ত্র
গুরুমুখে সুনিয়া নিস্তরে।
তবে গুরু আজ্ঞা হয়ে১
সাধুসঙ্গ সদালয়ে
দিনে দিনে ভজন বাড়য়ে॥
গুরু পঙ্ক সাধু নির তাথে পদ্বোজেন স্তির
এই মতি...জের প্রকাষ।
জাথে মত্ত মধুকর মধুলোভে নিরন্তর
য়াসিয়াত করেন বিলাস॥"

গুরুই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম অতএব তিনি অবিনশ্বর। কবি বলেছেন—

"গুরুর পতন হয় হেন জদিমনে লয়
তবে তার সব হয় ব্রথা॥
কৃষ্ণে রূপ দেহ হৃদয় চিন্তিত সেহ
তবে কৃষ্ণকৃপা বৃদ্ধি হয়।
গুরুপদে জত ভক্তি কৃষ্ণেতে হয় তত আর্ত্তি
এই বাক্য জানিহ নিসছয়॥
কৃষ্ণগুরু এক দেহ সন্দেহ না করিহ কেহো
পূর্ব্বে কহিয়াছি সব কথা।
গুরু আজ্ঞা বলবান অভক্তে যে করে আন
ভক্তজনের সেই হয় ব্যাথা॥"

এরপর কাব্যে এসেছে নিত্যানন্দ-চৈতন্যদেব প্রসঙ্গ। কিন্তু চিরাচরিত জীবনকথা বর্ণনা এখানে করা হয় নি। এখানে নিত্যানন্দ প্রশ্নকর্তা, আর চৈতন্যদেব নিজের ঈশ্বরত্ব প্রকাশ করছেন। বিষয়টি গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্র অনুমোদিত নয় নিশ্চয়, কিন্তু মানুষ যেমন শ্রীচৈতন্যের জীবনকালেই ভক্তির প্রাবল্যে তাঁকে পূজনীয় করে তুলেছিল, এখানেও তেমনই ভক্তিরসের আধিক্যেই তাঁকে বিষ্ণুর অবতার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। চৈতন্যভাগবতে যে অলৌকিকতাকে ছোঁয়ার চেষ্টা করা হয় সেটা সম্ভবত সমকালীন ও পরবর্তী জীবনী সাহিত্য রচনার ধারাকে প্রভাবিত করে থাকবে।

"নিত্যনন্দ বলে সুন চৈতন্যগোসাঞি।
কোন রূপে থাক তুমি মনির্স্থের ধাঞি॥
স্রিষ্টি লাগিয়া তুমি কৈলে য়বোতার।
কোন কর্ম কৈলে হয়ে জীবের উদ্ধার॥
নিত্যানন্দ নিবেদিল চৈতন্য সুনিল।
হাসিতে হাসিতে প্রভু বলিতে লাগিল॥
নিত্যানন্দ জ্ঞানে কহে চৈতন্য গোসাঞি।
বড় ধর্ম্ম জোগকথা সুন মোর ঠাঞি॥

জেমতে করিবে লোক সুন তার বাণী।
এক জোগ কথা কহি অমৃত কাহিনী॥
....
য়ামি জপ য়ামি তপ য়ামি জোগ ধ্যেন।
য়ামাকে জানিলে জীব পায়ে পরিত্রাণ॥
জেবা পাপ জেবা পুর্ণ্য করে তাহা য়ামি দেখি।
সগতে থাকিয়া আমি পাপ পুর্ণ্য লিখি॥
জেজন আমাকে চেন্তে তাকে চিন্তি য়ামি।
সে জন য়ামার ভক্ত নিষটা জান তুমি॥
আপনাক না জানে জিব বড় কথা কএ।
তাহাত না থাকি য়ামি নিত্যানন্দ রায়ে॥
খিধাতুর দেখিয়া যে বৈষ্ণবসেবা করে।
নিরবধি নিত্যানন্দ থাকি তার ঘরে॥"

অতঃপর বিষ্ণুর অবতারের কথা বলা হয়েছে, এবং নশ্বর নরদেহ নয় অবিনশ্বর আত্মার সাধনই মানবজন্মের লক্ষ্য একথা বলেছেন শ্রী চৈতন্যদেব—

"মৃর্ত্তিকার ঘটখানি করিছে জতোন।
নানা প্রকারে তাহে চামের বান্ধোন॥
জেদিন ছাড়িয়া আত্যা জাবে নিজস্তানে।
মৃত্তিকার ঘট ভাঙ্গি হবে খান খানে॥
মিথ্যা কথা মিথ্যা বানি মিথ্যা সাসন।
চৈতন্য থাকিতে জিবের চারে জাত্র ধোন॥
না জানে পামোর লোক অসার সংসার।
কুম্ভকারের চক্র জেন ফেরে চক্রাকার॥"

কলিযুগে নামধর্মই শ্রেষ্ঠ, এই নামকীর্তনই জীবমুক্তি ঘটাবে এই কথা ব্যক্ত হয়েছে কাব্যে—

"সুন সুন নিত্যানন্দ মোর নিষ্ট বাণী।
পাপিষ্ট জিবের কই তাড়ন কাহিনী॥
জখন ছাড়িবে আত্যা য়বোধ পামরে।
দূতে নিএগ ভেট দিবে জম বরাবরে॥
জমরাজা পুছিলেন প্রমার্থ করিয়া।
কোন পুর্ণ্য কৈলা জিব হরি না ভজিয়া॥
গিয়াছ ভবের মাঝে পুর্ণ্যের কারণে।
হরি না ভজিলা তুমি কাহার বচনে॥
হরিনাম ছাড়া জীব মোক য়ধিকার।
পড়িলা নরোকে জিব নাহিক নিস্তার॥

নিতাই বোলেন প্রভু পতিত পাবন।
এবে সে জানিনু তুমি জিবের জিবন॥"

শ্রীমদ্ভাগবদগীতায় বর্ণিত কৃষ্ণের ঐশ্বর্যময় রূপ প্রকাশের ধরনেই এখানে শ্রীচৈতন্যদেবের ঐশ্বর্যমূর্তির কল্পনা করেছেন কবি। আর তাই কাব্যনাম চৈতন্য-গীতা। ছোট কাব্যটি সুখপাঠ্য এবং চৈতন্যদেবের প্রতি ভক্তিতে ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ।

অদ্ভুতাচার্য বিরচিত 'রামন্সয়ণ' —পুথি নং ৫৯, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার।

সর্বশেষ আলোচ্য পুথিটি অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণ, যা পুথি সংখ্যা ৫৯ হিসাবে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত। পুথিটির আয়তন ১৪$^{১}/_{২}^{৫}$ ×৪, পুরনো এবং কীটদষ্ট।[৮] ফলে শেষাংশ জানা যায় না। কবি পরিচয় বা রচনাকালের উল্লেখ নেই। নেই কোনো পৃষ্ঠপোষক রাজার কথাও। রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা দিয়ে কাব্য আরম্ভ। মূলত কাব্যটিতে সীতা ও লব-কুশের বাল্মিকী আশ্রমবাস ও লব-কুশের সঙ্গে রামের সাক্ষাৎ পর্বই বর্ণিত।[৯] অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়ার যাত্রারম্ভ দিয়ে কাহিনীর সূচনা। এরপরে বনবাসী সীতা ও লবকুশের বাল্মিকী আশ্রমে অবস্থান প্রসঙ্গ। বালক লব কুশের পিতৃপরিচয় জিজ্ঞাসা—

"আমাক পিতার সঙ্গে দেখা নাহি কেন॥
কার পুত্র হই আমি কার হৈ নাতি।
ক্ষেত্রি জন্ম হৈয়া কেন বোনের বসতি॥
এতেক কহিল জদি লবকুস দুই ভাই।
সুনিয়া হেট মাথা করিল দেত্তাই॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিল মাও সিতা।
সুন সুন পুত্র মোর দুঃক্ষের জত কথা॥
কহিতে লাগিল তবে মাও সিতা।
বিনা দুসে বনবাস দিল তোর পিতা॥
পূর্বাপর কথা সিতা কৈল একে একে।
বাল্মিকে সেহি কথা বুজায়ে দুয়াকে॥"

এরপর বাল্মিকীর রামায়ণ গান লেখা ও তা লবকুশকে শেখানোর বিবরণ রয়েছে—

"বাল্মিকে গিত শিখাইল রামায়ণ॥
সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পূর্বের্ব করে মুনি।
তাহাক সিখাইল মুনি লব কুশ য়ানি॥
তালবেলা দিল মুনি আপনে সাজায়া।
হিরা মন মানিকে মুকুতে গাথিয়া॥"

অবশেষে একদিন রামের যজ্ঞের ঘোড়া বাল্মিকী আশ্রমে এসে পড়ে—

"শ্রীরামের য়াদেশে ঘুড়া ছয়মাস ভ্রমে।
য়বসেস আসিল ঘুড়া বাল্মিক আশ্রমে॥

তিনমাস বনে নাহি বাল্মিক মুনিবর।
জর্গ্য কার্জ্জে গিয়াছে মুনি য়াপনে সত্তর॥
শ্রীরামনন্দন লব কুশ দুই বির।
দুই সিসু....গেল বনের ভিতর॥"

ঘোড়াটিকে দেখে লব আগ্রহ ভরে ঘোড়াটি আটক করে, এবং সঙ্গের সেনাদলকে আক্রমণ করে। কারণ—

"পাতালে যাইতে মুনি কহিল দুয়াকে।
তপবন বিদারে জেই মারিয় তাহাকে॥"

অতএব লব একাই বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে এবং বহুক্ষণ যুদ্ধের পর শত্রুঘ্নের হাতে বন্দী হয়। লব ও শত্রুঘ্নের যুদ্ধ বর্ণনায়—

"দুই জনে যুদ্ধ করে সংসার ভিতর।
তিন বান কাটে বির লয়া ধনু সর॥"

লবের বন্দী হওয়ার খবর পেয়ে কেঁদে আকুল হলেন সীতা।

"মুনিক পুত্র সকলে সিতাকে আগে কহে।
সুনিঞা সিতা দেবি কুসা ডাকি কহে॥
কান্দিতে লাগিল সিতা কুসাইকে ধরি।
কুন রাজা লয়া জাহে লবে বন্দি করি॥
কুশ বোলে মাও মোকে দেহ ধনু সর।
লবকে লয়া য়ামি য়াসিএ সত্তর॥"

অতঃপর কুশ ভয়াবহ যুদ্ধ করে, লব মুক্ত হয়, পুত্রদের পরিচয় পেয়ে রাম হাহাকার করেন—

"দুই পুত্র দেখি রাম করয়ে ক্রন্দন।
সিতা ২ বলি কান্দে ঘনে ঘন॥
সিতা দেবি হারাইল য়াপনার গুণে।
কি করিব রার্জ্জ কি করিব ধনে॥
....
য়দভুত য়াচার্জ্জ গায়ে গিত রামায়ণ।
লবকুস চরিত্র কথা সুনে সর্ব্বজন॥"

রামায়ণ কাহিনীর আবেদন চিরকালীন। তার উপর কবি বেছে নিয়েছিলেন হতভাগ্য দুই রাজশিশু লব-কুশের কাহিনী। মূলত পয়ার ছন্দে গাঁথা এই কাব্যটি নিজস্ব বর্ণনাগুণে জনগণের কাছে আদৃত ছিল নিঃসন্দেহে, কারণ সরাসরি রাজপৃষ্ঠপোষকতা লাভ না করলেও কাহিনীর বহুল প্রচারের জন্যই হয়তো পুথিটি রাজদরবারের সংগ্রহে স্থান পেয়েছিল। এ কথা অনস্বীকার্য যে লব কুশ ও সীতার ভাগ্যহত জীবনের আর্তি কবির অনাড়ম্বর বর্ণনায় আরও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। এই চিরকালীন করুণাঘন অংশটি আজও পাঠককে আবিষ্ট করে।

কোচ বিহার রাজসভার (পূর্বতন কামতাপুর রাজসভার) পৃষ্ঠপোষণায় সাহিত্য সৃষ্টি রসবৈচিত্র্য অতুল। একাধারে শাক্ত পদ রচনা, স্মৃতি-শাস্ত্র-ন্যায়-মীমাংসা আর অন্যদিকে বৈষ্ণব ধর্মাশ্রিত চরিত সাহিত্য, রামায়ণ,

মহাভারত, ভাগবত অনুবাদ এই সমস্তই একসঙ্গে চলেছিল। কোচ রাজবংশের মহারাজারাও অনেকে সুসাহিত্যিক ছিলেন। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ও মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের কথা এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। তাঁরাও একাধারে দেবীস্তোত্র রচনা করতেন আবার বিষ্ণু মহিমা কীর্তনও রচনা করতেন। যাবতীয় ধর্মীয় ক্ষুদ্রতার উর্দ্ধে উঠে রচনায় উৎসাহ দিতেন শাক্ত-বৈষ্ণব-শৈব সমস্ত ধর্মসাহিত্যকে। বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যের পাশাপাশি শ্রীমন্ত শঙ্করদেব ও মাধবদেবের হাতে অসমীয়া সাহিত্যের ঈর্ষনণীয় প্রসার ঘটে। এভাবেই সমগ্র উত্তরপূর্ব ভারতে সেকালের কোচবিহার সাহিত্য সংস্কৃতির পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল। ভাষা-ধর্ম-প্রাদেশিকতার উর্দ্ধে সারস্বত সাধনার বৈচিত্র্যের নানাদিক, বিশেষত বৈষ্ণব সাহিত্যে এই রাজসভার অনন্য পৃষ্ঠপোষণা এবং তার বহুবিচিত্র প্রকাশকে কিছুটা হলেও খোঁজার চেষ্টা এই অধ্যায়ের উপজীব্য।

উল্লেখপঞ্জি ঃ

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুরাধা, পূর্ব ভারতীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও সাহিত্য, কলকাতা, জি.এই.ই. পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ১৩৯০, পৃষ্ঠা-২৩।

২। রায় স্বপনকুমার, কোচবিহার রাজদরবারের সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, বুকস্ ওয়ে, প্রথম প্রকাশ-২০১১, পৃষ্ঠা-৫।

৩। Dasgupta, Shashibushan, A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscrits, Ed. Published by the Supernintendent of Press, Cooch Behar, 1984.

৪। –Do–

৫। –Do–

৬। –Do–

৭। রায়, দীপককুমার, কোচবিহার রাজদরবারের পুথি পরিচয়, কলকাতা, ছায়া পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ-১৪২১, পৃষ্ঠা-৪৩।

৮। Dasgupta, Shashibushan, A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscrits, Ed. Published by the Supernintendent of Press, Cooch Behar, 1984.

৯। –Do–

———

উপসংহার

কোচবিহার রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষণায় রচিত সাহিত্যভাণ্ডার সুবিশাল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। চতুর্তশ শতক থেকে প্রবহমান এই ধারা নানামুখী। রামায়ন- মহাভারত ভাগবত অনুবাদ, বৈষ্ণবীয় শাস্ত্ররচনা, চৈতন্য জীবনচরিত রচনা, শঙ্করদেব,— মাধবদেব বিরচিত বৈষ্ণব গ্রন্থ ও নাটসমূহ, বিষ্ণুপুরাণ, গরুড়পুরাণের পাশাপাশি ব্যাকরণ, স্মৃতি কৌমুদী, অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চার নিদর্শন ও পাওয়া যায়। মহারাজা নরনারায়ণের রাজত্বকালে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষণায় রচিত হয়েছিল 'বকুল কায়স্থের অঙ্কশাস্ত্র' ও ভূমি পরিমাপ সংক্রান্ত গ্রন্থ 'কিতাবৎ মঞ্জরী', শ্রীধর দৈবজ্ঞের জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ 'জ্যোতিমালা' দামোদর মিশ্রের স্মৃতিগ্রন্থ 'বৃহৎ গঙ্গাজল' পীতাম্বর সিদ্ধান্ত বাগীশের 'গ্রহণ কৌমুদী', 'সংক্রান্তি কৌমুদী'। 'পিতৃকৃত্য কৌমুদী' প্রভৃতি ১৮টি স্মৃতিগ্রন্থ। পরবর্তী রাজাদের রাজত্বকালেও এই পৃষ্ঠপোষণা অটুট ছিল, যার ফলে মধ্যযুগের প্রান্ত ভারতের এই রাজ্যে গড়ে উঠেছিল এক সমৃদ্ধ সাহিত্যভাণ্ডার। পরবর্তীকালে এই ভাণ্ডার সমৃদ্ধ তর হল শঙ্করদেবের বহুমুখী সাহিত্য সাধনায় যা অনুসৃত হয়েছিল তাঁর সুযোগ্য শিষ্য মাধবদেব এবং দামোদর দেব দ্বারা। কোচ নরপতি নরনারায়ণ এবং রাজভ্রাতা তথা রাজসেনাপতি শঙ্করদেবের স্নেহধন্য ছিলেন, ফলে তন্ত্র-স্মৃতি-শক্তিমত প্রভাবিত রাজ্যে বৈষ্ণবীয় ভাবধারার বিকাশ ঘটে। মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণ বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর বৈষ্ণবধর্মই রাজধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি পায়। ফলত রচিত হতে থাকে ভাগবত-বিষ্ণুপুরাণ গরুড়পুরাণ। গৌড়ীয় বৈষ্ণধর্ম ও একশরণ নামধর্মের মধ্যে ধারণাগত পার্থক্য থাকলেও চৈতন্যজীবনী রচিত হতে থাকে, গীতগোবিন্দ অনুবাদও হয়। সহিষ্ণুতার ও উদারতার এই ঐতিহ্য প্রবহমান অদ্যাবধি। পরবর্তীকালে কোচনৃপতিরা অনেকেই ছিলেন সুকবি। প্রসঙ্গত মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ, ও মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের কথা স্মর্তব্য, যাঁরা শাক্তমতাবলম্বী ছিলেন, শাক্তপদ রচনায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত, অথচ নিরলস উৎসাহ দিয়েছেন বৈষ্ণব সাহিত্য রচনায়। আস্বাদ করেছেন বিষ্ণুপুরাণ বা ভাগবত বা গরুড় পুরাণের অনুবাদ। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকাল তৎকালীন কামতাপুর রাজসভার সুবর্ণযুগ হিসাবে চিহ্নিত। রামায়ণ, মহাভারতের প্রায় সব কটি পর্বের অনুবাদ ছাড়াও তাঁর পৃষ্ঠপোষণায় রচিত হয়েছিল পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ এবং অবশ্যই শাক্তপদ এবং স্মৃতিশাস্ত্র। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে অভিষেকের পর মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণ একটি মুদ্রণযন্ত্র কিনেছিলেন কিন্তু অকালমৃত্যু তাঁর এই ইচ্ছাকে সার্থক করতে দেয় নি। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রণযন্ত্র প্রথম স্থাপিত হয় জলপাইগুড়িতে, পরে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে যন্ত্রটি কোচবিহারে স্থানান্তরিত হয়। রাজকীয় দলিলপত্রাদি ছাড়াও রাজপরিবারের সদস্যদের নানা রচনা মুদ্রিত হতে থাকে। আধুনিক যুগে পা রাখার পর এই রাজবংশে মহারানী সুনীতি দেবী, রানী নিরুপমা দেবী, রাজকুমারী গায়ত্রী দেবীর অবদান উল্লেখযোগ্য।

রাজদরবারে যখন মধ্যযুগে পুরাণ-ইতিহাস-ব্যাকরণ-স্মৃতি চর্চা চলছিল তখন রাজসভার বাইরে সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে লোককথা, লোকসাহিত্য, লোকনাটক, লোকসঙ্গীত, ছড়া, ছিক্কা, প্রবাদ-প্রবদন, রূপকথা, উপকথা প্রভৃতি। নল-দময়ন্তী পালা বা উষা অনিরুদ্ধ পালার জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে। এর সঙ্গে ছিল গোপীচন্দের গীত, মানিকচান্দের গীত, ময়নামতীর গীত, এছাড়া নানা ব্রতকথা, সাইটোল পূজার গান, তিস্তাবুড়ির পূজার গান, বিষহরি পালাগান প্রভৃতি জনপ্রিয় ছিল। এভাবেই পুরাণ-লোককথা-প্রকৃতি সচেতনতার মিশেলে গড়ে উঠেছিল জনমানস যা মধ্যযুগের সীমানা পেরিয়ে বর্তমান জনজীবন সম্পর্কেও প্রযোজ্য। বর্তমান কোচবিহারে শক্তি পূজা, বৈষ্ণব নামসংকীর্তন আর লৌকিক দেবী দেবতা, তথা তিস্তাবুড়ি, মাসানঠাকুরের সহাবস্থান লক্ষ্যনীয়। এই বিচিত্র ও বহুমুখী অধ্যাত্ম ধারণার একত্র সহাবস্থান প্রকৃতপক্ষে সেই ঐতিহ্যেরই উত্তরসূরী যা সুদীর্ঘকাল ধরে কোচবিহার রাজদরবার কর্তৃক, সৃষ্ট ও পুষ্ট। আলোচ্য 'অভিসন্দর্ভ'টি সেই ঐতিহ্যের পরিচয় দেওয়ার একটি ক্ষুদ্রতম প্রয়াস।

বাংলা সহায়ক গ্রন্থ

১। আহমদ, খাঁ চৌধুরী আমাতউল্লা, কোচবিহারের ইতিহাস, কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ-২০০৮।

২। কবিরাজ, কৃষ্ণদাস, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, কলকাতা, রিফ্লেক্ট, ১৯৯২

৩। কুণ্ডু, ড. মনীন্দ্রলাল, বাঙালির নাট্যচেতনার ক্রমবিকাশ, কলকাতা, সাহিত্যলোক, প্রথম প্রকাশ ২০০০।

৪। গিরি, সত্য, বৈষ্ণব পদাবলী, কলকাতা, রত্নাবলী, ৩য় সংস্করণ, ৭ম মুদ্রণ ২০১০।

৫। গিরি, সত্যবতী, বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ, কলকাতা, দেজ পাবলিশিৎ, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৮।

৬। চক্রবর্তী, স্মরণজিৎ, উত্তরবঙ্গ : কিছু স্মৃতি কিছু অন্বেষণ, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা.লি., প্রথম প্রকাশ ২০০১।

৭। চৌধুরী, ভূদেব, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ১৯৯৪।

৮। ঠাকুর, গৌরগুণানন্দ, শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব, শ্রীখণ্ড, ১৯৫৪।

৯। দাস, বৃন্দাবন, চৈতন্য ভাগবত, কলকাতা, রিফ্লেক্ট, ১৯৯৪।

১০। দাশ, নির্মল, মধ্যযুগের কাব্যপাঠ, কলকাতা, ইউরেকা, দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ ২০০৯।

১১। দেব, রণজিৎ, উত্তরবঙ্গের চিঠি, কলকাতা, ভারতী প্রকাশনী, প্রথম মুদ্রণ ১৩৮২।

১২। দেব, রণজিৎ, কোচবিহারের প্রাচীন ইতিহাস, কলকাতা, দেশ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ২০১১।

১৩। পাল, নৃপেন্দ্রনারায়ণ, বিষয় কোচবিহার, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা. লি, প্রথম মুদ্রণ ২০০১।

১৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সি, ১৯৮২।

১৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ রাজসভার কবি ও কাব্য, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, বামা পুস্তকালয়, তৃতীয় সংশোধিত সংস্করণ, ২০০১।

১৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুরাধা, পূর্ব ভারতীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও সাহিত্য, কলকাতা, জি.এ. ই পাবলিশার্স প্রথম প্রকাশ ১৯৮৩।

১৭। ভট্টাচার্য, ষষ্ঠীচরণ, বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পাটবাড়ি, কলকাতা, পুনশ্চ, ২০০১।

১৮। মজুমদার, বিমানবিহারী, শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের উপাদান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯।

১৯। মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ, বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া;কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৯৭১।

২০। রায়, শচীন্দ্রনাথ, সাহিত্য সাধনায় রাজ্যশাসিত কোচবিহার, কলকাতা, সুপ্রিম পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ১৪০৬।

২১। রায়, স্বপনকুমার, কোচবিহার রাজদরবারের সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, বুক্স্ ওয়ে, প্রথম প্রকাশ ২০১১।

২২। রায়, স্বপনকুমার, কোচবিহার রাজদরবারের সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, বুক্স্ ওয়ে, প্রথম প্রকাশ ২০১১।

২৩। রায়, শঙ্করনাথ, ভারতের সাধক, কলকাতা, করুণা প্রকাশণী, প্রথম প্রকাশ ১৩৭৭।

২৪। রায়, দীপককুমার, কোচবিহার রাজদরবারের পুঁথি পরিচয়, কলকাতা, ছায়া পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ ১৪২১।

২৫। শীলশর্মা, অরুণকুমার, কোচবিহার রাজবাড়ির অন্দরমহল, কলকাতা, অনিমা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ১৪১৮।

২৬। সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৮৬

২৭। সান্যাল, অবন্তীকুমার ও ভট্টাচার্য, অশোক (সম্পা), চৈতন্যদেব : ইতিহাস ও অবদান, কলকাতা, সারস্বত লাইব্রেরী, দ্বিতীয় মুদ্রণ : ২০০২

২৮। সেন, দীনেশচন্দ্র, বৃহৎবঙ্গ, কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, ১৯৯৯

সাহিত্য পত্রিকা ও অন্যান্য সূত্র

১। পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার সংখ্যা।

২। সমতট, মহাপ্রভু বিষয়ক সেমিনার সংখ্যা, ৩৫ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই—সেপ্টেম্বর ২০০৩

৩। স্মরণিকা, বয়েজ ক্লাব, শিবযজ্ঞ রোড, কোচবিহার, ২য় বর্ষ সংখ্যা, ১৪১৪

৪। স্মরণিকা, বয়েজ ক্লাব, শিবযজ্ঞ রোড, কোচবিহার ৩য় বর্ষ সংখ্যা, ১৪১৫

৫। স্মরণিকা, শতবর্ষ পূর্তি সংখ্যা, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজ, কোচবিহার,

৬। স্মরণিকা, ১২৫ বর্ষ পূর্তি সংখ্যা আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজ, কোচবিহার, ২০১২

৭। অনুষ্টুপ, বিশেষ বাংলা পুঁথিসংখ্যা, ১৪২২।

অসমীয়া সহায়ক গ্রন্থ

১। নেওগ, ড. মহেশ্বর, অসমীয়া সাহিত্যের রূপরেখা। চন্দ্র প্রকাশ, একাদশ সংস্করণ ২০১০।

২। বড়ুয়া, ড. যতীন, কোচ রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতাত অসমীয়া সাহিত্য, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ : ২০০৩

৩। বেজবরুয়া, লক্ষ্মীনাথ, শ্রী শ্রী শঙ্করদেব আরু শ্রী শ্রী মাধবদেব, ডিব্রুগড়, বনলতা, বনলতা সংস্করণ : ২০১২।

ইংরাজী সহায়ক গ্রন্থ

1. Barua, B.K. History of Assameese literature, New Delhi, Sahitya Akademi, 1964.
2. Bhattacharya, Jatindramohan, Catalogus Catalogorium of Bengali Manuscripts, Calcutta, The Asiatic Society 1978.
3. Borkakoti, Dr Sanjibkr, Mahapurusha, Srimanta Sankaradeva, Bani Mandir, Guwahati, 2005.
4. Chakraborty, Janardan, Bengal Vaisnavism and Sri Chaitanya , Calcutta, The Asiatic Society Reprint 2000.
5. Dasgupta, Shashibushan, A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts, Ed, Published by the Superintendent of Press, CoochBehar, 1948.
6. De. Sushil Kumar, Early History of the Vaishnava Faith and Movement in Bengal, Calcutta, Firma KLM, 1961.
7. Majumder, Durgadas, ed. West Bengal District Gazettears, Calcutta, 1977.
8. Neog, Dr. Maheswar, Early History of Vaishnava Faith and Movement in Assam : Shankardev and his times, Reprint, 2008.
9. Rahaman, Tarafder Mumtazur, Hussian Shahi Bengal : 1494–1538, A socio Political Study, Ducca, 1965.
10 Sanyal, Dr. Charuchandra, The Rajbansis of North Bengal, Calcutta, The Asiatic Society, 1965.
11. Sen, Dinesh Chandra, History of Bengali literature, Calcutta, 1954.

পুথি (উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত)

১। বিষ্ণুপুরাণ (মাধব চন্দ্র শর্মা কৃত, পুথি নং-২১)
২। চৈতন্যচরিত (হৃদানন্দ দাস কৃত, পুথি নং-৫০)
৩। গীত গোবিন্দ (জগৎসিংহ কৃত, পুথি নং-৫১)
৪। চৈতন্য গীতা (কালিদাস কৃত, পুথি নং-৩৫)
৫। সহজ চরিত (রচয়িতার নাম নেই, পুথি নং-৩৮)
৬। সুন্দরকাণ্ড রামায়ণ (মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ কৃত, পুথি নং-৬০)
৭। ভাগবত (শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কৃত অসমীয়া পুথি নং-১৩)
৮। মার্কণ্ডেয় পুরাণ (পীতাম্বর রচিত, পুথি নং-৮)
৯। ভাগবত, দশম স্কন্ধ (পীতাম্বর কৃত, পুথি নং-৫৮)
১০। মহাভারত, ভীষ্মপর্ব (দ্বিজ রামকৃত, পুথি নং-১৯)
১১। রামায়ণ (অদ্ভুতাচার্য কৃত, পুথি নং-৫৯)।

বৈদ্যুতিন সহায়ক

www.atributosankaradeva.org